সম্প্রতিকালের সমাজ রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদনা ।। চিত্ত মণ্ডল

নবজাতক প্রকাশন

এ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭

SAMPROTIKALER SAMAJ RAJNEETI-O-RABINDRANATH : recent Socio-Political aspect and Rabindranath / A collection of Socio-political analysis on Rabindranath Tagore, Ed. by CHITTA MANDAL

প্রকাশক : মজহারুল ইসলাম, নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলকাতা ৭০০০০৭

মুদ্রক : শ্রীহিমাদ্রি রায়, ১-এ রামধন মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৪

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

মূল্য : পঁচাত্তর টাকা

আমার বাবা যদুনাথ মণ্ডলকে যিনি হাতুড়ির
বদলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন কলম

প্রসঙ্গ-কথা

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের বহুদিনের। আমরা আনন্দিত, দেরীতে হলেও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরেছি। সাংবাদিক, প্রবন্ধকার এবং তরুণ গবেষক চিত্ত মণ্ডল এই ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু প্রকল্প নিয়ে হাজির হলে তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাসের অভিনবত্ব দেখেই আমি এক কথায় এ-বই প্রকাশে রাজি হয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এদেশে কম আলোচনা, মূল্যায়ন হয়নি; মননশীল, একাডেমিক থেকে শুরু করে ফিচারধর্মী হালকা বহু চটুল গ্রন্থেরও অবাধ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। চিরাচরিত পথে না গিয়ে এই গ্রন্থটির মূল্যায়ন করা হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সেই ব্যাপারে বিশ্লেষণগত পদ্ধতিতেও ব্যতিক্রমিতা আনার চেষ্টা হয়েছে। গত দেড় দশকের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের, বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধান করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছি কিনা তার বিচারের ভার পাঠকদের ওপর। তবে দ্রুত প্রকাশনার কাজ শেষ করতে গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। পাঠকবৃন্দ-র কাছে এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বইটি আগরতলা বইমেলায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন
কলকাতা ৭০০০০৭

সম্পাদনা-প্রসঙ্গে

'আজকের বিশ্বে সকল সংস্কৃতি, সকল সাহিত্য ও শিল্প-কলাই নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিমুখী। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের জন্য শিল্প, শ্রেণী প্রভাবমুক্ত শিল্প কিংবা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত কোন শিল্প নেই। · সাহিত্য ও শিল্পকলা রাজনীতির অধীন, কিন্তু অপরদিক থেকে দেখলে, রাজনীতি ও সাহিত্য ও শিল্পকলা দ্বারা বিরাটভাবে প্রভাবিত।' এই মতবাদ অনুসরণ করে প্রাচীন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে সমকালীন যুগ, রাজনৈতিক ঘটনাবলী, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করতে হবে। এবং সেই নির্দিষ্ট প্রেক্ষণ অনুসরণ করেই কোন যুগের বা ব্যক্তি বিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রতিটি মানুষ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, এবং এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ঐ বিশেষ ব্যক্তির সমুন্নতি ঘটে। একজন মানুষ তাঁর সারা জীবনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়। ফলে তাঁর জীবনের ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকার সমস্তই তাঁর সৃষ্টির সংগে জড়িয়ে যায়। বিশ্লেষণের সময় তাঁর ঐ সীমাবদ্ধতা ও সমুন্নতি—উভয়তই সমকালীন দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই নীতি অনুসরণ না করলে বিশ্লেষণে বিভ্রান্ত ঘটতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এক অভিজাত সামন্ত পরিবারের সন্তান, এই পারিবারিক অবস্থান থেকে এবং সামন্ত শ্রেণীতে অবস্থান করে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের সংগে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত

হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই রুশ-বিপ্লব হয়েছে এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়ও তিনি 'তীর্থদর্শনের' পুণ্যার্জন করেছিলেন। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র—মানব বিকাশের এই তিনটি স্তরকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই তিনটি সমাজের আদর্শ ই তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে এই তিন সমাজ-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলিই তাঁর সাহিত্যে দেখা যায়। বিশ্লেষণের সময় তাই তাঁর প্রাগ্রসরতার দিকগুলির পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটিও সযত্নে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই বিশ্লেষণের সংগে ঐ সীমাবদ্ধতার কারণসমূহ, সামাজিক অবস্থান। পরিস্থিতি ও পারিবারিক অর্থ নৈতিক আবহ, সংস্কৃতিক পরিবেশ—সব সূত্রাবদ্ধভাবে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক নীতি ও শৃংখলা অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয় না বলেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে পূজা-অর্চনা ধূপধুনায় আচ্ছন্ন করে দেবতার পর্যায়ে তুলে দেন, তাঁরা তাঁর ভাববাদী, ঐশীচেতনাকেই বড় করে দেখেন। আবার অন্য পক্ষ রবীন্দ্রনাথকে স্বকালের পটভূমিতে ফেলে তাঁর ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ করে তাকে একজন নির্ভেজাল প্রগতিশীল মানুষ বলে পরিণত করার চেষ্টা চালান। তাঁর মানবতাবাদকে শ্রেণীচেতনার সংগে গুলিয়ে ফেলেন। এই দুই পক্ষের আলোচনাই ভ্রান্ত। টলস্টয় বা তুর্গেনিভের মত রবীন্দ্রনাথও একজন বুর্জোয়া মহানশিল্পী—একথা স্বীকার করায় লজ্জা নেই। একথা স্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রয়োজন। তার সবটাই ভাল, কিংবা সবটাই মন্দ, এমনি ধরনের আলোচনা মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধী। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলো ফেলে তাঁর সাহিত্য শিল্পের শরীর ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

কিন্তু এই ক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন আছে। এই যে মতাদর্শগত বিশ্লেষণ কিংবা প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র মূল্যায়ন, তাতেও সময় একটি বিশেষ ফ্যাকটর। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় কিংবা চীনে যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের বা কোন বিপ্লব-পূর্ব সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্ভারের মূল্যায়ন করা হয়, বিপ্লবপূর্ব যুগ বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সময় সে-ভাবে হতো না। এবং না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, বিপ্লবের পরে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এলে এবং শ্রেণী হীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে একজন কবির বা সাহিত্যিক-শিল্পীর ভালমন্দ বিচার করার প্রচুর সময় মেলে, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোও সম্ভব হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের বিষয়টিই ধরা যাক, বিপ্লবের পর তাঁর সামগ্রিক জীবন ভাবনা, সৃজিত শিল্প-সাহিত্য-সংগীত নিয়ে একাডেমিক এবং ফলিত উভয় দিক থেকেই মূল্যায়ন হতে পারে। কিন্তু যে-দেশে এখনও বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, যেদেশ এখনও আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি, যে দেশ এখনও উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়ার পথে ধাবমান, সে দেশে ঐ ভাবে রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়নের সময় কোথায়? প্রয়োজনই বা কি? আন্দোলনে যতটা প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যতটা প্রয়োজন, ঠিক সেই ধরনের সদর্থক জিনিসেরই দরকার। মগজ চর্চার অযথা সময় পরে দেখা যাবে। এখন দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথের দর্শন, চিন্তা-ভাবনা ও সৃষ্টির সদর্থক ভূমিকা ইদানীংকার জীবনে কতখানি। এবং এটাই বড় কথা। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের সময় হাতিয়ার হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে; পশ্চিমবঙ্গেও জরুরী অবস্থা ও সন্ত্রাসের সময় রবীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এই-যে রবীন্দ্রনাথের

সদর্থক ভূমিকা এবং উপযোগিতামূলকতা সেটা খুঁজে বের করে আজকের প্রয়োজনের সংগে প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র বের করা জরুরী কাজ। বলছিনা যে এই ধরনের আলোচনায় ভ্রান্তি নেই। নিশ্চয়ই আছে, সীমাবদ্ধতার কথা না তুলে শুধুই ঐ সদর্থকতা কিংবা নিছকই প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে গেলে কার্য-কারণহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে কিন্তু দেশের বর্তমান সংক্রান্তির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগুবার সময় এছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য এবং সময় বিশেষে সেই ঐতিহ্যকেই আমাদের হাতিয়ার করতে হবে। এই সম্পাদনার ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে সীমাবদ্ধতা ও প্রাগ্রসর নিয়ে পাশাপাশি আলোকপাত করা যাবে, একাডেমিক গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এখন শুধুই উপযোগিতাবাদের কারণে সদর্থক প্রাসঙ্গিক তার সন্ধান।

গত দেড় দশকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু ঘটনা ঘটেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতার সন্ধান বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসি বিরোধী ছিলেন : সত্তরের দশকের পশ্চিমবাংলায় যে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের করাল ছায়া নেমেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসি-বিরোধী ভূমিকার মূল্যায়ন করে সাযুজ্য সন্ধান করা যেতে পারে। হিজলী জেলের বন্দী হত্যার বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; সত্তরের দশকে, তৎকালীন কংগ্রেস শাসনে জেলে জেলে বন্দী হত্যা হয়েছিল, বন্দী মুক্তির দাবি উঠেছিল, এই পরিপ্রেক্ষিতেও রবীন্দ্রনাথের হিজলী জেলের বন্দী হত্যার প্রতিবাদ এবং বন্দী মুক্তির প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করা সম্ভব। এবং এটাই জরুরী

কাজ। এই নীতি অনুসরণ করে গত দেড় দশকের ঘটনাবলীকে এই গ্রন্থে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে মূল গ্রন্থটিকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/১

সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। এই সময় সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য অন্তত স্বাভাবিক কারণে বারবার এ রাজ্যের মানুষকে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে হয়েছে। স্বল্পকালীন এই সব সংকট এবং আন্দোলনের মধ্যে ছিল: সত্তরের সন্ত্রাস। জেলে জেলে বন্দীহত্যা ও সেই বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন, জরুরী অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকারের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার অন্দোলন, বিনা বিচারে আটক এবং এসমা-মিসার ভয়াল ফাঁসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রচারের দুর্বার সংগ্রাম, সহজ পাঠ বর্জন সংক্রান্ত বিতর্ক, মাতৃভাষা বাংলায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, বিশ্বভারতীর ছাত্র বিরোধী বিল ও তার প্রতিবাদ, রবীন্দ্ররচনাবলী নিয়ে বিশ্বভারতী ও সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন, জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিতর্ক এবং গণতান্ত্রিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক দুর্বার লড়াই। এইসব সংকটে ও আন্দোলনে রাবীন্দ্রিক-প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং এসব ক্ষেত্রে কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এই পর্যায়ে তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক এতৎসংক্রান্ত আন্দোলনের প্রগতিসঞ্চারের ইতিবৃত্ত পাশাপাশি বর্ণনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব : সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/২

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ কাঠামোতে নানা সংকট দীর্ঘদিন ধরে ব্যাধির মত সংক্রমিক হয়ে আসছে। এর কুপ্রভাবের ফল এতৎঅঞ্চলের মানুষ পূর্বেও ভোগ করেছে, এখনও তার উত্তরাধিকার বহন করছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তল্পীবাহক এদেশের শোষকশ্রেণী এইসব সংকটের জন্ম দিয়েছে। এখনও ক্ষমতা লড়াইয়ের স্বার্থেই তা আকড়ে ধরে আছেন। এর মধ্যে আছে : সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার জিগির, ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে ধর্মীয় সংকট বৃদ্ধি করা, জাত-পাতের প্রশ্ন, অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক কুসংস্কার, পণ-প্রথার মত বর্বর ব্যাধি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতার মত কূটকৌশল, নারী সমাজের প্রতি মধ্যযুগীয় আচরণ প্রদর্শন এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আতংক ও শান্তির অনন্ত আকাংখা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে এইসবের বিরোধিতা করেছেন, মূল-উৎপাদনের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন, আজকের দিনেও এইসব শিকড় গেড়ে বসে আছে সমাজের গভীরে। এসবের বিরুদ্ধে আজকের প্রাগ্রসর মানুষের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ঐ সদর্থক ভূমিকা ও ঐতিহ্য কতখানি প্রাসঙ্গিক, তারই অনুসন্ধান এই পর্যায়ের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় পর্ব : সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট /৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। এবং তাতে তাঁর কোন ভণিতা ছিল না, চেষ্টা করেছেন, প্রয়াস চালিয়েছেন, হয়তো সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু

কাজে ও কথায় তিনি ছিলেন অভিন্ন। সেই রবীন্দ্রনাথকেই কিন্তু দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে রাজনীতির শিকার হতে হয়। সত্তর দশকে ভারতের জরুরী অবস্থার সময় সংবাদপত্র, বেতার এবং দূরদর্শনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছিল তাঁর প্রগতিবাদী বা জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গদ্য ভাষ্য। বেতারে গাইতে দেয়া হয়নি তাঁর বেশ কিছু সংগীত। অন্য দিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও তৎকালীন সামরিক শাসক এবং তার তল্পীবাহক প্রতিক্রিয়াশীল তমুদ্দুন-পন্থীরা জাতিগত শোষণের কারণে বাঙালীর অস্তিত্ব নির্মূল করতে এবং সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে নস্যাৎ করতে সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার ষড়যন্ত্র করেছে, বেতারে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা সেই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কিভাবে, এই পর্যায়ে তারই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্ব : রবীন্দ্রনাথ বনাম সাধারণ মানুষ /ঃ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সায়াহ্নে সাধারণ মানুষেরই একজন হওয়ার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষও বরাবরই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে ড্রয়িং রুমের সম্পদে পরিণত করে তাকে জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রাচীর ভেঙে কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব, এই পর্বে তারই বিতর্কিত বিশ্লেষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এবং একাডেমি থেকে শুরু করে বহু চটুল গ্রন্থ সম্ভারও রচিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের একটি গ্রন্থ, বলতে গেলে একেবারে ভিন্ন গোষ্ঠিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখার চেষ্টা এর আগে হয়েছে বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে এই গ্রন্থ পাঠককুলকে আকৃষ্ট করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। সম্পাদনা-গ্রন্থের জন্য বহু অমূল্য সময় ব্যয় করে যারা এই নতুন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনা লিখে দিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই। সম্পাদনার কাজে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের নেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আজিজুল হক এবং নজরুল ইসলাম আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা প্রথমা রায়মণ্ডল ও পুত্র প্রতীক সংসারের আর্থিক দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাকে এই কাজে দৌড়-ঝাঁপ করার সময় বের করে না দিলে এই গ্রন্থ বেরুত না। প্রকাশক মজহারুল ইসলাম এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তারজন্য রইলো আমার সংগ্রামী অভিনন্দন। মুদ্রণযন্ত্রের অসহযোগিতার কারণে কিছু ভুল থেকে গেছে। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ব্যস্ততা ও অসুস্থতার মধ্যে প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন।

চিত্ত মণ্ডল

সূচীপত্র

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/১

সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিম বাংলার মানুষকে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। এসব সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বারবার এ রাজ্যের মানুষকে রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে হয়েছে। স্বল্পকালীন এসব সংকট এবং আন্দোলনের মধ্যে ছিল : আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের আতংক, বন্দীহত্যা বিরোধিতা ও বন্দীমুক্তির দাবি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-অধিকারের প্রশ্ন, এসমা মিসার করালছায়া, অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য এবং সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম, সহজ পাঠ বর্জন-বিতর্ক, শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত কিনা, বিশ্বভারতী বিল নিয়ে তুমুল হৈ চৈ, রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রকাশ নিয়ে বিশ্বভারতী বনাম রাজ্য সরকারের টানা পোড়েন, জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বিরোধ এবং গণতান্ত্রিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক দুর্বার লড়াই ইত্যাদি। এসব সংকট ও আন্দোলনে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং ঐসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তারই অনবদ্য দলিল এ পর্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ, সমকাল ও সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা

সম্প্রতিকালের সমাজ রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর পল্লি উন্নয়ন ভাবনা, যুদ্ধ বিরোধী ভাবনা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিজম বিরোধী ভাবনা ও শিক্ষাচিন্তা আজও বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুধাবনযোগ্য। স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রেই আজন্ম সংস্কাররূপে লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বদেশচিন্তা ও মানবতাবাদ একই সূত্রে বাঁধা ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন ভারতবর্ষ কেবল শহরে নয়, গ্রামেও, ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও। তিনি তাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর প্রভূত জোর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষার যে দাবি ও গুরুত্বের কথা বলে গেছেন, এখনও সেই দাবিতেই লড়তে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লিসমাজের বিকাশের কর্মসূচির প্রতিফলন কি বর্তমানকালে এ রাজ্যের গ্রামীণ প্রশাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না? রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের রোমান্টিকতার বিরোধিতা করেছেন, সন্ত্রাসবাদের সমস্যা নিয়ে কি বিপ্লববাদীদের আজও ভাবনায় পড়তে হয় না? এখানেই রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা।

রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা লক্ষ্য করেছিলেন, বর্তমানকালেও কি তার ছায়াপাত ঘটছে না? বর্ণবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা কবিতায় যে আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই বর্ণবাদের আগুনের লেলিহান শিখা কি এখনও জ্বলছে না? জ্বলছে। এখানেই সমকাল ও সাম্প্রতিক সমাজ রাজনীতির সংকটে রবীন্দ্রনাথের সংলগ্নতা।

২

রবীন্দ্রনাথের সমকালে প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে কবি তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। নিজেকে তিনি কখনো গুটিয়ে রাখেননি, কখনো সরাসরি, কখনোবা সাহিত্যে, চিঠিপত্রে তাঁর সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন

ঘটেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি ও রসদ্রষ্টা, কিন্তু কদাচ ভূমিভ্রষ্ট নন। জন্ম সামন্ত পরিবারে। কিন্তু সেই পরিবারেই বহমান ছিল নবীন পুঁজিবাদী আবহাওয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো। বাংলার সামন্ত ব্যবস্থার ভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কজন বাঙালী ব্যবসা ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে নতুন অর্থনীতির গোড়াপত্তন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। যুক্তিবাদী, মানবিকতা, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে উজ্জীবন সৃষ্টি হয়েছিল, সেকালে তার শ্রেষ্ঠ অনুশীলন-ক্ষেত্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাভিত্তিক সভ্যতার উন্মেষ বাংলার প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতিকে যেমন প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করে মানুষের চিন্তার জগতে। ফলে সৃষ্টি হয় সোশ্যাল মোবিলিটির। দেখা দেয় পদে পদে দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা, এই দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা বর্তমান ছিল দ্বারকানাথের মধ্যেও। তিনি ছিলেন অংশত ঐতিহ্যবাহী ও জাতীয়তাবাদী, অংশত সমন্বয়বাদী এবং অংশত পাশ্চাত্ত্যবাদী। দেবেন্দ্রনাথ বিত্তবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় উদ্যোগী না হয়ে ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরে সমাজের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে নতুন পথে অগ্রসর হলেন, কিন্তু পরাধীন দেশে নানা উপাদানগত কারণে যখন একবার জঙ্গমতার সূচনা হয়, তখন শাসক ও শাসিতের প্রধান দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরে থাকা বাস্তবত সম্ভব হয় না। তাই স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে আজন্ম সংস্কার রূপেই লাভ করেছিলেন, প্রথম জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বহু বিদেশী প্রথার প্রচলন থাকলেও তাঁদের পরিবারের হৃদয়ে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগ্রত ছিল।[১]

রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে মেদিনীপুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন এবং Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal[২] পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে ঠাকুরবাড়ীর দান শ্রেষ্ঠ হলেও ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র কলকাতায় যে হিন্দুমেলার আয়োজন করেন তাতে ঠাকুরবাড়ীর আর্থিক ও পারিবারিক উদ্যোগ প্রবল ছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
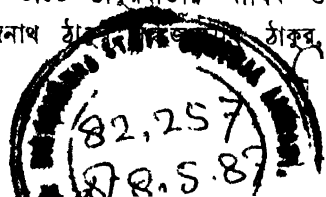
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ দীর্ঘদিন এই মেলার সম্পাদক, সহ-সভাপতি, সভাপতি পদে সক্রিয় ছিলেন। এই মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।...যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে করিয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কেবল আনন্দ প্রমোদের জন্য নহে ইহা স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য।[৩]

মনোমোহন বসু ঐ একই অধিবেশনে বলেন: এ মেলায় ধর্ম সংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন— সেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপন আপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন।[৪] এখানে লক্ষণীয় নাস্তিকদের আহ্বান করা হলেও মুসলমানদের কথা বলা হল না।

১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় সভা'ও এই হিন্দু জাতীয়তাভিত্তিক ছিল। তৎকালীন National Paper[৫]-এ S. B. ছদ্মনামে একজন লেখক লেখেন: খৃষ্টান ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করলে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়ে গঠিত সভাকে জাতীয় সভা বলা যায় না। ঘোষণায় মুসলমান ও খৃষ্টানরা বর্জিত হলেও তখনকার হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভায় মুসলমান ও খৃষ্টানরা অংশগ্রহণ করতেন স্বল্প সংখ্যায় হলেও। অপরদিকে একথাও ঠিক তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগীর সংখ্যা সামান্যই ছিল। তা সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে এই হিন্দু স্বাজাত্যবোধ বাস্তব হলেও এর পরোক্ষ ফল ভালো হয়নি। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটক দুটিতে যবন বিদ্বেষ বেশ দৃষ্টিকটু। ফরাসী নাট্যকার জাঁ রাসিনের 'Alexander the Great' নাটকের অনুবাদ 'পুরুবিক্রম' ও 'Iphigenia'-অনুসারী 'সরোজিনী' (১৮৭৯)-তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনটি করে যে নতুন দৃশ্য সংযোজন করেছেন, তার মধ্যেই যবন বিদ্বেষ স্থান পেয়েছে। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীতেও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে: শোনরে যবন! শোনরে তোরা! / যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে, সাক্ষী রলেন দেবতা তার / এর প্রতিফল ভুগতে হবে। ঠাকুরবাড়ীর অন্যতম সৃষ্টি 'সঞ্জীবনী' সভাতেও ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি দিয়ে যে উপাসনা হত তা হিন্দু স্বাদেশিকতারই প্রভাবজাত। এই সভায় সর্বভারতীয় পোষাক

কী হবে এই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়'- একই প্রভাবজাত। কিন্তু যৌবনে পা দিতেই হিন্দু মেলার বালক কবি ও সঞ্জীবনী সভার কিশোর সদস্য ক্রমশ তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেনি। 'চোচয়ে কথা', 'জিহ্বা আস্ফালন', 'ন্যাশনাল ফাণ্ড', 'টৌন হলের তামাসা', 'হাতে কলমে', 'নবাবঙ্গের আন্দোলন' ১২৮৯ থেকে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রচিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক সমাজ সচেতনতা ও ঔদার্যের পরিচয় দিতে থাকেন। জনগণ থেকে দূরবর্তী তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি কঠোরভাবে সমালোচন করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স নিয়ে যারা আসর জমিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক বলে অনুভব করতেন।...আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাবলিশার থেকে সংগ্রহ করেছেন।' শহরের সীমাবদ্ধ একটি পরিবেশে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজি ভাষায় ইংরেজের কাছেই চাকরি ও দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অধিক স্বাধিকার দাবি করবে এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে না হলেও কাপড়ের কল স্থাপন, দেশলাই তৈরীর চেষ্টা, ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জাহাজ চালনা ইত্যাদি ঘটনা ঠাকুরবাড়ীর স্বাদেশিক প্রয়াসের আন্তরিকতা প্রমাণ করে। কিন্তু একথা বলতেই হবে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ জন বসবাসকারী গ্রামবাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেনি, আকুতি দেখা দিয়েছিল মাত্র। ইংরেজ রাজত্বে সনাতনী সমাজ ও অর্থনীতির যে বিপর্যয় ঘটেছিল এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাত সমাজ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত চেহারা লাভ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন এবং ১৯০৮ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তা তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষ যে শুধু কলকাতায় নয় পল্লীগ্রামে, ভারতবর্ষ যে কেবলমাত্র হিন্দুর নয় মুসলমানেরও, রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন পল্লী-বাংলায় জমিদারী সূত্রে গিয়ে। তাই গোরাকে বিবর্তনের স্বার্থে একটি মুসলমান পল্লীতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন কংগ্রেসে যদি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে ইংরেজের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে তাই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য ও ইংরেজের

বিভেদনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাদেশিক আন্দোলনের পুরোধা ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের তুলনায় অনেক অগ্রসর চিন্তার নায়ক রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আত্মশক্তির উদ্বোধন ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন: যে রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগ্যে পড়ুক, ইহা আমরা যেন প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।[৬]

'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না, যতক্ষণ দেশকে না জানি —ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।' রবীন্দ্রনাথের মতে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় স্বদেশী বা বিদেশী শাসকের অধীন নয়। পরাধীনতা বলতেও কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। বিদেশী রাজার পরিবর্তে স্বরাজ এলেই সেই দেশ পরাধীনতা মুক্ত হতে পারে না। সামাজিক উন্নতি ব্যতীত রাজনৈতিক উন্নতি নিতান্তই অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের এই সব চিন্তা ভাবনা শুধু বাস্তবসম্মত তাই নয়, অনেক অগ্রসর চিন্তার পরিচায়ক। স্বাধীনতার পরেও আমাদের সংগ্রামে এই সব প্রশ্ন মুখ্যভূমিকা নিয়ে আছে। অনুপস্থিত জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পল্লী বাংলা ও সমাজ অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেছেন, পল্লীবাসীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন তা সে যুগে বিস্ময়কর। যদি জমিদাররা জোঁক, প্যারাসাইট ইত্যাদি উক্তি সত্ত্বেও জমিদারিটা ছেড়ে দিতে পারেননি, এই শ্রেণী সীমাবদ্ধতা নিয়েও ১৯০০ সাল থেকে পল্লী পুনর্গঠনের যে কর্মকাণ্ড শুরু করেন তা যুগান্তকারী ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দৃষ্টিতে রাজনীতির চেয়ে সমাজধর্মের গুরুত্ব অধিক এবং সেই সমাজধর্ম আবার মানবধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত। তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদের দমননীতি, কার্জনী আমলের শিক্ষা সংকোচন ও ভাষা বিচ্ছেদের চক্রান্ত, বঙ্গ-বিভাগের আয়োজন, শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ, সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্য, কৃষ্ণ আফ্রিকায় অত্যাচার, বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে চেতনার বিবর্তন ঘটায় তারই ফলশ্রুতি 'এবার ফেরাও মোরে' কবিতা[৭]।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় মুক্তি চিন্তার প্রধান দিক হল স্বদেশী সংস্কৃতির বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের একজন শিক্ষাগুরু। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায় জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয় তাই তিনি স্বদেশ পরিচয় মূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন যার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও আশ্রম দিয়ে এবং পরিণতি

লাভ করে বিশ্বভারতীতে। স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, লোককথা ও লোকগীতি সংগ্রহ থেকে শব্দতত্ত্ব পর্যন্ত তাঁর নিত্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নিয়ে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন জাতীয়তাবোধের তা যে কতবড় যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণযোগ্য। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে দাস্য মনোভাবের বিরুদ্ধে। সেকালে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যবিবরণীও পরিচালিত হত ইংরাজীতে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন বাংলা ভাষায়। সর্বত্র সাহেবীয়ানার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পোষাক থেকে শুরু করে দৈনন্দিনতার সমস্ত ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র দেশীয় রুচির বাতাবরণ সৃষ্টি করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ 'সাধনা' পর্যায়ে রবীন্দ্র-চিন্তার আকাশে বঙ্কিম ও চন্দ্রনাথ বসুর রক্ষণশীলতার স্থান না হলেও অতীত ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার যেন তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। 'কথা'র কবিতায় এবং 'নৈবেদ্যের' সনেটে ভারতবর্ষের মহিমময় রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই পর্বে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার মর্মবাণীর তুলনামূলক বিচার করে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মকেও সমর্থন করে ফেলেছেন।

ভারততত্ত্বের অব্যবহিত পরেই তার 'নেশন বনাম সমাজ' তত্ত্ব প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস নেশনবাদই রূপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যবাদে। 'শতাব্দীর সূর্য আজ রক্ত মেঘ মাঝে / অস্ত যায়'। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' ইত্যাদি সনেটে তিনি নেশনবাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে দেন। নেশনবাদের 'রাষ্ট্রধর্ম' ও 'জাতিপ্রেমের' বিপরীতে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের 'ভারতীয় সমাজ আদর্শ' প্রচার করেন। 'ন্যাশনালিজিম'-এর ইংরেজী বক্তৃতাগুলি রচনায় তিনি নেশনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রচার করেন। তার চিন্তায় 'নেশন' মাত্রই শভিনিজম বা সংকীর্ণ জাত্যভিমান এবং ইম্পিরিয়ালিজম বা স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ। এটাকে তিনি ইউরোপীয় সমাজের একটি [illegible] ভাবতেন, প্রাচ্যে চীন বা ভারতে তা সম্ভব নয় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন যে—রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবাদ অর্থে ন্যাশনালিজম বা রাষ্ট্রধর্ম মনে করেননি, তার লক্ষ্য ভারতীয় সমাজের বিশ্বাসে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, দেশপ্রেমের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রেমের সাধনা। ভারতবর্ষের মুক্তি, রাষ্ট্রিক মতামত ও রাষ্ট্রিক কর্ম এই

সাধনার উপচার মাত্র ভারততত্ত্ব ও নেশনতত্ত্ব এই দুই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী কাজকর্ম পরিকল্পনা করেন। তাঁর পথ স্বদেশী রাষ্ট্র যতটা নয় তার চেয়ে বেশী স্বদেশী সমাজ ও তার সৃষ্টিমূলক কর্ম। মোট কথা, স্বদেশী যুগের পনের বছরের মূলকথা 'স্বদেশী সমাজ'। স্বদেশী সমাজের কাজ কী—সংগঠন কর্ম, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বৃহত্তর জনসমাজের মেলবন্ধন এবং গণসমাজে পাঠশালা, শিল্প শিক্ষণালয়, ধর্ম গোলা, ব্যাঙ্ক স্থাপন, সমবায় প্রথায় চাষ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জাগরণ সৃষ্টি করা, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি মুলতুবী রেখে এই কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন কিনা তা স্থির করে বলা শক্ত। তবে তাঁর এই পথকে একজন রাজনৈতিক দলের বাইরের মানুষের আন্তরিক প্রয়াস রূপে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। এর মধ্যে তখন কতগুলো মৌল সত্য রয়েছে যা পরবর্তীকালে জরুরী বলে গণনীয় হয়ে উঠেছে সবার কাছেই। বিশেষতঃ 'পঞ্চায়েত রাজ' ও 'রাষ্ট্রপ্রধান স্বরাজ' State within State) গড়ার এই প্রথম পরিকল্পনা গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ও গঠনমূলক কাজের ১৭ বছর আগে রচিত। গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের যে নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে তারই পূর্বসূত্র কি রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রধানত বঙ্গভঙ্গের কালে। দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, রাখীবন্ধন উৎসব, মিছিল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিজেকে তিনি সক্রিয়ভাবে বিজড়িত করে ফেলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি।' রবীন্দ্রনাথের চরিত্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লান্তি এল, বললেন—'বিদায় দেহ ক্ষমো আমায় ভাই/কাজের পথে আমি তো আর নাই।' কিন্তু বিদায় নিতে পারলেন কৈ? বিলাতী দ্রব্য বয়কট-আন্দোলন ও মজঃফরপুরে কেনেডি হত্যার (১৯০৮) সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রাদুর্ভাব কবিকে বিচলিত করে তুলল। সন্ত্রাস তার নীতি বিরুদ্ধ, অপর দিকে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের শ্লোগান হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করল। তিনি বললেন যে কোন মূল্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষা করতে হবে, 'গৃহ বিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নেই।' ইংরেজদের বিভেদ নীতিই একমাত্র দায়ী নয়, নিজেদের মধ্যেও রয়েছে ভেদ বোধ। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীস্তর থেকেই জনসমাজের বৃহত্তর ঐক্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। তার আশঙ্কা ক্রমশ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে

উত্তরকালের রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধমূলক ভূমিকায় এবং সর্বশেষে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। কিন্তু প্রসঙ্গত অন্য কথাও মনে আসে। ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতির ঘটনা আমাদের দেখিয়েছে ভেদাভেদ না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নানা কৌশলে বিভাজন সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে। ভিয়েতনাম বহু রক্তের বিনিময়ে তার সমাধান করলেও, কোরিয়া এখনও বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং তার জন্যও সাম্রাজ্যবাদ আত্যন্তিকভাবে দায়ী। 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'দেশহিত' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিদারুণভাবে সওয়াল করেছেন। আবার 'বদনাম' গল্পে ও শান্তিনিকেতনে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকে স্থান দিয়ে তিনি সহানুভূতির দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। সন্ত্রাসবাদের রোমান্টিকতাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উদ্ঘাটন করেছেন তাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে অস্বীকারই বা কি করে করা যায়। গণ-আন্দোলন-বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ যে কি ভয়াবহভাবে রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা তা দেশ বিদেশের মার্কসবাদীদের নীতিগত সংগ্রাম ধারা থেকে এমন কি সত্তরের দশকে এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকেও স্মরণযোগ্য। স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো দৃষ্টিকটু বা তৎকালে নিন্দনীয় হয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ রোমান্টিকতার পরিণতি কি হয়েছিল? একদল অনিবার্যভাবে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, আরেকদল সাধুসন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধের আন্তরিকতায় সন্দেহ না করেও নীতি হিসেবে এর বিরোধিতা তো কাউকে না কাউকে করতেই হত?

ভুল বোঝাবুঝি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কম হয়নি। 'জনগনমন অধিনায়ক' গানটি নিয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসে অন্য দুটি গানের সঙ্গে এই গানটিও গাওয়া হয়। ইংলিশম্যান ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় সংবাদে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ এই গান পঞ্চম জর্জের প্রশস্তি হিসেবে রচনা করেছেন[৮]। বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ার পর মডারেট নেতারা স্থির করেন কংগ্রেসের অধিবেশনে রাজদম্পতিকে সংবর্ধনা জানাবেন। এই উপলক্ষে একটি গান রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করলে সরলা দেবীর স্বামী মিঃ রামভুজ দত্ত চৌধুরী[৯] একটি হিন্দী গান রচনা করেন এবং সরলা দেবীর পরিচালনায় রাজ প্রশস্তি রূপে গানটি গীত হয়। সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর প্রচারে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন এই ঘটনা তাঁকে

অস্বস্তিতে নিক্ষেপ করেছিল। ১৯৩৭ সালে শ্রীপুলিন বিহারী সেনকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: রাজ সরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোন বন্ধু (শ্রীআশুতোষ চৌধুরী) সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্য বিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চির সারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচালক সেই যুগ যুগান্তরের মানব ভাগ্যরথ চালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জ ই কোনক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। অবশ্য কংগ্রেস প্রধান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' কাগজে সঠিক সংবাদই প্রকাশিত হয়েছিল। গানটি প্রথম দিকে রবীন্দ্র রচনাবলীতে ব্রহ্মসঙ্গীতের তালিকায় ছিল এবং মাঘোৎসবে গাওয়া হয়।

কিন্তু কংগ্রেসে পরিবেশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই তৎকালীন বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এক গোপন সার্কুলারে (২৬ জানুয়ারী ১৯১২) সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক করে দেন যেন তাদের সন্তানদের শান্তিনিকেতনে পড়তে না পাঠান। কেননা ঐ 'Place altogether unsuitable for the education of the sons of Governments servants'।

১৯০৮-১৯২২ সালকেই অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চিন্তার 'ভারত তীর্থ' বলে আখ্যাত করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'গীতাঞ্জলি' ও 'বলাকা'র উপপর্ব দুটিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই পর্বে হিন্দু স্বাজাত্যবোধের ক্রম-অবসান এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বিত সংস্কৃতি বোধের রূপ বলাকার পক্ষ বিধুননে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামন্ত সমাজের অচলায়তন তিনি ভাঙ্গতে চেয়েছেন, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'ভারত তীর্থ', 'জনগণমনঅধিনায়ক' ইত্যাদি কবিতা গানে 'আমার সোনার বাংলা'র যুগ থেকে ভারত পথিক রূপে যাত্রা শুরু করেছেন। যুদ্ধকালীন আটক নীতির বিরুদ্ধে 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় নাইটহুড ত্যাগ কাণ্ড ঘটে গেছে। এই পর্বে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি সামন্ত সংস্কার বিরোধী, স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রধর্ম বিরোধী এবং ভারত ও বিশ্বপ্রেমে স্থাস্থির।

এর পরের পর্বে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকা মতবাদ ও বিজ্ঞান বিরোধী পশ্চাদমুখিতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সপক্ষে, সভ্যতার অগ্রগতির বিশ্বাসে এবং বিশ্ব-

সংস্কৃতির মিলনের প্রশ্নে ভাবিত। ভারতীয় জাতীয় ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ভূমিকার পাশে তিনি সর্বদাই থেকেছেন। 'হিজলীর বন্দী হত্যা', 'দেশীয় মানুষদের বিনা বিচারে আটক করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি, 'কণ্ঠরোধ' প্রয়াস ইত্যাদির বিরুদ্ধে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়েও তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ভগ্নস্বাস্থ্য ও বার্ধক্য সেখানে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এ পর্যায়ে সমাজের শোষক শোষিতের শ্রেণী সম্পর্ক বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অবহিত হন। 'রক্তকরবী' নাটকে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বগুলি এবং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের শ্রেণী অবস্থান নির্দেশ করেছেন অভ্রান্তভাবে এবং দ্বন্দ্বের বিপ্লবাত্মক পরিণতিও ঘটিয়েছেন। কিন্তু 'রাজা' ও 'নন্দিনী' চরিত্রদুটির treatment তিনি করেছেন তাঁর মানবিক আদর্শে, system-এর প্রতি শ্রেণী ঘৃণার আস্পদ না করেও রাজার ব্যক্তিগত উদ্বর্তন ঘটিয়েছেন শ্রেণী অবস্থানের সীমা অতিক্রম করে।

নিজস্ব শ্রেণী অবস্থানের অস্বস্তি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল বেশ কিছুকাল। রাশিয়ায় গিয়ে তাই যেন তাঁর চিত্ত স্ফূর্তি পেয়েছিল। ধন-বৈষম্যের অবসান, শিক্ষার আমূল বিস্তার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি যেন তাঁর সারা জীবনের অস্পষ্ট স্বপ্নগুলি, অপরিচ্ছন্ন চিন্তাগুলির সমাধান ও বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ায়। বিশ্বের আর কোন মনীষী সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াকে তীর্থভূমি রূপে অভিহিত করেন নি। রুশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টির বহু আচ্ছন্নতাকে স্বচ্ছ করে দেয়। যদিও কিছু প্রশ্নে দ্বিধা যে তাঁর ছিল না এমন নয়, সে দ্বিধ তো ইউরোপে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও অগ্রসর পরিবেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করেও রোমাঁ রোলাঁর মধ্যেও ছিল। অঁরি বারবুস ও রোমাঁ রোলাঁর বিতর্ক যেসব প্রশ্ন ঘিরে ঘটেছিল তার অনেকগুলি তে রবীন্দ্রনাথেরও।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় মুক্তি চেতনায় দেশপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেম সমন্বিত হয়েছে, জাতীয়ত আন্তর্জাতিকতায় উদ্বর্তিত হয়েছে, উগ্র ন্যাশনালিজম তথা ইম্পিরিয়ালিজমের বিনিপাতে সমাজতন্ত্রের বিজয় সঙ্গীত ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে সভ্যতার চরম সংকটের কালে তার সমস্ত বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছিল সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর। তার দূরদৃষ্টি যে কত সঠিক ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজবাদের বিজয়ে তা প্রমাণিত। জমিদারতন্ত্রের অনিবার্য পতন, পুঁজির দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আস্ফালনের উৎকট রূপ তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে। ধর্মতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ও শোষণের রূপ কবি রবীন্দ্রনাথ বহু রাষ্ট্রনেতার চেয়েও স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন : ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্ম শাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে। কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই যুনাইটেড স্টেটস্-এ রাষ্ট্র চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরী হয়। টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধণীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্ত শাসন বলা চলে না।[১০] এ থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে তিনি বলছেন, 'যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সবসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা।'

অপরদিকে সোভিয়েতে তিনি ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব দেখেছিলেন। ১৯৩১ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন : 'খেজুরগাছ তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষ দাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতকে সজোরেও ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রটাকে শুদ্ধ টান মারেনি, উল্টো যন্ত্রের সুযোগকে সবজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে রোগের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।' এই উক্তির মধ্যে কি আমরা সোভিয়েত ব্যবস্থার সম্পত্তির রাষ্ট্রীকরণ ও বৈষম্যহীন ধনবণ্টন নীতির সমর্থন পাই না ?

স্বীয় রাষ্ট্রনৈতিক মত সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য : '...অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মত বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা

তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটি বিচার করে দেখতে চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে পাই।' ঐতিহাসিকভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচারের এমন মাপকাঠিই নির্দেশ করেছিলেন লেনিন 'তলস্তয় মূল্যায়ন' প্রসঙ্গে। লেনিন বলেছিলেন, তিনি মহৎ লেখক যাঁর সৃষ্টিতে সমকালীন বৈপ্লবিক ঘটনাবলী প্রতিফলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—ভারত তথা আধুনিক বিশ্বইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল সময়, আর সেই ঘটনাবলীর মহাকেন্দ্র প্রধানত ইউরোপ। কিন্তু সুদূর ভারতবর্ষের মতো একটি পশ্চাৎপদ পরাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়া থেকে সামান্য ঘটনাও এড়িয়ে যায় নি। আমাদের বোঝা দরকার, রোমাঁ রোলাঁ ছাড়া আর দ্বিতীয় পুরুষের নাম করা কষ্টসাধ্য যাঁর সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বদর্পণ হয়ে উঠেছে। রোলাঁর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাজ অনেক কঠিন ছিল। কেননা রোলাঁ সংস্কার মুক্ত শিল্প বিপ্লবে অগ্রসর, আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ একটি সমাজে লালিত পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধ নবজাগরণের কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপণ থেকে পাকা ফসল তোলা পর্যন্ত প্রায় একক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। রবীন্দ্র-চিন্তা ও সৃষ্টিধারার রেখাচিত্র কেউ যদি আঁকতে প্রয়াসী হন তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে রেখার গতি প্রতিটি স্তরে নিয়ত অগ্রাভিমুখী, কাল ও যুগের ঘোড়ার পিঠে তিনি নির্বিকার আরোহীমাত্র ছিলেন না বরং সময়ের বল্গায় অতিরিক্ত গতিবেগ সঞ্চার করে যুগান্তরের ঠিকানায় পৌছে দিয়েছেন দেশকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে'—তখন কি আমাদের বান্দুং সম্মেলনের প্রস্তাবের কথা স্মরণে আসে না? আজ যখন ভারতে রাজ্যগুলির অসম বিকাশ, উচ্চ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিতে, বিচ্ছিন্নতায়, ভেদাভেদে অগ্নিগর্ভ তখন প্রত্যেক রাজ্যের সুষম বিকাশের দাবি এই একই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল সোভিয়েতের প্রতি। সোভিয়েত আক্রান্ত হলে

তিনি সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী ভারত সহ বহু দেশের জাতীয় মুক্তি সম্ভব করে তুলল। সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে, ঔপনিবেশিকতার প্রাচীন পদ্ধতির প্রায় অবসান হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকার বুকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক নীতি ও সমর অভিযান আজ নিকারাগুয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে যে তীব্র সংকট সৃষ্টি করে তুলেছে এবং তার বিরুদ্ধে যখন বিশ্ববাসী সরব হয়ে উঠেছে, তখন বার বার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায়। 'আফ্রিকা' কবিতায় তাঁর সেই মহান আহ্বান আজও আবেগে মথিত করে :

আজ হেরো, পশ্চিম দিগন্তে হোথা / ঝঞ্ঝা মেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা— / ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে, দিন বুঝি হল অবসান। / পশুরা উঠিল গর্জি, ছিল যারা গোপন গহ্বরে— / নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা / অঙ্গনের বহুমূল্য আস্তরণ, / ধূলিরে করিছে অবারিত। / এসো তুমি যুগান্তের কবি, / আত্ম অবমাননার আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ওই চির নিপীড়িতা মানবীর কাছে, / ওই অপমানিতের দ্বারে / ক্ষমা ভিক্ষা করো। / হোক্ তাহা তব সভ্যতার / হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।

দেশ বিদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি কবির পক্ষপাত কিন্তু আকৈশোর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইরিশ সদস্যদের হেনস্থা, চীনের মরণ ব্যবসায় প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে কৈশোরে বিচলিত করেছিল। সেদিন থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মূল্যায়ন কখনও ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় নি।

আজও লুমুম্বা, বেন্‌জামিন মোলোয়েজদের প্রাণ দিতে হচ্ছে নিজের দেশের মুক্তির জন্য। আলেন্দেদের হত্যা করা হচ্ছে। সহস্র সহস্র মানুষকে বিনা অপরাধে বোমা বর্ষণে গণহত্যা করা হচ্ছে। শত সহস্র মায়ের ক্রন্দনে পৃথিবীর বাতাস আজ আবার ভারী হয়ে উঠেছে, বহু বীরের আত্মদান প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, তখন কবির জিজ্ঞাসা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা / এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা? / স্বর্গ কি হবে না কেনা / বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না / এত ঋণ? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।'[১১]

এ জিজ্ঞাসা জীবন শেষে সংশয়োত্তীর্ণ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে : 'উদয় শিখরে

জাগে মাভৈঃ / নবজীবনের আশ্বাসে, / জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয় / মন্দ্রি—উঠিল মহাকাশে।'

কবির মৃত্যুর পর চীন ও কিউবার মুক্তি ঘটে গেছে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ আজ শোষণমুক্ত, কিন্তু উত্তরকালের মানুষের সামনে আরও দুস্তর দীর্ঘ পথ পড়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে এবং আত্ম শক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে একালের কবির আহ্বান :

তোমার আকাশ দাও, কবি দাও / দীর্ঘ আশি বছরের, / আমাদের ক্ষয়মান মানসে ছড়াও / সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও / তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে / একাগ্র মহৎ[১২]।

কবিও বুঝেছিলেন দেশে দেশে জাতীয় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হবে—-তাই তার বিশ্বাস ছিল, 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' সুতরাং আজ প্রযোজন 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে ঘরে ঘরে প্রস্তুতি'। সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও শিক্ষা আমাদের বড় প্রযোজন। তাই উত্তরকালের কবি সুকান্তেরও দাবি :

পূর্বাচল দীপ্ত করে বিপ্লজন সমৃদ্ধ সভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক। এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসঙ্গীতের সুর। জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে / চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে / যদিও সে সমাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক / আমাদের মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ।[১৩]

এক রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে। একাল তাঁর উত্তরসূরিদের। আর সংগ্রামী মানুষের তূণে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষদের সৃষ্টি কর্মের অসংখ্য আয়ুধ। মানবতার শত্রু চিহ্নিত, এখন প্রয়োজন বিশ্বজোড়া প্রস্তুতি—প্রস্তুতি—প্রস্তুতি। বর্তমানের রবীন্দ্রচর্চা সেই উত্তরাধিকার বহন করে অগ্রসর হোক।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ আয়োজিত সেমিনারে [রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে নন্দন মিনিয়েচারে অনুষ্ঠিত] পাঠ করেছিলেন। অবশ্য প্রকাশের সময় কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা ও সংস্কার করা হয়েছিল। প্রবন্ধটি 'স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রভাবনা'

শিরোনামে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাহিত্য মাসিক 'নন্দনের' বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যায় [মে-জুন ভল্যুম ১-২, ১৯৮৬] প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব-এর ষাণ্মাসিক সাহিত্য মুখপত্র সপ্তপর্ণীর বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যায় [ত্রয়োদশ বর্ষ বৈশাখ ১৩৯৩, মে ১৯৮৬] 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন : রবীন্দ্রভাবনা উত্তরাধিকার' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এখানে মূল রচনাটির সঙ্গে মুখবন্ধটি সংযোজিত করে লেখাটির নাম বদল করে 'রবীন্দ্রনাথ, সমকাল ও সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা' রাখা হলো [সম্পাদক]।

টীকা-টিপ্পনী

১. স্বাদেশিকতা : জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ, সুলভ সংস্করণ, ১৯৮৩, ৭৭।

২ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব।

৩. হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে [১৮৬৮] সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ।

৪. ঐ বক্তব্য : মনোমোহন বসু।

৫. National paper-এর S. B. নামক জনৈক ছদ্মনামের লেখক।

৬. সুবিচারের অধিকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭. এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঃ বঃ সরকারের জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৩।

৮. ২৮ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালের Englishman-এ লেখা হয় : The proceedings opend with a song of welcome to the king Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore. ঐ দিনেরই Statesman এ লেখা হয় : The chair of girls···sangs a hymn of welcome to the king specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali Poet.

৯. ১৯১১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পঞ্চম জর্জকে স্বাগত জানিয়ে গাওয়া

হয়েছিল বামভুজ দত্ত রচিত হিন্দী গান 'যুগ জা মেরা পাদশা, চব্ দিশবাজ'।

১০ সমবায় নীতি, রবীন্দ্র বচনাবলী।

১১ বলাকা, ৩৭নং কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

১২ বিষ্ণু দে।

১৩ পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী কলিকাতা। একাদশ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৮৫, পৃঃ ১২৭।

দীপক কুমার রায়

ফ্যাসি-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ও সত্তরের সন্ত্রাস

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। একজন মানবতাবাদী কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসিবাদী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের জঘন্য রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৯২২ সালে ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেছেন। ক্ষমতা দখল ও সংহত করার পর মুসোলিনি হিটলারের জাপানী যুদ্ধবাজদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাইখষ্টাগে অগ্নি সংযোগের সাজানো মামলার সুযোগ নিয়ে নাৎসিরা কমিউনিষ্ট কর্মী ও ইহুদীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে কমিউনিষ্টদের রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখলে ভালো হয় যে, জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'পিপলস ফ্রন্ট' তৈরী করার জন্য সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির কাছে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি সে সময় কমিউনিষ্টদের আহ্বান প্রত্যাখান করেছে। এতে নাৎসি পার্টি ও তাদের নেতা হিটলার শক্তিশালী হয়েছে। ১৯৩১ সালে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে। ১৯৩৫ সালে ফ্যাসিষ্ট ইতালি আবিসিনিয়া দখল করে। ১৯৩৬ সালের ২৫ মে ফ্যাসিষ্ট জার্মান ও ইতালি স্পেনের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমন করে।

ফ্যাসি আক্রমনের ঘটনাগুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ফ্যাসিজমের অস্তিত্বকাল ২০ থেকে ২৫ বছরের বেশী নয়। সকলেরই জানা ১৯২২ সালে মুসোলিনি ইতালিতে প্রথম ফ্যাসিবাদ কায়েম করেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের লেখক শিল্পীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

পশ্চিমবাংলায় সত্তরের সন্ত্রাস সম্পর্কে সকলেরই ধারণা আছে এবং তা থেকে

কেমন করে আধা-ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল, তাও পশ্চিমবঙ্গবাসীরা দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই ফ্যাসিবাদ বা আধা-ফ্যাসিষ্টদের করাল রূপ সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন। একথা সঠিক যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং ইতালির অতিথি হিসাবে সৌজন্যমূলক কিছু প্রশংসাও ফ্যাসিষ্ট ইতালিকে করেছিলেন। এর পরে সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনিভা ও জুরিখে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ মনীষী ও ইতালি থেকে পলাতক কিছু মানুষের কাছ থেকে ফ্যাসিজমের আসল চেহারাটা দেখতে পেলেন। কিছুদিন পরে কবি 'Manchester Guardian'-এর মারফৎ দুটি বিবৃতি দিয়ে ফ্যাসিবাদের চরিত্র উদ্ঘাটন করলেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অর্থাৎ কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা বা বিবৃতি দিয়েই চুপ করে ছিলেন না। তিনি তাঁর কবিতায়, ছড়ায়, ছবিতে, নিবন্ধে, চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তার ধ্বংস কামনা করে গেছেন।

ইতালির ফ্যাসিজম যখন রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার করছিল, তখন তিনি খোলাখুলিভাবেই ইতালির মুসোলিনির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইতালির বন্ধুদের এবং সি. এফ. এনড্রুজের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এনড্রুজের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় তিনি বলছেন: ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি ও নীতির সঙ্গে সমগ্র মানবতা সংশ্লিষ্ট, এবং এ এক উদ্ভট কল্পনা যে আমি কখনো এমন আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি যে-আন্দোলন কথা বলার স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে অবদমন করে, এমন কিছু মানতে বাধ্য করে যা ব্যক্তির বিবেকের বিরুদ্ধে, চলে হিংসা ও গোপন অপরাধের রক্তমাখা পথে। আমি একথা বারে বারেই বলেছি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসী-চেতনা পশ্চিমের জাতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করছে তা বিশ্বের পক্ষে বিপদ স্বরূপ।[১]

১৯২৭ সালে আঁরি বারবুস রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি পাঠিয়ে একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আবেদনে রবীন্দ্রনাথকে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ আবেদনে স্বাক্ষর করেন ও নিচের জবাবটি পাঠান:

প্রিয় বন্ধু

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আপনার আবেদনে আমার সহানুভূতি আছে এবং আমি নিশ্চিত যে সভ্যতার গভীর থেকে হিংসার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশে যাঁরা আতঙ্কিত সেই অজস্র মানুষেব কণ্ঠ এই আবেদনে প্রকাশ পেযেছে।

আদিম মানুষদেব বেলায় এমনটি আশা কবা সঙ্গত যে মানুষের রক্তঝরানো শক্তি-পূজার অনুষ্ঠানে তাদের বিশ্বাস থাকবে, ভযমিশ্রিত ভক্তি থাকবে সদা উদ্যত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি, যে শক্তি তাব শিকারকে দাসত্বের মূঢ় আজ্ঞাবহতায় প্রথমে বাধ্য করবে ও পরে মুগ্ধ করবে। এ ধরণেব মানসিকতা থেকে একমাত্র প্রকাশ পায় নৈতিক সচেতনতাব অপরিপক্কতা, যা কৈশোরেব চিন্তাহীন নিষ্ঠুরতার মতো বড়ো হযে ওঠাব ভবিষ্যত দাবি করতে পাবে তাব সংশোধনেব জন্য। কিন্তু সংস্কৃতিবান মানুষের মধ্যে যখন অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে দেখা যায, তখন প্রমাণিত হয় বার্ধক্যের দ্বিতীয় শৈশব পাশব প্রবৃত্তির কাছে যে বার্ধক্য তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তার লোভের মূলে থাকে আবেগপ্রবণ তারুণ্য নয়, সুদক্ষ রকমের নির্বিবেকী নিরেট বার্ধক্য। তার স্পর্শ হযে ওঠে দূষিত, কেননা তার অন্তস্থল থেকে নির্গত নিশ্বাসে থাকে ক্ষয় ও মৃত্যুর অস্বাস্থ্যকর ঘ্রাণ আর তার বহিঃস্থ ত্বক ফুলে ওঠে ও পচনশীলতার উল্লসিত চমকে ঝকঝক করে।

অতএব এই ঘটনায আমি আনন্দিত যে এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা এখনো মানুষেব উচ্চতর নিযতিতে বিশ্বাস রাখেন এবং যাঁরা তাদের দুঃখ ভোগের মধ্যে দিযে প্রমাণ দিচ্ছেন যে নিজের বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সদাপ্রস্তুত মানুষের আত্মা অমর।

আপনার প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সমালোচনামূলক পত্রিকা 'মর্দ'-এ মাঝে মাঝে লেখার জন্য আমাকে বলেছেন। যখন একটু অবসর পাবো কথাটা আমার মনে থাকবে, তবে বযস যতো বাড়ছে অবসরও কমছে।[২]

এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে ১৯৩৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রুসেল্‌স্‌-এ যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে রমাঁ রোলাঁর আহ্বানে যে ইস্তাহারটি প্রেরিত হয, তাতে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা স্বাক্ষর করেছিলেন। এই ইস্তাহারটির মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইস্তাহারটিতে স্বাক্ষর করেছেন।

স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। স্পেনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লীগের সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতি প্রচার করেন। সেটি এরূপ: স্পেনে আজ বিশ্ব-সভ্যতা পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে 'ফ্রাঙ্কো' বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। স্পেনের সুন্দর সমতলভূমি মূর ও বিদেশী সেনাবাহিনী দখল করে নিচ্ছে, সঙ্গে থাকছে মৃত্যু ক্ষুধা ও দুর্দশা।

শিল্প সংস্কৃতির গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার শিল্পের অমূল্য সম্পদ। হাসপাতাল ও ক্রেশও রেহাই পায় নি। নারী ও শিশুদের খুন করা হচ্ছে, গৃহহারা ও নিঃস্ব করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ংকর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। স্পেনে যে তামসিকতা, যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমানুষিক পুন প্রচেষ্টা চলেছে। তাকে চড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতে হবে। বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।

স্পেনের জনগণের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মুহূর্তে মানবতার বিবেকের কাছে আমি আবেদন করছি। স্পেনের গণফ্রন্টের পাশে দাড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন—'প্রতিক্রিয়া দূর হও' লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায়।[৩]

চীনে জাপ-আক্রমণের সূচনাকাল থেকেই কবি জাপানকে তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যখন দেখলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলি যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্টদের পৈশাচিক আক্রমণের নীরব দর্শক, তখন তিনি কেমন যেন অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং এসব শক্তিধর রাষ্ট্র গুলির তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন: আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।[৪]

কবি চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু, আমাদের কী দরকার আছে? আমরা কী করতে

পারি ? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি। কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ ? এই দুঃখবোধ-দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ—যদি একথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—একথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কংকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেসিনগান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।[৫]

একথা সকলের জানা, চীনের বুকে জাপানের ফ্যাসিবাদী আক্রমণের নিন্দা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তিনি এর জন্য সাহায্য প্রেরণের আবেদনও করেছেন। জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রবিতর্কও হয়েছে। ফ্যাসিস্টদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এ সময়ে কবি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন এবং প্রান্তিকের সেই দুটি অমর কবিতা রচনা করে ছিলেন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৩৩৭)। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস / শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

প্রান্তিকের অপর কবিতাটির স্মরণীয় কয়েকটি চরণ : মহাকালসিংহাসনে / সমাসীন বিচারক শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে, / কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎস'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের / হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিন্তার ভস্মতলে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ কোনদিন বিস্মৃত হননি ফ্যাসিজম হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সমস্ত অনৈক্য ভুলে তাকে পরাস্ত করে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে মানবতার মহত্তর কাজ। ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার যখন সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করেন, তখন কবি গুরুতর অসুস্থ। শান্তিনিকেতনে এ খবর পাবার পর তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই কবিকে

কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এই সময়েই কলকাতায় সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ গঠন করা হয়। উক্ত সংগঠনের কর্মকর্তারা কবিকে নিয়ে আসার দিন তিনেক পরে দেখা করতে গেলে তিনি আশ্বাস দেন যে একটু সুস্থ হলেই সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রূপে কাজ করবেন।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা তাঁর সর্বশেষ ভাষণ 'সভ্যতার সংকটের' মধ্যে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাব বিপুল সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন সংকটজনক অবস্থায ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অজস্রবার কলম ধরেছেন।

১৩৩৮ সনে 'জন্মদিন' কবিতায তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করেছেন : মানুষের দেবতাবে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিবরে তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের / মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের / নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি / দগ্ধ শেষ মশালেব আব অদৃষ্টের অট্টহাসি।[৭]

পশ্চিমবাংলায় সত্তরের সন্ত্রাস আলোচনা করলে দেখা যায জার্মানীতে হিটলারের আমলে সন্ত্রাসের মাধ্যমে যেভাবে ফ্যাসিজমের আমদানী হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবাংলায সন্ত্রাসের মাধ্যমে আধা ফ্যাসিজম কায়েম হয়েছিল। এখানে নৃশংসতম অত্যাচার নির্বিবাদ হত্যা, পৈশাচিক গণহত্যা সংগঠিত হযেছে। সত্তরের দশক পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কময অধ্যায। পশ্চিমবাংলার মানুষকে তিরিশের বা চল্লিশের দশকের জার্মানীতে যাবার প্রযোজন নেই। কারণ তারা দেখেছেন কিভাবে তৎকালীন সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার দেশ শাসনের নামে ফ্যাসিষ্টসুলভ অত্যাচার চালিয়েছে।

এ সময় যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তাতে ভারতীয় পুলিশের নগ্নতম চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। জেলের মধ্যে বন্দীদের ওপর শাসকশ্রেণীর জঘন্য অত্যাচার চলেছে। তাছাড়া নারী নির্যাতনের যে সব ঘটনা জানা যায, তা পরাধীন ভারতের সরকারকেও লজ্জা দেবে। মা বোনেদের সেদিনের বুকফাটা কান্না অনেকে শুনতে পাননি। কারণ মিথ্যা প্রচার অত্যন্ত চড়াসুরে ধ্বনিত হয়েছিল।

সত্তরের সন্ত্রাসের বলি হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। অনেককে বাড়ী ঘর

ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বহু খুন হয়েছে। আবার অনেকে চাকুরীচ্যুত হয়েছেন। কেউ কেউ চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। সেদিন বাক্-স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না।

১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি হিসাবে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে 'সংঘর্ষে'[৮] মৃত্যু ঘটেছে ২০২ জনের। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রে দেখা যেত পুলিশের সাথে সংঘর্ষে উগ্রপন্থীদের মৃত্যু ঘটেছে। আসলে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর কোথাও নিয়ে গিয়ে বা থানা হাজতে ঠাণ্ডা মাথায় খতম করেছে বহু রাজনৈতিক কর্মীকে। কোন কোন রাজনৈতিক কর্মীর মাথায় দলের নাম খোদাই করে দেওয়া হয়।[৯]

গৌরকিশোর ঘোষ একজন নির্ভীক সাংবাদিক। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য' হিসাবে লিখেছিলেন: একজন গণতন্ত্রবাদী হিসেবে পুলিশের এই নির্বাক পাইকারী নৃশংসতাকে এবং সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার দিই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সন্ত্রাস দমনের উপায় নেই, একথা তাদের কে বলেছে?[১০]

এক কথায় বলা যায়, সত্তরের পশ্চিমবাংলার জেলগুলো হয়ে উঠেছিল যমরাজের কারাগার। যুবশক্তিকে ভেঙ্গে তছনছ করে পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে সন্ত্রাসের কালোছায়া নেমে এসেছিল। সেদিন আধা-ফ্যাসিষ্ট বাহিনী সমস্ত রকম প্রগতিশীল যুব আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী প্রগতিশীল রাজনীতিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ভেঙ্গে পড়া সমাজ ব্যবস্থার লোনা ধরা দেওয়ালে চুনকাম শুরু করল। যুবশক্তিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য বিকৃত রুচির যৌন সাহিত্যের প্রকাশনা, 'যুববাণী'র প্রচার, অপসংস্কৃতির ঢালাও সুযোগ সৃষ্টি করা হল। শুরু হলো ক্যাবারে নৃত্য, অশ্লীল নাটক, পর্নোগ্রাফার ছড়াছড়ি। কয়েকটা ইংরাজী 'মড পত্রিকা' এসে ফ্যাসন বদলে দিল।

সত্তরের সেই সন্ত্রাসের দিনে রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা ও গানের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সত্তরের পশ্চিমবাংলা দেখেননি। তিনি জীবিত থাকলে এবং দেশীয় শাসকের আধা-ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাস দেখলে শিউরে উঠতেন। তার হৃদয় উৎপীড়িত হয়ে উঠত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সত্তরের দশকে তাদের কর্তব্য পালন করেন নি। অথচ পরাধীন দেশের নাগরিক হয়েও কবি রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজমের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর লেখনী ধরেছেন

এবং মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সত্তরের পশ্চিমবাংলায় যখন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের মত একজন কবির বড় বেশী প্রয়োজন ছিল, যিনি বলতে পারতেন : নিরর্থ হাহাকারে / দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে। / পাপের এ সঞ্চয় / সর্বনাশের পাগলের হাতে / আগে হয়ে যাক ক্ষয়। বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড / বিদীর্ণ হয়ে, তার / কলুষপুঞ্জ করে দিক উদ্গার। / ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক বিজ্ঞানী হাড়গিলা / রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর / একদিন হবে ঢিলা।[১১]

সত্তরের পশ্চিমবাংলার সন্ত্রাস পর্যালোচনা করলে একটা কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে, সে সময় মানুষজন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাংলার মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়েছিল। যখন জেলের মধ্যে নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর গুলি বর্ষিত হচ্ছে, তখন মানুষ নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করতে সাহসও পায়নি। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শুধু সোচ্চার হয়েই ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে তিনি ইংরেজের দেয়া 'স্যার' (নাইট উপাধিও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সত্তরের দশকে স্বদেশীয় শোষকরা যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্মম ভাবে মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যালীলা চালাচ্ছিল, তখন পদ্মভূষণ বা পদ্মবিভূষণ পাওয়া দেশের একজন কৃতি সন্তান বা বুদ্ধিজীবীকেও ঐ সকল উপাধি ফিরিয়ে দিতে দেখা গেল না। তবে একথা উল্লেখ না করলেই নয় যে সেদিন প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং মানুষকে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন। সেদিন বিভিন্নভাবে তারা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেও দ্বিধা করেননি[১২]। অনেকে নির্যাতন ভোগও করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দেখা গেল সত্তরের দশকের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গে যখন ১৯৭১ সাল থেকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে আধা ফ্যাসিষ্ট কায়দায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মানুষ তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু যখন ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার মাধ্যমে ভারতের শাসকশ্রেণী মানুষের সমস্ত বাক্-স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, তখন ভারতবর্ষের মানুষ বুঝেছিলেন যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ কি। সেই সময় থেকে ফ্যাসিবাদী ভারত সরকারকে উৎখাত করার প্রস্তুতি

ভারতের মানুষ নিতে আরম্ভ করলেন। কংসের কারাগারে যেমন অত্যাচারী কংসকে নিধন করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, সেইরকম তদানীন্তন আধা-ফ্যাসিবাদী শাসকদের উৎখাত করবার জন্য তাদের বিকল্প হিসাবে জনতাদলের আবির্ভাব ঘটল। যদিও সেইসময়কার ভারতের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র এবং জনতাদলের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু ১৯৭৭ সালে যখন ভারতের মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলেন, সেই মুহূর্তে তারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটিয়ে জনতাদলের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করলেন। এরা ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রের অধান ছাটাই কর্মচারীদের চাকুরী ফিরিয়ে দিলেন। পরে এদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের ফলে কেন্দ্রে এরা জনতা সরকার টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেন না।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে ১৯৭৭ সালে কায়েম হয়েছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার। এরা এসে প্রধান যে কাজ করেছিলেন, তা হল বিনাবিচারে সমস্ত বন্দীদের মুক্তিদান। সেইসঙ্গে মানুষের সব রকম গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়ে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিম বাংলার মানুষ আবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজেদের সংগঠিত করবার সুযোগ পেয়েছেন। তাই দেখা যায়, এখানে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী এবং সকল স্তরের শিক্ষকরা ট্রেডইউনিয়ন করবার স্বাধীনতা পেলেন। একথা সকলেরই জানা যে, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী 'white coloured people' হিসাবে ট্রেডইউনিয়ন করার অধিকারী নন, তথাপি পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সরকার হওয়ায় তারা স্বাধীনভাবে ট্রেডইউনিয়নের কাজ চালাতে আরম্ভ করলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সালের কালোদিনগুলো অপসারিত হতে থাকলো। মানুষ বিবেক অনুযায়ী নিজেদের চলার পথ পেয়ে গেলেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ চিরকাল যুক্তিবাদী মানসিকতায় বিশ্বাসী। মনে রাখা দরকার এই বাংলার মাটিতে মুক্তি-যুগের পথিকৃৎ ডিরোজিও জন্মেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসবাদ স্থায়ীভাবে আসীন হতে পারেনি। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী সন্ত্রাসমুক্ত বাতাবরণে চলাফেরা করতে পারছেন। আগামী দিনে এই সন্ত্রাসমুক্ত আবহাওয়াকে চোখের মণির মত টিকিয়ে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই।

সর্বশেষে একটি কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার ফ্যাসিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের

বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনমনে এদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। এরজন্যই প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকাকে তুলে ধরা। তবেই মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছতে পারবেন এবং তখনই তিনি হয়ে উঠবেন শোষিত মানুষের প্রকৃত বন্ধু।

আজকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ জেগে উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গেও গোর্খাল্যাণ্ডপন্থীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। ফ্যাসিবাদও তার পথ পেয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে। তবে আশার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের মত ফ্যাসি-বিরোধী কবি যে মাটিতে জন্মেছিলেন এবং ভারতের প্রথম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিশ্বে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবলগ্নে তাঁর কলম ধরেছেন, সেখানে সন্ত্রাসবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ফ্যাসিবাদের স্থান করে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের সংগে পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। হিজলী জেলে যখন নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কারারক্ষীরা গুলি চালিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সে সময় অসুস্থ শরীরে দেশের অগণিত মানুষের সাথে মনুমেণ্টের পাদদেশে এসে ভাষণ দান করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাংলার মানুষ সেইরকম অমিতবিক্রমে এই অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে যে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীরূপে বারে বারে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের কলম ধরেছেন এবং যারা প্রগতিশীল শিল্পীগোষ্ঠীর নন, তারাও প্রতিবাদে মুখর হবেন, এ আশা করা যায়।

সূত্র নির্দেশিকা

১ ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান, ৫ আগষ্ট, ১৯২৬। ইংরেজী থেকে অনূদিত। প্রসঙ্গত বাংলার ফ্যাশিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য [১৯৭৫], পৃঃ ৫-৬ দ্রষ্টব্য।

২ বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, জুলাই ১৯২৭, পৃঃ ১৯২-১৯৩। ইংরাজী থেকে ভাষান্তর। ঐ। পৃঃ ৮-৯।

৩ বাংলার ফ্যাশিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা। ১৯৭৫, পৃঃ ১৪-১৫।

৪. বাংলার ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য / মনীষা [১৯৭৫], পৃঃ ১৭-১৮।

৫. মাসিক প্রবাসী মাঘ, ১৩৪৪ পৃঃ ৫৬-৫৭। দ্রষ্টব্য: বাংলার ফ্যাশিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য। ঐ পৃঃ ১৮-১৯।

৬. প্রান্তিক / রবীন্দ্রনাথ : ১৭ সংখ্যক কবিতা।
৭. জন্মদিন কবিতা।
৮. যুগান্তর, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১।
৯. Peoples Democracy, 19 Sept. 1971
১০. সাপ্তাহিক দেশ, ৩০ মে, ১৮৭০
১১. প্রায়শ্চিত্ত, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ [১৭ আশ্বিন], ১৯৩৮।
১২. গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী ও গণনাট্য সংঘ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. বাংলার ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য : মনীষা প্রকাশিত, ১৯৭৫।
২. সাহিত্য সংস্কৃতি ও নারীসমাজ / অনুশীলা দাশগুপ্ত, ১৯৮৬।
৩. ফ্যাসিজম কিভাবে আসে / কল্পতরু সেনগুপ্ত, ১৯৭২।
৪. পুলিশী সন্ত্রাসে পশ্চিমবাংলা, ১৯৭৭।
৫. নন্দন, শারদ সংকলন, ১৩৯১।
৬. যুবমানস, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, মে-জুন, ১৯৮৫।

নেপাল মজুমদার

বন্দীহত্যা বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সারা ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাস থেকে। এই সময়ই 'সারা ভারত ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ' (*All India Civil Liberties Union*) গঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার 'অনারারি প্রেসিডেন্ট' নির্বাচিত হন, আর সরোজিনী নাইড়ু হন এর চেয়ারম্যান। জুলাইয়ের শুরুতেই বাংলায় এর একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য, বাংলায় কিন্তু এর বহু আগেই বন্দীমুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হিজলীর গুলী চালনোর প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে যে বিক্ষোভ সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ করেন, সেই সভাতেই রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয়[১]। স্বয়ং ডাঃ নীলরতন সরকার ঐ সভায় যে কয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার শেষ তিনটি ছিল এই :

(৩) কলিকাতার নাগরিকগণের অভিমত এই যে, যে আইনের বলে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে বিনাবিচারে লোককে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখিবার অধিকার দান করা হইয়াছে, ঐরূপ আইন সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতির এবং যে আইনের বলে হিজলীর এই নৃশংসতা সম্ভবপর হইল, উহাকে শাসন অধিকারের বিষম অপব্যবহারই হইয়াছে।

(৪) কলিকাতার নাগরিকগণের এই সভা দাবী জানাইতেছেন যে, হিজলীর ব্যাপার সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধাসম্পন্ন একটি কমিটি দ্বারা অবিলম্বে তদন্ত করান হউক।

(৫) (১) বাংলার নাগরিকগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, (২) এই ধরণের আইন সকল বাতিল করিয়া দিবার জন্য, (৩) বাংলায় যাহাতে আর এরূপ নৃশংস কাণ্ড না ঘটে তাহার ব্যবস্থার জন্য, (৪) রাজবন্দীদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের

যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্পূরণের জন্য এবং চট্টগ্রামে বিপন্ন অত্যাচারিতদিগের কষ্টের লাঘবের সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ও ঐ জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক।

উল্লেখযোগ্য, হিজলীর ঘটনার পর কংগ্রেসের সেনগুপ্ত ও সুভাষপন্থীদের অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটে এবং উভয় গোষ্ঠীর মিলিত উদ্যোগেই ঐ দিনই সভাস্থলে উপরোক্ত কমিটি গঠিত ও কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হলেন এই কমিটির প্রেসিডেন্ট। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডা নীলরতন সরকার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জে এম সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, বীরেন শাসমল, তুলসী গোস্বামী প্রমুখ আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

কিন্তু সবচেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের কথা এই যে হিজলীর গুলি চালনার প্রতিবাদে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে কোন বিবৃতি কিংবা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হলো না। ২৬ সেপ্টেম্বরের ঐ ঐতিহাসিক সভাতে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাই কমাণ্ডের সমালোচনা করলেন। এই ঘটনার প্রায় মাস দেড়েক পর ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্য হিজলী ও গুলিচালনার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। রামানন্দবাবু তার শ্লেষের সঙ্গে 'মর্ডান রিভ্যু'তে মন্তব্য করলেন: Better late than never...

When Sardar Patel said some time ago that nothing was done till then because the Congress authorities in Bengal had not given him information about those terrible events (though the Bombay and other dailies must have published news relating thereto), his words sounded like many replies of the Secretary of State for India in parliament that he had no official information[২].

এর অল্পকাল পরেই[৩] গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা এবং গান্ধীজীর দেশে প্রত্যাগমন। পুনরায় সংগ্রাম সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। জওহরলাল, খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ কয়েকজন নেতা গান্ধীজী ফেরার আগেই গ্রেপ্তার হন। ২ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র এবং ৩ জানুয়ারি স্বয়ং গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। কলকাতায় তখন রবীন্দ্র জন্মোৎসব (৭০ বৎসরপূর্তি) ও মেলা চলছে। খবর পেয়েই কবি সমস্ত

অনুষ্ঠানসূচী বাতিল করে দিলেন। ঐ দিনই[৪] তিনি গান্ধীজী প্রমুখ নেতাদের প্রতিবাদে এক বিবৃতি দিলেন। দেশের সমস্ত পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়।

এরপর ওয়ার্কিং কমিটির সব নেতাই এবং সেই সঙ্গে দেশের ছোট-বড অজস্র কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। ১৯৩০ সাল থেকেই বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রবল হয়েছিল, এই সময় তা প্রবলতর হয়। অর্ডিন্যান্স-এর পর আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা হয়। পুলিসের অত্যাচার ও পীডনের মাত্রা ছাডিয়ে গেল।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইংরেজ সরকারের এই হিংস্র দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠালেন : The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representatives for peaceful political adjustment.[৫]

এ ছাডাও ইংলণ্ডের বিবেকী মানুষকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বোক্ত বিবৃতিটি বিলেতের *Spectator* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। পত্রিকা সম্পাদকের উদ্দেশে কবি তাঁর পত্রের শুরুতেই লিখলেন : Sir—The bahayiour of the panic stricken Government has started the nation and has compelled me to come out with the following message to my own people who have been provoked to intense indignation suppressed by force

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামী ভূমিকা নূতন কিছু নয়। যৌবনের সূচনাকাল থেকেই ইংরেজের নির্যাতন ও দলননীতির বিরুদ্ধে তিনি নিন্দা ও কর্মীদের মুক্ত করে আনার জন্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যও তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। স্মরণ রাখা দরকার, ১৮৯৭ সালে র‍্যাণ্ড-হত্যার (W. C. Rrnd) পর যখন তিলক ও নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তার প্রতিবাদে বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথই তার পুরোভাগে এসে দাঁডিয়েছিলেন। তিলকের ডিফেন্সের জন্য যখন বোম্বাইয়ে কোন কৌঁসুলিও পাওয়া গেল না, তখন রবীন্দ্রনাথ, হীরেণ দত্ত, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন

সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে প্রায় ১৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দুজন অভিজ্ঞ ইংরেজ ব্যারিস্টারকে তিলকের ডিফেন্সের জন্য পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশুতোষ চৌধুরীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁরই অনুরোধে আশুতোষ চৌধুরীর ভাই যোগেশ চৌধুরী ঐ ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের জুনিয়র হিসেবে মামলা পরিচালনার জন্য বোম্বাইয়ে যান। উল্লেখযোগ্য, সেই সময়[৬] তিলকের কেশরী পত্রিকাকে উপলক্ষ করে দেশের সমস্ত পত্রপত্রিকার কণ্ঠরোধ করার জন্য *The Vernacular press Act* পাস হয়। এই কুখ্যাত প্রেস আইনটি পাস হওয়ার আগের দিন রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে আহূত প্রতিবাদসভায় তার ঐতিহাসিক 'কণ্ঠরোধ' ভাষণটি পাঠ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, মহাযুদ্ধকালে ভারতরক্ষা আইন, রাওলাট অ্যাক্ট ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সেই একই মহান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিশ্রুত কবির এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ইত্যাদিকে কোনরকম আমলই দিলনা, পরন্তু তার পৈশাচিক দলননীতিকে উত্তরোত্তর প্রবলতর করে তুলতে থাকে। ১৯৩২ এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সারা দেশে কম করে ১৭টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এর অল্পকাল পরেই 'কালাকানুন' দুটি পাস্ হয়। ১৯৩২ সালের ১ সেপটেম্বর *Bengal Criminal Law Amendment Act 1932* এবং তার মাত্র ৫ দিন পর—৬ সেপ্টেম্বর *Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act 1932*[৭] পাস হয়। শত শত বাংলার যুবককে বিনাবিচারে আটক অথবা অন্তরাণাবদ্ধ কিংবা সুদূর আন্দামানে নির্বাসিত করা হলো। এক কথায় এণ্ডারসনী দমন নীতিতে সারা বাংলাদেশটাই একটা কয়েদখানায় পরিণত হলো।

ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই কালে তাঁর বিবৃতি ও চিঠিপত্রে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছিলেন। ইংরেজের পৈশাচিক দলনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে কবি এই সময় জনৈক ইংরেজ বুদ্ধিজীবীকে লিখলেন: ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুত গতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে। পীড়ন ও প্রতিহিংসায় বিরামবিহীন চক্রের আবর্তনক্রমে সন্দেহ এবং শত্রুতার দ্বারা পৌরজীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ভারতের শাসক এবং শাসিতের মধ্যে নৈতিক অবস্থার ভীষণ দুঃখ-কষ্টের দৃশ্য শুধু যে ক্রমেই অধিকতর বেদনাকর এবং

কষ্টদায়ক হইয়া উঠিতেছে এমন নহে, আমাদের মহাদেশ যে পিছু হটিয়া আদিম যুগের বর্বরতার গর্ভে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে, উহাতে তাহারই পূর্বাভাস সূচিত হইতেছে।[৮]

এণ্ড্রুজের মাধ্যমে কবি এই সময়ে বিবেকী ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে এক আবেদন জানালেন। ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিলেতে এক জনসভায় এণ্ড্রুজ সেটি পাঠ করলেন:

'আমাদের অবস্থা পশুবৎ। আপনার দেশের লোকের খাতিরে আমি ভরসা করি যে, এখনও এমন ইংরেজ আছেন যাঁহারা এই লজ্জাজনক অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ।'...

বলাবাহুল্য, এ সব আবেদন নিবেদনে কোনই ফল হয় না। অত্যাচার ও পীড়ন সমানে চলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলা যায়, 'ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ—কোথাও সে আপনার বুট জোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজী নহে।[৯]

এর কয়েক মাস পরেই আন্দামান সেলুলার জেলে বিপ্লবী বন্দীরা (৩২ জন) কতকগুলি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। গভর্নমেণ্ট খবরটা চেপে রাখে। ২৮ মে এক সরকারী প্রেসনোটেই এই সংবাদ প্রথম লোকে জানতে পারে। দীর্ঘদিন অনশনের পর বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হয়ে উঠতে থাকলে জেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বলপ্রয়োগ করে খাওয়াতে চেষ্টা করে। তার ফলেই 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার' আসামী মহাবীর সিং-এর মৃত্যু হয় (১৭ মে)। কয়েক দিন পর মানকৃষ্ণ নমঃদাস ও মোহিতমোহন মৈত্র নামে অপর দুজন অনশনরত বন্দীও মারা যান (২৬ ও ২৮ মে)।

এই সংবাদে কলকাতায় এবং সারা বাংলায় দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ৩০ মে কলকাতায় এলবার্ট হলে মেয়র সন্তোষ বোসের সভাপতিত্বে এক জনসভায় এই ঘটনায় তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করবার এবং বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান হয়। সভায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

'সর্বসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হইতে রাজবন্দীদিগকে দ্বীপান্তর প্রেরণ করিবার জন্য পুনরায় আন্দামানে সেলুলার জেল খোলা সম্পর্কে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন। এই সভা এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, জনমতের প্রভাবে তাহাদের বন্দীজীবন যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দকর হয় এবং

জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অধিকতর খোঁজখবর যত্নসহকারে লইতে পারেন তজ্জন্য আন্দামানে প্রেরিত রাজবন্দীগণকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক।'

এই সভার গুরুত্ব খুবই। সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্বে এইটিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জনসভা যেখানে কলকাতার ও বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের সূচনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিংএ। বলাবাহুল্য কলকাতায় উপস্থিত থাকলে তিনিই যে সভার সভাপতিত্ব করতে এগিয়ে আসতেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব খবরে কবি দার্জিলিংএও স্থির থাকতে পারলেন না। বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হয়ে আসছে দেখে ৯ জুন (১৯৩৩) তিনি দার্জিলিঙ থেকেই আন্দামানের বন্দীদের অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানালেন: 'Give up hunger strike'। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এবং দেশের অন্যান্য নেতাদের অনুরোধেই আন্দামান বন্দীরা দীর্ঘ ৪৫ দিন পর তাঁদের অনশন ভঙ্গ (২৬ জুন) করেন।

এর প্রায় মাস দেড়েক আগে গান্ধীজী সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ৯ মে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ আণে ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। এর পর গান্ধীজী 'হরিজন' সমস্যা নিয়ে অনশন ও আন্দোলন করতে লাগলেন অথচ আন্দামানে অনশনরত বন্দী ও রাজবন্দী সমস্যা সম্পর্কে তাকে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল না—কংগ্রেসের যেসব সর্বভারতীয় নেতা বাইরে ছিলেন তাঁদেরকেও না। এইটাই হলো সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা।

উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের (২৯ মে, ১৯৩৩) কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামনি, পঃ মালব্য, বিশ্বেশ্বরাইয়া প্রমুখ দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ভারতসচিব এবং প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্টকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার আবেদন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠালেন (৫ জুন, ১৯৩৩)।[১০]

আবেদনের শুরুতেই বলা হয়:

'মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কর্তৃক আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখায় দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মনে যে প্রবল মনোভাব

দেখা দিয়াছে আমরা তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। **যে সব রাজনীতিক বন্দী বিনাবিচারে আটক আছে, অথবা হিংসামূলক কার্যে সংশ্লিষ্ট নয়, অধিকাংশ অর্ডিন্যান্সসমূহ অথবা বিশেষ আইনসমূহ দণ্ডিত হইয়া কারারুদ্ধ আছে, তাহাদের মুক্তিদান করিবার সময় আসিয়াছে।** বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, তাহার গঠনে সাহায্য করার জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করা হইলে তাহা খুব মূল্যবান হইবে, উহা করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।'

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকেই এই তারবার্তায় স্বাক্ষরদান করেন। সবার আগেই তাঁর স্বাক্ষর ছিল। জুলাই মাসের প্রথমভাগেই কবি দার্জিলিং থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। মাস দুই পর—সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতেই কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসেন।

আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে কলকাতায় তখনও আন্দোলন চলছে। গভর্ণমেণ্ট আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ দেশের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আন্দামানবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে এক আবেদন-বিবৃতি প্রকাশ করলেন (৫ সেপ্টেম্বর)। আন্দামানবন্দীদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা সমর্থন করে এই দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে বলা হয়:

উপসংহারে আমরা গভর্ণমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি,—যে শতাধিক বন্দীকে প্রবল জনমত উপেক্ষা করে আন্দামানে নির্বাসিত করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক এবং রাজনৈতিক বন্দীই হউন বা সাধারণ বন্দীই হউন বন্দীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণের নীতি অতঃপর পরিত্যক্ত হউক।[১১]

বলাবাহুল্য, এই বিবৃতির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল। এছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বাসন্তীদেবী, সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, এনড্রুজ, চিন্তামনি, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, বি. জি হর্নিম্যান, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামানন্দবাবু প্রমুখ আরও কয়েকজন এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

বস্তুত এই ঘটনা উপলক্ষেই কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম সারির নেতাকে এই ধরণের আন্দোলনে যুক্ত হতে দেখা যায়। কিংবা গান্ধীজীকে তখনও পর্যন্ত আন্দামানের কিংবা রাজবন্দী আন্দোলনে আদৌ কোন গুরুত্ব দিতে দেখা যায় না।

এই ঘটনার মাস ছয়েক পর—৩ এপ্রিল (১৯৩৪) গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে এক বিবৃতি দিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট খুবই খুশি হলো। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগ্ ঘোষণা করে দিলেন : কংগ্রেস দল গান্ধীজীর ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে নিলে গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবে এবং আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দেবে। কিন্তু বিপ্লবীদের কিংবা বাংলার ডেটিনিউ বা রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে তিনি 'টুঁ' শব্দটিও উচ্চারণ করলেন না।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই বিবৃতি পাঠ করে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিলেও বাংলার রাজবন্দীদের কিছুতেই দেবেন না। ১৮ এপ্রিল (১৯৩৪) কবি শান্তিনিকেতন থেকে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে'র মাধ্যমে এক বিবৃতিতে বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন :

I am glad to read the Home Member's statement promising release of Civil Disobedience prisoners if calling off movement is ratified by the Congress For, any further Detention of prisoners after ratification will be interpreted as showing a spirit of persecution not worthy of a Government that claims to be civilised I hope that the Viceroy's generosity will rise equal to the occasion and give Bengal detenues also a chance to appreciate the Governments goodwill

I appeal to the Government to strive for that dignity which based on its claim to appreciation of human values and not on its mere assertion of power [১২]

বলাবাহুল্য এরপর কয়েকজন প্রবীণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতা মুক্তি পান। সত্যাগ্রহী বন্দীরাও আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে থাকে কিন্তু বাংলার রাজবন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের একজনও মুক্তি পেলেন না।

এর পরের ইতিহাস সকলেরই সুবিদিত। গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' আন্দোলন

এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ গঠনের আন্দোলনেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। কংগ্রেসের যে সব নেতা বাইরে ছিলেন তাঁরা 'হোয়াইট পেপার', কাউন্সিল প্রবেশ আর 'ভারত শাসন আইন' (১৯৩৫) ইত্যাদি নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতে থাকেন। আর রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা জেলখানায় পচতে লাগলেন। বস্তুত ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির জন্য দেশজোড়া কোন আন্দোলনই হয়নি, — এই রকম কোন কার্যসূচী গ্রহণের চিন্তাই কংগ্রেস নেতৃত্বের মাথায় আসেনি।

এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই প্রথম দেশজোড়া রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনের কার্যসূচী আলোচিত ও গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য, সুভাষচন্দ্র লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার করা হয় (৮ এপ্রিল)। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ১০ মে দিবসটিতে সারা দেশে সভা সমিতি করে বিক্ষোভ জানাবার আবেদন জানান।

৯ মে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন। পরদিন ১০ মে ছিল 'সুভাষ-দিবস'। এই উপলক্ষে কবি তাঁর বাণীর উপসংহারে বললেন:

এই সঙ্গেই এই বাংলাদেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দীশালায়। বিচারের দাবী করচিই, সেই দাবীর পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করচে অপরিমিতকাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকার আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোনদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তা হলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে-বিদেশে।[১৩]

এর অল্পকাল পরেই জওহরলাল 'সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি' (*All India Civil Liberty Union*) গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কমিটির উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এর অনারারী প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। বলাবাহুল্য, কবি তাতে সানন্দে সম্মতি দেন (২৮ জুলাই)।

উল্লেখযোগ্য, সারা ভারত কমিটি গঠনের আগেই বাংলা এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১ জুলাই বাংলায় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির' ৩১জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ২৬ জুলাই মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে কলকাতার এক জনসভায় এর একটি গঠনতন্ত্রও রচিত হয়। এর অল্পকাল পরেই বাংলাদেশে বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে বাংলার দুইজন রাজবন্দী আত্মহত্যা করায় বাংলাদেশে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ থানার রাজবন্দী নবজীবন ঘোষ আত্মহত্যা করেন। তার কয়েকদিন পরেই এই সম্পর্কে সরকারি তদন্তের ত্রুটির অভিযোগ এনে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র কেন্দ্রীয় পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায় (৫ অক্টোবর)। এর অল্প কয়েকদিন বাদেই ১৭ অক্টোবর দেউলি বন্দীশিবিরে রাজবন্দী সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার সংবাদ এসে পড়লে সারা বাংলাদেশেই দারুণ আলোড়ন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তিনি যে কী মর্মান্তিক আঘাত পান তা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকাল থেকেই তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতিদান এবং আন্দোলন করে আসছিলেন। বলা বাহুল্য ইংরেজ সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। শেষ পর্যন্ত কবি ও ব্যাপারে কিছুটা যেন নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পর পর দুইজন রাজবন্দীর আত্মহত্যার সংবাদে কবি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কবি 'ভারতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের' (*All India Civil Liberties Union*) সভাপতির পক্ষ থেকেই ঐ দুইজন রাজবন্দীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তাদির দাবি জানিয়ে ইউনাইটেড প্রেসের মারফৎ এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেন (২০ নভেম্বর, ১৯৩৬)। বিবৃতির মর্মার্থ ছিল এই :

সম্প্রতি বাংলার দুইজন রাজবন্দী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহাদের আত্মহত্যা আমাদিগকে রাজবন্দীদের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আবার আমাদিগকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছে। আমি ভারতীয় ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি। আমার করিবার সীমা এই পর্যন্ত যে, আমি এই সকল বিষয় জনসাধারণ এবং বাংলা সরকারের নিকট উপস্থিত করিতে পারি ও এতৎ সম্পর্কে

তদন্তের জন্য আবেদন করিতে পারি। বহু বৎসর যাবৎ বাংলার সহস্র সহস্র নর-নারী বন্দীনিবাসে দুর্বল জীবনযাপন করিতেছে। ইহাদের জন্য বিচারের অভিনয় মাত্রও হয় নাই। বাংলা তাহার এই অগণিত সন্তানের মর্মজ্বালা সহ্য করিতেছে। এই লোকগুলির জীবন নষ্ট হইয়াছে, পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রদেশ এবং সমগ্র ভারতের উপর এক অপরিসীম বেদনার মেঘ ছায়াপাত করিয়াছে। এই অবস্থা অসহ্য হওয়ায় কোন কোন রাজবন্দী জীবিকার্জনের জন্য একটু স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের এটুকু স্বাধীনতাগ্রহণও সহ্য করা হয় নাই। তাহাদের উপর আরোপিত নিষেধবিধি নামমাত্র ভঙ্গ করিবার অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার এবং দণ্ডিত করা হয়।

এই দুইজন রাজবন্দীর আত্মহত্যা সম্পর্কে তদন্তের আবশ্যক। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য এবং কি অবস্থায় পড়িয়া রাজবন্দীগণ আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়, সে সম্পর্কে তদন্ত করা দরকার। জনসাধারণ কি সরকার, কেহই এই সকল ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কাজেই সরকার একটা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াই আমি আশা করি। **নিরপেক্ষ তদন্তের পরিবর্তে পুলিশ এবং বিচারবিভাগীয় তদন্ত বা রিপোর্টের উপর নির্ভর করা কোন ক্রমেই চলিবে না।** এই আটক রাখার নীতির সহিত আমাদের শতশত তরুণ-তরুণীর ভাগ্য জড়িত—এই নীতি দেহকে ধ্বংস করিতেছে মনকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছে।[১৪]

এর মাসখানেক পর —ডিসেম্বরের শেষ ভাগে ফৈয়জপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ফৈয়জপুর কংগ্রেসে ঠিক হয় আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করবে। এ ছাড়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নেও একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনতিকাল পরেই কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে রাজবন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে কয়েকটি সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়। বস্তুত এই কারণেই বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছিল।

প্রদেশগুলিতে নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করেন। মোট ১১টি প্রদেশের ৫টিতে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে কংগ্রেস যেসব শর্তাদি দেয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তা মানতে অস্বীকার করায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—বিশেষ করে বাংলায়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসতে পারায় কৃষকপ্রজা

পার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব কতকটা বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আঁতাত করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১ এপ্রিল হক সাহেবের নেতৃত্বে এই মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য, বন্দীমুক্তির ব্যাপারে এই 'প্রজালীগ সরকার' বেশ কঠোর মনোভাবই অবলম্বন করলেন। প্রধানমন্ত্রী হকসাহেব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেব উভয়েই মাস দুয়েকের মধ্যেই জানিয়ে দিলেন : রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলে জনশান্তি বিপন্ন হবে।

ইতিমধ্যে বাংলার 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ'ও সংগঠিতভাবে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রসর হতে থাকে। ২২ নভেম্বর (১৯৩৬) সঙ্ঘের একসাধারণ সভায় অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতির রচিত নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং 'বঙ্গীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ' স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। কলকাতার ও মফঃস্বলের ৪১ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ২৪৯নং বৌবাজার স্ট্রীটে সঙ্ঘের অফিস ঘরও খোলা হয়। কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করে কয়েকটি বিবৃতিও প্রকাশ করেন। সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার পর—১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) এই কার্যনির্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। তাতে যাঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব বা হরণ করা হচ্ছে তাঁদের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে একটি 'ডিফেন্স কমিটি' গঠন করা হয়। তাছাড়া কমিটি রাজনৈতিক নির্যাতিত কর্মীদের পরিবারবর্গের আর্থিক সাহায্যদানেরও চেষ্টা করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই সব সমস্যা এবং কার্যসূচী ইত্যাদি জানিয়ে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অকাতরে অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন-বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই আবেদন বিবৃতিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর দেন। পূর্বেই বলেছি কবি সারা ভারত কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

এই আবেদন-বিবৃতির শেষাংশে বলা হয় :

ভারতের যদি কোন প্রদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা একমাত্র বাংলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। অন্য কোন প্রদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এইরূপভাবে খর্ব করা হয় নাই এবং এখনও বাংলাতেই খর্ব করার মাত্রা সমধিক। তথাকথিত সমস্ত জরুরী আইন, রেগুলেশন,

অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি জারি হওয়ায় নাগরিকগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। **বিনাবিচারে বন্দী করা, বিচারে মুক্তিলাভের পর পুনরায় গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করা, সভা সমিতি ও বক্তৃতা করিবার অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা, স্বাধীন চিন্তা এবং মত প্রকাশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রকে আইন দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে অবদ্ধ করা এবং আরও বহুপ্রকারে সাধারণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করাই হইতেছে আজিকার বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।**

সাধারণ আইন-সমূহের পরিবর্তে জরুরী আইন ও নিয়ম জারি করা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে জনসাধারণের সকলপ্রকার কল্যাণকর কার্য ব্যাহত হইতেছে। এই সকল কারণে কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন বহু ব্যক্তিও এইরূপ কার্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সরকার এবং অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকার খর্ব করিবার চেষ্টা করে, 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ' উহার সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়া উক্ত কার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন করিবে।

আমাদের এই সকল কার্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জনসাধারণের নিকট অর্থের জন্য আবেদন করিতেছি। কেহ যেন না বলিতে পারেন যে এই সঙ্ঘ কোন দল বা সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যেই যাঁহারা নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা হাজারে হাজারে এই সঙ্ঘের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন বলিয়া আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

পূর্বেই বলেছি, এই আবেদন বিবৃতির প্রথমেই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। এ ছাড়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, অখিল দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি সি চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র প্রসাদ বসু (সভাপতি, বঃ প্রাঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ), সনৎকুমার রায়চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ) মৃণালকান্তি বসু, সন্তোষকুমার বসু, সত্যানন্দ বসু, জে. এম দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, বরদাপ্রসন্ন পাইন, তুলসী গোস্বামী, রাধাকুমুদ মুখার্জী, কিরণশঙ্কর রায়, কমলকৃষ্ণ রায়, মুজফ্ফর আহ্মদ, কামিনী কুমার দত্ত, মুজিবর রহমান, সীতারাম সাক্সেরিয়া প্রমুখ আরও অনেকেই এই আবেদন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা পরিচালনা এবং দুঃস্থ ও পীড়িত বন্দীদের

আর্থিক সাহায্য দান ছাড়াও কমিটি একটি খুবই উল্লেখযোগ্য কাজে হাত দেয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পুলিসী অত্যাচার ও নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে দিনের পর দিন তাঁরা সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকেন। রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের নামের তালিকাও তাঁরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন।

অবশেষে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় (৭ জুলাই, ১৯৩৭)। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া শুরু হলো। কিন্তু বাংলায় হক-নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার তাতে বিন্দুমাত্রও টনক নড়ল না, রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে তারা তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বাংলাদেশে তখন রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময়ই আন্দামানের নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীরাও তাঁদের দেশে ফিরে পাঠাবার দাবিতে পুনরায় অনশন শুরু করে দেন। এবারের খবরটা কিন্তু ইংরেজ সরকার বেশ কিছুদিন চেপে রেখেছিল। খবরটা প্রকাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে সারা দেশে বিশেষ করে বাংলায় প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ২ আগস্ট টাউন হলে এ ব্যাপারে এক বিক্ষোভ সভা ডাকা হলো। বাংলার নেতারা রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে ধরলেন, সভায় সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। কবি তাতে সানন্দে সম্মতি দেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় টাউন হলের জনসভায় কবি আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে তার ঐতিহাসিক ভাষণদান করেন। এই ভাষণে কবি শুধু আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনারই দাবি করলেন না, সেই সঙ্গে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার দাবি করতেও তিনি ভুললেন না। কবি তাঁর ভাষণের (এদিন কবি ইংরাজীতেই ভাষণ দেন।) শুরুতেই বলেন :

…আজিকার সন্ধ্যায় আমি ন্যায়বিচার ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতেছি। এই আহ্বান উপেক্ষা করিলে বিপদ অনিবার্য।

এক সপ্তাহের অধিক হইল আন্দামানে দুই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনশনের সংবাদ প্রথমত চাপা দেওয়া হইয়াছিল। দেশবাসীর হৃদয়বৃত্তির প্রতি এই হৃদয়হীন উপেক্ষা আমাদের জাতীয় অসহায় অবস্থাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংলণ্ড বা অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশের গভর্ণমেণ্টই এই অনশনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এতদিন গোপন রাখিতে সাহস পাইত না। •

রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য। এই দেশে গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাহারা রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষে রাখিবার দাবী করিতে পারে।...

ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশে গণ প্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হইযাছে।

শুধু বাংলাদেশেই প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোন তোযাক্কা রাখেন না, বাংলায ব্যক্তি-স্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।

জগতের অধিকাংশ দেশের দণ্ডবিধিতে যে শাস্তিদানের নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে, উহাই মানবসভ্যতার কলঙ্ক। তাহার উপর সম্প্রতি পাশ্চাত্যের কোনও কোনও প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিযা উঠিয়াছে। **ভারতবর্ষের গভর্নমেণ্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট-নীতি কতকটা সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই নীতি আইন এবং মানব স্বাধীনতার ন্যায্য দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।** শত শত বিপন্ন পরিবার হইতে উত্থিত নৈরাশ্যের উষ্ণশ্বাস এই ভাগ্যহত প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অনির্দিষ্টকাল বিনাবিচারে আবদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। আইনের যে আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যক তাহা সত্য, কিন্তু আজ আমার দেশবাসী আমাকে যে তাঁহাদের সহিত আইনের আমূল পরিবর্তনের দাবী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা নহে, উহার কঠোরতা হ্রাসের দাবী করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের গভর্নমেণ্ট বন্দীদিগকে ডেভিল দ্বীপে, লিপারী দ্বীপ বন্দী নিবাস, অন্যান্য বিশেষ ভাবে রচিত নরকপুরীতে প্রেরণ করিয়া মানবপীড়নের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড বন্দীদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে ঐরূপ কোনও কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়া তাহাদের দুঃখভার বৃদ্ধি করে না।

তাহাদিগকে শুধু পরাধীন জাতিদের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা যখন আতঙ্কিত হই, তখন এই বৈষম্য, আমাদের সকলের হৃদয় অপমানেও আহত হয়। আমার দেশের নামে আমি ইহারই প্রতিবাদ করিতেছি।[১৬]

সভায় আন্দামান বন্দীদের এবং রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন করে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়। কমিটির নাম হয়, 'আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য কমিটি'। রবীন্দ্রনাথ কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সভার শেষে আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের অবস্থার কথা জানতে চেয়ে এবং তাঁহাদের দাবির প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে কবির স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান হয় :

'Bengal anxious to know state of health of her exiled sons who are on hunger strike. The country is solidly behind you.'

১৪ আগস্ট আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে নিখিল ভারত আন্দামান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের এক সভায় কবি 'আন্দামান দিবসে'র তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করে একটি ভাষণ দেন। প্রচলিত দণ্ডবিধির মধ্যে শাসক শক্তিগুলির যে নির্দয় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ করার বীভৎস স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয় কবি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর ঐ ভাষণের এক জায়গায় বললেন :

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী, এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসঙ্গত। পাঠশালা থেকে পাগলা গারদ পর্যন্ত, এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মানুষের মনে যে বর্বর মরেনি, নির্দয়তায় সে রস পায়…জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজে দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশী অতিক্রম করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানার আশ্রয় গ্রহণ করে না থাকত, তা হলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের যে কোন জায়গাতেই ছোটো-বড়ো যে-কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে তলে সে আপন সীমানা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপে সভ্যনামধারী বড়ো বড়ো দেশে শাস্তিদানের দানবিক

দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভ্যতাকে যে রকম বিদ্রূপ করতে উদ্যত হয়েছে, তার মূল রয়েছে সকল দেশের সব জেলখানাতেই। অনেককাল থেকে অনেক খরচ করে শয়তানকে মানুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্যে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। **হিংস্রতার ঠগিধর্মউপাসক ফ্যাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এইসব জেলখানায়।**[১৭]

কবি তাঁর ভাষণের উপসংহারে বাংলার হক-খাজা মন্ত্রিসভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যক্ষ্মারোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের নিশ্চিতযোগ্য—এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি।

পূর্বেই বলেছি, দণ্ড প্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোন পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে, নির্জন কারাকক্ষ বাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনো প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধিপদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন, আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদ করব।[১৮]

কবির নির্দেশে ঐদিনই তাঁর সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তী বাংলার লাট স্যর জনএ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কবির মনের গভীর উদ্বেগের কথা নিবেদন করে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কবির অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। এদিকে অনশনরত আন্দামান বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে থাকলে কবি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ১৬ আগস্ট তিনি আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের, অনশনরত ত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে নিম্নলিখিত তারবার্তাখানি প্রেরণ করেন :

'Earnetly appeal to you (stop) your case taken up by the whole Nation (stop) Feel restoration of atmosphere favourable for discussion will be greatly helpful.'

ঐদিনই তিনি লাটসাহেব এণ্ডারসনের কাছে পুনরায় এক চিঠিতে অনশনরত বন্দীদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করলেন।[১৯]

ওয়ার্ধায় তখন ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলছে (১৪-১৭)। কংগ্রেসের 'প্রধান মন্ত্রীরা' (বা 'মুখ্যমন্ত্রীরা') এবং গান্ধীজী জওহরলাল প্রমুখ নেতারা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা, মাদকদ্রব্য বর্জন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদির বিষয়ে বহু আলোচনা এবং কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হলো। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে আন্দামানের বন্দীদের ফিরিয়ে আনা ও মুক্তির ব্যাপারে এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া বিশেষ কোন আলোচনা বা কার্যকর পন্থা নির্ধারণ করা হলো না। গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে তখনও পর্যন্ত বাংলার রাজবন্দী বা আন্দামানের অনশনরত বন্দীদের জন্য তেমন কিছু বলেন বা করেন নি।

উল্লেখযোগ্য, ১৩ আগস্ট বড়লাট নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য সমিতির সম্পাদক মোহনলাল শকসেনার পত্রের জবাবে যা লিখলেন তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল।

ভাইসরয়ের জবাব সংবাদপত্রে[20] প্রকাশিত হলে কবি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও ও জহরলাল প্রমুখ নেতাদের এ ব্যাপারে তেমন কিছু উদ্বেগ প্রকাশ কিম্বা সক্রিয় হোতে না দেখে তিনি খুবই আঘাত পেলেন। ২০ আগস্ট কবি শান্তিনিকেতন থেকে একই সঙ্গে জওহরলাল গান্ধীজীকে 'তার' করলেন:

'I have wired to Andamans prisoners to give up huger strike. Their lives must be saved. Hope you and Jawharlal will exert atmost influence.'

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই তারবার্তা পাওয়ার পর থেকেই গান্ধীজীকে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে দেখা যায়। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরও বেশ কিছুকাল যাবত তাঁকে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় নি। তিনি মাদক দ্রব্য বর্জন ও 'নঈ তালিম' ইত্যাদি নিয়েই এই সময়টা নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। বস্তুতঃ বাংলার বন্দীমুক্তি আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এই আন্দোলনের পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথের মত মহান কবির এগিয়ে আসার ফলেই এবং পূর্বোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপনের ফলেই গান্ধীজী আন্দামান বন্দীদের ও রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে এগিয়ে এলেন।

উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজী প্রথমেই আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের অনশন ত্যাগের জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ ও আশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানালেন। আর তাঁরা যে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না এবং অহিংসপন্থাকেই শ্রেষ্ঠপন্থা বলে বিশ্বাস করেন ('*belive in non-violence as the best method*')—এই মর্মে তাঁদের কাছ থেকে কথা পাবার জন্য তিনি বারবার চিঠি লিখতে থাকেন। আন্দামান বন্দীরা কিন্তু 'হিংস-অহিংসার' প্রশ্ন না তুলে শুধু এইটুকুই কথা দিতে রাজী হলেন যে, তাঁরা আর 'সন্ত্রাসবাদে' (*terroism*) বিশ্বাস করেন না। যাহাই হোক, এ রকম একটা কথা পাওয়ার অল্পকাল পরেই আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েক দফায় দেশে ফিরিয়ে এনে কয়েকটি জেলখানায় রাখা হয়।

এরপর রাজবন্দী এবং সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য বাংলায় আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। গান্ধীজী আন্দামান ও দেউলি প্রত্যাগত বন্দীদের সঙ্গে আলিপুর ও প্রেসিডেন্সী জেলে এবং পরে হিজলিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে পূর্বোক্ত মর্মে কথা পাবার চেষ্টা করতে থাকেন। বলাবাহুল্য, অধিকাংশ বন্দী ঘুরিয়ে আগের মতই জবাব দেন।

যাইই হোক, এর কয়েকদিন পর—১৮ নভেম্বর (১৯৩৭) বাংলা সরকার মোট ১৫৫০ জন রাজবন্দীর মধ্যে ১১০০ জনকে মুক্তি দেয়। বাকী ৪৫০ জন রাজবন্দীর জন্য বলা হয় যে, গান্ধীজীর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি পেলে ক্রমে ক্রমে তাঁদের ছাড়া হবে।

এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত রাজবন্দীদের স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন।[২১] এই বিবৃতিতে তিনি অবশ্য দেশকর্মীদের গান্ধীজীর উপদেশমত অহিংস আন্দোলনের পথেই চলবার পরামর্শ দেন। বলাবাহুল্য, দেশের সেই অবস্থায় কবির পক্ষে এই পরামর্শ দেওয়াই স্বাভাবিক হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য এর ঠিক মাস খানেক আগে লণ্ডনে ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এক সম্মেলন হয়। ১৭ অক্টোবর লণ্ডনের 'ট্রান্সপোর্ট হাউস'-এ সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বিখ্যাত দার্শনিক লর্ড লিস্টওয়েল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি, মুলুকরাজ আনন্দ, কৃষ্ণ মেনন ও মিঃ হ্যাচিনসন্ প্রমুখ অনেকেই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে '*Indian Civil Liberties Union*' এর সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। কবির বাণীর মর্মার্থ ছিল :

পরম্পরাগতভাবে ইংরেজ জাতি তাহার স্বাধীনতারক্ষণে প্রযত্নশীল এইরূপ বলা হয বটে, কিন্তু অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ অনুমোদন করিতে তাহারা কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা দ্বারা তাহাদের পার্থিব সম্পদ-বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি হইযাছে। আমার ইংরেজ বন্ধুগণ সম্ভবত এ বিষযে আমার সহিত একমত হইবেন না। কিন্তু উপনিবেশস্থাপন গৃধ্নুতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন আরও তীব্র হইযা উঠিবে, তখন ইংলণ্ডের বাইরের অধিকৃত স্থানসমূহ রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ নাগরিকগণ তাহাদের গবর্ণমেণ্টকে অপরিমিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার প্রযোজন অনুভব করিবে। **সহসা সুপ্তিভঙ্গে সেদিন তাহারা দেখিতে পাইবে তাহাদের স্বাধীনতা তাহারা নিজেরাই হরণ করিয়া ফ্যাসিস্তদের কবলে যাইয়া পড়িয়াছে।** তখনই তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, যে ব্যক্তির সমন্বয়ে রাষ্ট্রগঠিত তাহাদের নৈতিক যোগ্যতাই স্বাধীনতার প্রকৃত ও একমাত্র ভিত্তি। [২]

উপসংহারে কবি বৃটিশ নাগরিকদের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি গণতন্ত্র-প্রেমিক নাগরিকের উদ্দেশে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য :

'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিদিন তাহার নিজের স্বাধীনতারক্ষণে সচেতন থাকিতে হয়। কারণ একান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও প্রজার ঔদাসীন্য ও ভীরুতার জন্য অত্যাচার প্রয়োগের সুযোগ পাইলেই আপনাআপনি অত্যাচারী হইয়া উঠে।'

এই সঙ্গে কবি ভারতের ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘসমূহকে আরও সংহত এবং দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হযে অগ্রসর হবার আহ্বান জানালেন

শুধু দেশের ক্ষেত্রেই নয, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্মেলনগুলির সঙ্গে কবি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। সব শেষে একটি তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

১৯৪০ সালের গোড়ার দিকের কথা। যুদ্ধ তখন পুরোদমে শুরু হযে গেছে। সেই সময বিলেতের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ সিভিল লিবার্টিজ'-এর (*National Council of Civil Liberties*) সভাপতি ডঃ নেভিনসনের (*Dr H W Nevinson*) নিকট হতে একটি পত্র এবং তাদের সঙ্ঘের একটি মুদ্রিত আবেদনপত্র পান। যুদ্ধের শুরুতেই কিভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে সেখানকার বিবেকী মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে তারই বিবরণ দিয়ে তার প্রতিরোধে জনমত গঠনের

জন্য সঙ্ঘের পক্ষে এই আবেদন জানান হয়েছিল। ডঃ নেভিনসন্ তাঁর ঐ পত্রে রবীন্দ্রনাথকে এই সঙ্ঘের মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমর্থনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বিলেতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ ও বিবেকী মানুষের কণ্ঠরোধ করার খবর কবি সংবাদপত্র ও নানা সূত্রে থেকেই কিছু কিছু পাচ্ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই কবির স্নেহভাজন ডঃ অমিয় চক্রবর্তীও এই ব্যাপারে কবিকে অবহিত করার জন্য পুরী থেকে এক পত্রে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) লিখেছিলেন :

…'বিলেত থেকে খবর পাচ্ছি ওদের শান্তিকর্মীদের গলা টিপে ধরা হয়েচে—হার-জিৎ'-এর হাওয়ায় তাঁদের পক্ষে কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁদের কবিতা, প্রবন্ধ শুধু এদেশে নয়, স্বদেশেই যাতে ছড়াতে না-পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ বিষয়ে পরে আরও জানা যাবে'।

ডঃ নেভিনসনের পত্র ও ইস্তেহারগুলি পাওয়ার পর কবির মন যখন খুবই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ঠিক সেই সময়ই ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় সরকারী দমন-নীতি প্রবল আকার ধারণ করে। ২৪ জানুয়ারি সারা কলকাতায় শতাধিক জায়গায় খানাতল্লাসি এবং '*Forward Bloc*', '*National Front*' 'গণবাণী' প্রভৃতি বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকার অফিস খানাতল্লাসি করে পুরাতন যাবতীয় কপি পুলিস নিয়ে যায়। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, প্রমোদ.সেন, গোপেন চক্রবর্তী, আবদুল মোমিন, ভবানী সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ ৩০ জন বামপন্থী শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে 'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে'র হেড কোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এই সব সংবাদে কবির মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, ফেব্রুয়ারির শুরুতেই কবি ডঃ নেভিন্সন্‌কে তাঁদের সঙ্ঘের মহান আদর্শ ও সঙ্কল্পের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সাধ্যমত সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখে পাঠান। পত্রখানি নেভিন্সনের হাতে পৌছতে পাছে বিলম্ব হয় কিম্বা যুদ্ধের গোলমালে ও 'সেনসর' বিভাগের কল্যাণে এ চিঠি হয়ত আদৌ তাঁর হাতে পৌছিবে না—সম্ভবত এই সব কথা বিবেচনা করে কবি ৪ ফেব্রুয়ারি (১৮৪০) 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের' মাধ্যমেই চিঠিখানি প্রচারের নির্দেশ দেন। তাছাড়া এর দ্বারা ভারতবর্ষের সরকারী দমন-নীতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসী ও দেশকর্মীদেরকেও তাঁর বক্তব্য

জানান হবে, এ চিন্তাটাও তাঁর মনের মধ্যে কাজ করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি এটি দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

Dear Nevinson,

I have read your circular letter with great interest and entirely associate myself with the freedom of mind which you advocate. As you know, by accepting Presidentship of the *Indian Council of Civil Liberties* I have publicly associated myself with organised effort to further democratic ideals for our peoples. The European and the Far-Eastern Wars, as well as the complications in the Indian situation, have made our task more imperative.

My age and the work that I have been doing in this corner of Bengal where we have our Educational and Rural Development Centres, make it difficult for me to extend my activities in other fields. But I join you in our crusade for the Western Civilisation will yet triumph over the ordeal that it has set for itself. In some ways it is even harder for India to pursue the path of freedom, not only our unnatural political situation which hampers free national expression but the legacies of medieval habits and thought will have to be overcome. It is, therefore, all the more necessary that leaders of thought in your country and ours should counteract the passions of the day and maintain close contact in our human endeavour.

With my regards,

Yours sincerely

Rabindranath Tagore.

এই পত্র পাওয়ার পরই নেভিনসন্ পুনরায় এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে এই সঙ্ঘের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা সহ-সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। বলা

বাহুল্য, কবি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে পত্রে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, শুধু নাম দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়া এই অশীতি বৎসর বয়সে সক্রিয় ভাবে কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কবি তাঁর পত্রে[২৪] লিখলেন :

It has been most kind of you to have asked me to join the *National Council for Civil Liberties* as a Vice-President and I accept the honour with great pleasure. I can of course do nothing more at present than just lend my name to it ; 80 is after all a very advanced age in the tropics. But I should not complain, as, on the whole, I am keeping quite fit.

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক ভাষণে,—বিশেষ করে কারারুদ্ধ জওহরলালের পক্ষে তিনি মিস্ র‍্যাথবোন্-এর উদ্দেশে যে ঐতিহাসিক খোলা চিঠি লেখেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ধিক্কার।

ড. নেপাল মজুমদারের এই রচনাটির আদি নাম ছিল 'বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ'। লেখাটি ১৯৭৪ সালে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী-কলাকুশলী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন এর ভূমিকা হিসেবে লেখাটির সংগে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উপলক্ষে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর আবেদন এবং সম্মিলনীর প্রথম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত 'গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহিত্যিক শিল্পীর দায়িত্ব' শীর্ষক প্রস্তাবটি জুড়ে দেয়া হয়েছিল। রচনাটি পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাহিত্য মুখপত্র নন্দন-এ (নন্দন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ , পৃঃ ১৩-৩২ এবং ৯৫-৯৮) প্রকাশিত হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত যুবমানসের বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় (৯ মে রবীন্দ্রনাথের সোয়াশ' বর্ষ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে) প্রকাশিত হয়। কিন্তু লেখাটির মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের বন্দীহত্যা বিরোধিতা ও বন্দীমুক্তির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তা কেন্দ্রিক। সেকারনে রচনাটির শিরোনাম এখানে বদলে রাখা হলো।

লেখাটির প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিঞ্চিত আলোকপাতের প্রয়োজন আছে।

সত্তর দশকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে পশ্চিমবাংলায় চলেছিল আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, বন্দীহত্যা। ভারতরক্ষা আইন, মিসা, এসমা ইত্যাদি দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স এবং পুলিশ ও ভাড়াটে লুম্পেন গুণ্ডাদের তাণ্ডবে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রোধ হয়েছিল, ব্যক্তি স্বাধীনতা হয়েছিল লুণ্ঠিত। শত শত বামপন্থী কর্মী পুলিশ ও গুণ্ডাদের হাতে খুন হয়েছে। অত্যাচার, ভীতি এবং আতংকে বাসস্থান ছেড়ে যেতে হয়েছে হাজারো নিরীহ মানুষকে। এই শ্বাসরোধকর অবস্থা বারবার হিটলারের ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি শাসনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ১৯৭৪ সালের কবিপক্ষে (১৭ মে থেকে) পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরা তাদের তের দফা দাবিতে অনশন শুরু করেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল: অবিলম্বে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের ওপর থেকে সমস্ত পীড়ণ, অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

জেলখানা, থানা লক আপ এবং প্রিজন ভ্যান-এ রাজনৈতিক বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা তো তৎকালীন কংগ্রেসী সরকারের রেওয়াজে গিয়ে দাড়িয়েছিল। ইংরেজ আমলেও বন্দী শিবিরে গুলি চালনার নজীর আছে। তবে তা একবারই। হিজলী জেলের বন্দীহত্যা। আর সেই সময় মাত্র দুইজন রাজনৈতিক বন্দী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে তৎকালীন বাংলার মানুষ ও বিদগ্ধজন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই বিক্ষোভ-আন্দোলনের পুরো ভাগে এসে দাড়িয়ে ছিলেন। এবং শহীদ মিনারের পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে এসে তিনি জাতির হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু এই ঘটনা নয়, তিনি ইংরেজদের পৈশাচিক দমন নীতির বিরুদ্ধে সারা জীবন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সিডিশন বিল, ভারতরক্ষা আইন, রাওলাট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, এণ্ডারসনের দমন নীতির প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি বন্দী হত্যার বিরোধিতা ও বন্দী মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন 'The Andamans political prisoners' repatriation Committee' ও 'All India civil Liberties union'-এর সভাপতি এবং 'National council for Liberties'র সহ-সভাপতিও। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে রবীন্দ্রনাথের এই মহান সংগ্রামী ভূমিকা ও শিক্ষা তৎকালীন সময়ে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর প্রথম রাজ্য সম্মেলনে (১৯৭৩) গৃহীত প্রস্তাব থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরা যাক :

ইংরেজ আমলের কুখ্যাত কালা-কানুন-এণ্ডারসনী দমন নীতির কায়দাগুলি দেশে আবার চালু হয়েছে এবং হয়েছে আরও ভযাবহ আকারে। বিনা পরোয়ানায় যখন-তখন গ্রেপ্তার ও খানাতালাস, জেলহাজতে ও থানা লক আপে অকথ্য নির্যাতন, বিনাবিচারে, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য, আটক জেলখানায় ঐসব বন্দীদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার এবং উপর্যুপরি দেশের প্রায় সব কটি জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নৃশংস গুলীবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদেব ছাঁটাই, সাসপেণ্ড এবং অবাধ গুম খুন এব সেই সংগে গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী, পুলিশ মিলিটারী সি আব পি ব সাহায্যে ক্ষমতাসীন দল (পশ্চিমবাঙলায সিদ্ধার্থ শংকর রাযের নেতৃত্বে কংগ্রেস শাসন) কর্তৃক বিরোধী দলগুলি ও সংগ্রামী মানুষের পরে নগ্ন আক্রমন আজ এণ্ডারসনী দমন নীতিকেও ম্লান করে দিচ্ছে। আজ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই বজ্রনির্ঘোষ—সেই কঠোর ভৎর্সনা ও অভিসম্পাত-গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবিতে রবীন্দ্রনাথের ক্রোধোদৃপ্ত সংগ্রামী মূর্তি আজ আবার উজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে প্রেরণা যোগাচ্ছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন—অতীত ও বর্তমান : সংকলন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত, ১৯৮০, পৃঃ তথা ৩২ | [সম্পাদক]

তথ্য নির্দেশ :

১ অবশ্য এই ঘটনার বছর দুয়েক আগে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে সুভাষচন্দ্র, কিরণ শংকর প্রমুখ বাংলার নেতাদের আহ্বানে 'নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মী দিবস' উদযাপিত হয়। ঐদিন বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনার জন্য তাঁরা গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৯ মাস কারাদণ্ড হয়।

২. Modern Review, Edited by Ramananda Chatterjee, November 1931, Page 603.

৩. ১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর।

৪. ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি।

৫. ১৯৩২ সালের ১৬ জানুয়ারি।

৬. ১৪ এপ্রিল, ১৮৯৮।

৭. বস্তুত এই দুটি আইনের ভিত্তিতেই সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থায় 'মিসা', 'এসমা' ইত্যাদি কালাকানুনগুলি রচিত হয়েছে।

৮. Liberty, July 24, 1932.

৯. ১২ মে, ১৯৩৩।

১০. Modern Review, July 1933, Page 106.

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

১২. Forward, April 20, 1934.

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২মে, ১৯৩৬।

১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ নভেম্বর, ১৯৩৬।

১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ এপ্রিল, ১৯৩৭।

১৬ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ আগস্ট, ১৯৩৭।

১৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

১৮. ঐ। পৃঃ ৪৬১ ৬২।

১৯. পত্রের অনুলিপি রবীন্দ্র ভবন-এ রক্ষিত আছে।

২০. ১৭ আগস্ট, ১৯৩৭।

২১. Amrita Bazar Patrika, November 20, 1937.

২২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ অক্টোবর, ১৯৩৭।

২৩. Visva-Bharati News, February 1940, P. 16

২৪. ৩১ মার্চ, ১৯৪০।

শ্যামল মৈত্র

ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-অধিকার ও রবীন্দ্রনাথ

বিগত এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু সংখ্যক মানুষের নিরলস প্রচার ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আজ মোটামুটি বাঙালী জনমানসে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ শুধু উপনিসদের ভাবধারায় পুষ্ট অধ্যাত্মবাদী নন কিংবা মুনিঋষিদের বিধিবিধান ও নীতিনির্দেশের একান্ত অনুসারী ও প্রচারক নন। কায়েমি স্বার্থবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল ধরে একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে, তাঁদের স্বায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য গজদন্ত মিনারবিহারী নন্দনতাত্ত্বিক অথবা ঋষিকল্প ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে পূজার বেদীতে বসিয়ে রেখেছিলেন। আজ অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটা বদলেছে। অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বের সমাহারে প্রমাণিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রায় ঊষালগ্ন থেকেই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করেছেন এবং মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত তা অবারিত, অব্যাহত ছিল।

আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাটিকে আরও বেশি করে স্মরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে ভারতের প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত, এমনকি সংসদীয় গণতন্ত্রকেও বার বার ধূলায় লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বর্ণবিদ্বেষের বিসবাষ্প বিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগেও একটি দেশে দাপটের সঙ্গে টিঁকে আছে; কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী দানব তার পারমাণবিক যুদ্ধ-চক্রান্ত থেকে বিরত হচ্ছে না, মানব সভ্যতাকে চিরতরে ধ্বংস করার এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছে, এই সময়ে আমাদের প্রার্থনা, 'আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের'। কারণ, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধুনা যারা দিকপাল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চারপাশের সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে একধরণের সুবিধাবাদী নির্লিপ্ততার তথা নিরপেক্ষতার আবরণ গায়ে জড়িয়ে রাখেন। তারা যেন মনে

রাখেন যে রবীন্দ্রনাথ কখনও সমসাময়িক কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনায় স্বীয় অভিমত গোপন করেননি। কি দেশীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখনই মানুষের অধিকার বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, তখনই তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা পাঠ করেন, তাতে পরাধীন ভারতবর্ষের নিদারুণ দুরবস্থা বর্ণনা করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তখন কবির বয়স ১৪ বছরও পূর্ণ হয়নি, তখন থেকেই তিনি নির্যাতিত মানবাত্মার পাশে দাঁড়াবার তাগিদ অনুভব করেছেন। পরের বছর ঐ হিন্দুমেলার পরবর্তী অধিবেশনে কবি 'দিল্লীর দরবার' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। তাতে একদিকে রয়েছে দুর্ভিক্ষে মানুষের নিদারুণ দুর্দশার বর্ণনা, অপরদিকে বড়লাটের দরবারে ভোগবিলাসের আড়ম্বর। লর্ড লিটন সংবাদপত্রে বা অন্যত্র এই কবিতাটিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে দেননি। লর্ড লিটন ১৪ বছরের বালকটিকে চিনতে ভুল করেননি তাদের সঙ্গত কারণেই কাঁচা হাতের লেখা ঐ কবিতাটিও রাজরোষ থেকে রেহাই পায়নি

১৮৮১ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখনও কুড়ি পেরোয় নি। সেই সময়ে ভারতী পত্রিকায় লেখা 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধটিতে তাঁর আশ্চর্য প্রখর রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গেল। দু চারটি লাইন উদ্ধৃত করা যাক: একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষ পান করানো হইল। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরাজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে তার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিস সে কোনমতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ সঞ্চয়ের এইরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলে। যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে।[১]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ দুবার বিলেত ঘুরে এলেন। ইংরাজ সাহিত্য এবং সুপণ্ডিত কয়েকজন মনীষীর সান্নিধ্যে এসে ইংরাজ চরিত্র সম্পর্কে তাঁর কিছুটা উচ্চ ধারণাই গড়ে উঠেছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা লক্ষ্যণীয় তা হল এই

যে এদেশে শাসক-ইংরেজ সম্পর্কে তিনি কখনই মোহগ্রস্ত হন নি। বিলেত থেকে ফিরে এসেই তিনি বললেন : যে বড়ো ইংরেজ সে ষোলো আনা মানুষ, সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। এই সচেতনতার মণিকোঠায় অবস্থান করতেন বলেই আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের সূচনাকাল থেকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিটি নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিশেষত দেশের জনপ্রিয় নেতাদের মুক্ত করে আনার জন্য এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মানবিক ন্যায়ের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য বারে বারে সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছেন।

১৮৯৭ সালে যখন বোম্বাইতে তিলক ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তার প্রতিবাদে বোম্বাইতে বিরাট আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আর তার প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের জন্য এই বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, ঐ মামলা পরিচালনার জন্য বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ এবং একজন ব্যারিস্টার পাঠিযে সাহায্য করেছিলেন। কয়েকমাস বাদে ১৮৯৮ সালে যখন তিলকের 'কেশরী' পত্রিকাকে উপলক্ষ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার চক্রান্ত হয়, তখন সেই ভার্নাকুলার প্রেস-এ্যাক্টের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিবাদ সভায় তাঁর সুবিখ্যাত 'কণ্ঠরোধ'[২] ভাষণটি পাঠ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর করেন। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন সংগঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অবিসংবাদী নেতা। এর আগেই তিনি ২৫ আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে 'অবস্থা ব্যবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে ইংরেজের উপর ভরসা ছেড়ে জাতিকে আত্মশক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। নিজস্ব অর্থনীতি, মাতৃভাষায় শিক্ষা, পঞ্চায়েত দ্বারা বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে তিনি উপেক্ষা করার আহ্বান জানান। এই আন্দোলনের ফসল হিসেবে তাঁর লেখনী থেকে যে গানগুলি বেরিয়েছে তার মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা,' 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' ইত্যাদি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। প্রখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary associations with official activities...Through the

boycott of British goods, as a protest against the partition of Bengal, originated with others, and was adopted by the political leaders of the country, in a public meeting assembled in the Toun Hall of Calcutta, it was Rabindranath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the administration of the furthest limits that the laws of the land allow us to do.[৩]

বঙ্গভঙ্গের পর গীতাঞ্জলি থেকে মহুয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৬-১৯০৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পর্বেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-অধিকারের সপক্ষে সবচেয়ে বেশি করে আত্মপ্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই প্রতিবাদী ভূমিকা মূলত তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে : ১ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের (পরবর্তী-কালে ফ্যাসীবাদের) বিরুদ্ধে, ২. স্বদেশে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে এবং ৩. স্বদেশী আন্দোলনে ত্রুটি দুর্বলতার বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের নখদন্ত বিস্তার দেখে কবি শঙ্কিত, ব্যথিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি গভীর অন্তদৃষ্টির সাহায্যে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই বিশ্বযুদ্ধ অকাম্য হলেও পৃথিবীতে অনেক ওলট-পালট করে দেবে। তাঁর ভাষাতেই বলি : 'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো' কবিতাটি লেখার অনেক পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বার্তা আমার কাছে এসে পৌঁছয়। এনড্রুজ সাহেব বলেছিলেন যে আমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল। আমার এই অনুভূতি ছিল ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন[৪]। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হল যে দুনিয়াব্যাপী পুঁজিবাদ ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হচ্ছে এবং সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। পাশাপাশি পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত হবার জন্য দেশে দেশে সংগ্রামও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সোভিয়েত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয়। রাজনীতির এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন এই সারকথাটি। 'যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন

যুগে পৌঁছাবার সিংহদ্বারস্বরূপ। আরো ভাঙবে, সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘর-ছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘর-ছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে।...শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোঁমা রোলাঁ, বাট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলে অপমানিত হয়েছেন। জেল খেটেছেন। সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছেন[৫]। মনুষ্যত্ববোধ বর্জিত, বিবেকবর্জিত ইম্পিরিয়ালতন্ত্রের স্টিম রোলারের তলায় দুনিয়া জুড়ে নির্যাতিত মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন। তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তাদের উদ্দেশে বলেছেন: 'যদি একটা ছাগশিশুকে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য-সিন্দুর হস্তে লোক আসে এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়, এ কী আশ্চর্য, এত বড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি' ইম্পিরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন আমাদের অধিকার তাহার খরচ যোগানো, সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা, উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম[৬]

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল, ১৯১৫ সালে সরকার তাঁকে নাইট খেতাব দিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় আমন্ত্রিত হলেন তিনি। কিন্তু কোন পুরস্কারই কবির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে এতটুকুও চিড় ধরাতে পারে নি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেই সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে লিখলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। 'আমাদের রাজপুরুষেরা শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কতৃত্ব দেওয়া চলিবে না। অর্থাৎ ইংরেজ কর্তার হুকুম অনুযায়ী সব কিছুই চলবে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে দেখি যে তাহাদের ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায় তাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আন্দামানে পাঠাতে পারলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। বাহিরে দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে[৭]।'

১৯১৯ সালের ২৯ মে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের

নির্দেশে নৃশংস গণহত্যা ঘটল। পৃথিবীর ইতিহাসে যার নজীর খুব কমই মিলবে। দুঃখের বিষয় এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা কেউ এগিয়ে আসেন নি। সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইট পদবী প্রত্যাখ্যান করলে চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। ১৯২৪ সালে বাংলা সরকার এক অর্ডিনান্স জারি করে যুবকদের ধরে ধরে জেলে পুরতে লাগল। সুভাষচন্দ্রকেও তারা গ্রেপ্তার করল। রবীন্দ্রনাথ তখন আর্জেন্টিনায়। দিনু ঠাকুরকে লিখলেন : ঘরের খবর পাইনে কিছুই গুজব শুনি নাকি/কুলিশপাণি পুলিশ সেথা লাগায় হাঁকাহাঁকি/শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেসে/কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।[7] ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে পুলিশ আর একদফা ব্যাপক হারে বন্দী করে গ্রেপ্তার শুরু করে। তার প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ এক খোলা চিঠি প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রে পাঠান : According to the teaching of our modern law-givers we refuse to believe that our countrymen who are being punished without trial are guilty of any crime. Taking short cuts in law is like setting the whole house on fire in order to roast one's pig. It is the primitive form of despotism." তার কিছুদিন বাদেই ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ প্যারি শহরে রোমাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইন প্রমুখের নেতৃত্বে প্রথম ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণী পাঠান।

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর খড়্গপুর শহরের অনতিদূরে হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালানোর ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন। বন্দীহত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্য উপেক্ষা করে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা চলে আসেন এবং ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। এই সময়ে চিকিৎসকের নির্দেশে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তাঁর দার্জিলিং যাবার কথা ছিল। তিনি সেই সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করে দেন। মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন : এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তি জনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক

নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে[৯]। এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলা হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে উক্ত সভায় মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যায় নি, বক্তাদের খালি গলাতেই বক্তব্য রাখতে হয়েছিল।

১৯৩২ এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সারা দেশে কম করে ১৭টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। তার কিছুদিন বাদেই বিনা বিচারে আটক করার জন্য এগারসনী কালাকানুন জারি হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ক্ষোভে দুঃখে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এক পত্রে লিখলেন: ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে।[১০] এই সময় এনড্রুজ সাহেবের হাত দিয়ে তিনি ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে এক বিবৃতি পাঠালেন। ইণ্ডিয়া লীগ আহূত বিলেতের এক জনসভায় সেটি পড়া হল। তাতে বলা হয়েছিল: আমাদের অবস্থা পশুবৎ। আমি ভরসা করি যে এখনও এমন ইংরেজ আছেন যাঁহারা এই লজ্জাজনক অবস্থা উপলব্ধি করতে সমর্থ।[১১]

১৯৩৩ সালের ১৭, ২৬ ও ২৮মে আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনরত বন্দী যথাক্রমে মহাবীর সিং, মানকৃষ্ণ নমঃদাস, এবং মোহিতমোহন মৈত্রের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা জানতে পেরে সারা বাংলায় আগুন জ্বলে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে। বন্দীদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন: 'Give up hunger strike'. দীর্ঘ ৪৫ দিন বাদে বন্দীরা অনশন ত্যাগ করলেন। তারপর আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু হল; একদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ভারতের বড়লাট এবং প্রিভি কাউনসিলের প্রেসিডেণ্টকে পাঠাবার জন্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত পত্র পাঠানো হল এবং অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনার অনুরোধ জানিয়ে গান্ধীজীকে পত্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।

কয়েক মাসের মধ্যেই গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের পরামর্শক্রমে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সরকার তার প্রতিদানে কংগ্রেসকর্মী এবং আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের ওপর থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। দুঃখের বিষয়, বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল না। এই সময়ে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। ৮ এপ্রিল ১৯৩৬ সুভাষচন্দ্র ভারতে আসার পথে বোম্বাই

বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হলেন। ১০মে ১৯৩৬ 'সুভাষদিবস' উপলক্ষে কবি এক বিবৃতিতে বললেন : বাংলাদেশে হাজার হাজার নরনারী আজও বন্দীশালায়। বিচারের দাবী করছিই, সেই দাবার পেছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করছে অপরিমিতকাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড আছে দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তা থেকে আমরা বঞ্চিত।[১২] এর কিছুদিন বাদেই জহরলালের উদ্যোগে অল ইণ্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার অনারারী প্রেসিডেণ্ট।

ইতিমধ্যে দুজন রাজবন্দী নবজীবন ঘোষ এবং সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করলে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ২০ নভেম্বর ১৯৩৬ এক বিবৃতিতে বললেন : সম্প্রতি বাংলার দুইজন রাজবন্দী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহাদের আত্মহত্যা আমাদিগকে শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আবার আমাদিগকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছে। আমি ভারতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি। ...বহু বৎসর যাবৎ বাংলায় সহস্র সহস্র নর-নারী বন্দী-নিবাসে দুর্বহ জীবনযাপন করিতেছে। ইহাদের জন্য বিচারের অভিনয় মাত্রও হয় নাই। বাংলা তাহার এই অগণিত সন্তানের মনজ্বালা সহ্য করিতেছে। এই লোকগুলির জীবন নষ্ট হইয়াছে, পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই দুইজন রাজবন্দীর আত্মহত্যা সম্পর্কে তদন্তের আবশ্যক। কেহই এই সকল ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কাজেই সরকার একটা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াই আমি আশা করি। নিরপেক্ষ তদন্তের পরিবর্তে পুলিস এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত বা রিপোর্টের উপর নির্ভর করা কোনক্রমেই চলিবে না।[১৩]

এই সময়ে প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হল। বাংলায় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফজলুল হক নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত এই সরকারও বন্দীমুক্তির প্রশ্নে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন। যদিও অন্যান্য প্রদেশে নির্বাচিত সরকারগুলি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে শুরু করেছিল। এই সময়ে আন্দামানের নির্বাসিত বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতেও আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ২ আগস্ট ১৯৩৭ টাউন হলে বিক্ষোভ সভা আহূত হল। সভাপতির ভাষণে তিনি আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনার দাবির পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, সংবাদপত্রের এবং

প্রত্যেকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানালেন: আজিকার সন্ধ্যায় আমি ন্যায়বিচার ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতেছি। এই আহ্বান উপেক্ষা করিলে বিপদ অনিবার্য।
রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য। ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশে গণ-প্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচন সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শুধু বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ রহিয়াছে, বাংলাদেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোন তোয়াক্কা রাখেন না, বাংলার ব্যক্তি-স্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক। সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্যের কোনও কোনও প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট নীতি কতকটা সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অনির্দিষ্টকাল বিনাবিচারে আবদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। আইনের যে আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যক তাহা সত্য, কিন্তু আজ আমার দেশবাসী আমাকে যে তাহাদের সহিত আইনের আমূল পরিবর্তনের দাবী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা নহে, উহারা কঠোরতা হ্রাসের দাবী করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন।[১৪]

১৪ আগস্ট ১৯৩৭ অল ইণ্ডিয়া আন্দামান ডে পালিত হয়। কবি তখন শান্তিনিকেতনে। ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের এক সভায় কবি আন্দামান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন: মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি, নির্দয়তায় সে রস পায় জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। হিংস্রতার ঠগিধর্ম উপাসক ফ্যাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এইসব জেলখানায়।[১৫]
অবশেষে ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ বাংলা সরকার মোট ১৫৫০ জন রাজবন্দীর মধ্যে ১১০০ জনকে মুক্তি দেয়। বাকী ৪৫০ জন সম্পর্কে বলা হয় যে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ছাড়া হবে।

১৯৩৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রাসেলসে 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফর দ্য ডিফেন্স অব

পীস' সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহূত হয়। ভারতীয় লেখক-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি ঐ সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ। স্বাক্ষরকারাদের সর্বাগ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার কয়েকদিন বাদেই ১৪ অক্টোবর ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে লণ্ডনের ট্রান্সপোর্ট হাউসে এক সম্মেলন হয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি, মুলকরাজ আনন্দ, কৃষ্ণমেনন প্রমুখ অনেকেই বক্তৃতা করেন। অল ইণ্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পাঠানো বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বললেন: সহসা সুপ্তিভঙ্গে যেদিন তাহারা (ব্রিটিশরা) দেখিতে পাইবে তাহাদের স্বাধীনতা তাহারা নিজেরাই হরন করিয়া ফ্যাসিস্তদের কবলে যাইয়া পড়িয়াছে তখনই তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, যে ব্যষ্টির সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত তাহাদের নৈতিক যোগ্যতাই স্বাধীনতার প্রকৃত ও একমাত্র ভিত্তি।[১৬]

এর কিছুদিন আগে স্পেনে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটলে ১৯৩৭ সালের ৩ মার্চ রবীন্দ্রনাথ স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে যে বিবৃতি সংবাদপত্রে দিয়েছিলেন তা হল: In this hour of supreme trial of sufferings of the Spanish people I appeal to the conscience of humanity. Help the people's Front in spain, help the Government of the people, cry in a million voice halt to reaction, come forward in millions to the aid of democracy, to success of civilization and culture.[১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর বিলেতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিভিল লিবার্টিজ নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথকে ঐ সংস্থার সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বললে কবি জানালেন: I accept the honour with great pleasure. I can of course do nothing more at present than just land my name to it; after all a very advanced age in the tropics.[১৮] এই ৮০ বছর বয়সেই (৫. ৬. ৪১) মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাব যে ভাষায় কবি দিয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ধিক্কার কোন্ পর্যায়ে ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে। সেই প্রতিবাদের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেই এই নিবন্ধ শেষ করছি: ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠি

পড়িয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। মিস র‍্যাথবোন কে, তাহা আমি জানি না…। তাঁহার এই পত্র প্রধানত জবাহরলালকে উদ্দেশ্যেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস র‍্যাথবোনের দেশবাসীগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।…অন্য যে কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল?…যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য কোন পথ নাই, তবে…দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজী ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে। অন্যদিকে রাশিয়ায় মাত্র ১৫বৎসর সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (স্টেটস্‌ম্যান ইয়ার বুক হইতে উদ্ধৃত তথ্য) …আমি পল্লী নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি—কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল।…ব্রিটিশরাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্যই কি তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে, যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চিৎকার করিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না[১৯]?

সূত্র-নির্দেশ

১. চীনে মরনের ব্যবসায়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী, ১৮৮১।

২. কণ্ঠরোধ, সাধনা, বৈশাখ ১৩০৫। কণ্ঠরোধ ভাষণের এক জায়গায় কবি বলেছেন: 'একদিন শুনিলাম, অপরাধী বিশেষকে সন্ধান পূর্বক

'গ্রেপ্তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গর্বমেন্ট সাক্ষীসাবুদ বিচার-বিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর। ভিতরে ভিতরে না জানি কি ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে।' কিংবা, 'একদিনে পুরাতন আইন শৃংখলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্যদিকে রাজ কারখানায় নূতন লৌহ শৃংখল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ি ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পানিত হইয়া উঠিয়াছে।'

৩ Indian Nationalism : its principle and personalities by B- C. Pal.

৪. রবীন্দ্র গুপ্ত-র 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯মে ১৯৭৮, পৃ: ১০০৭।

৫. যুদ্ধের ২ মাস আগে লেখা সংখ কবিতার ভাষ্যরচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি।

৬ সফলতার সদুপায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ ১৯২৪, অক্টোবর। দিনেন্দ্রনাথকে লেখা কবিতাকারে চিঠি।

৮. ১৯২৭, ৩ ফেব্রুয়ারি।

৯ মনুমেন্ট-র পাদদেশে আয়োজিত জনসভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অংশ বিশেষ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১)।

১০. Liberty, July 24, 1932.

১১ Ibid.

১২. ১০মে, ১৯৩৬ সাল, সুভাষ দিবস উপলক্ষে কবির বিবৃতি।

১৩ ২০ নভেম্বর, ১৯৩৬। কবির বিবৃতি ইউনাইটেড প্রেসের মারফত।

১৪ ২ আগস্ট, ১৯৩৭। টাউন হলে বিক্ষোভ সভায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষের বাংলা তর্জমা।

১৫ ১৪ আগস্ট, ১৯৩৭। আন্দামান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কবির ভাষণের অংশ বিশেষ।

১৬ ১৪ অক্টোবর ১৯৩৭, ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে লণ্ডনের ট্রান্সপোর্ট হাউসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী।

১৭ ৩ মার্চ, ১৯৩৭। স্পেনের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহার্য্যার্থে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি।

১৮. লণ্ডনে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিভিল লির্বাটিজ নামক সংস্থার সহ-সভাপতি হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হলে কবি এই চিঠি পাঠান। ১৯৪১।

১৯. র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ। ৫ জুন, ১৯৪১।

অরুণ দাশগুপ্ত

ভারতরক্ষা আইন, রবীন্দ্রনাথ এবং এসমা-মিসা

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্মোহ বিচার করলে যে রূপটি ভাস্বর হয়ে ওঠে, তা হলো তিনি অকৃত্রিম এক মানবতাবাদী। তিনি আমাদেরই লোক। অসীমের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর জীবনদর্শনের মাধ্যাকর্ষণ হলো মানুষ। তাঁর কাছে মানুষই সত্য। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। সে মানুষের অধিকার যেখানে পদদলিত হয়েছে, সেখানেই তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, কখনো জনারণ্যে মিশে, কখনো একাকী তার প্রতিবাদ করেছেন। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের ধারায় তিনি লক্ষ্য করেছেন সাম্রাজ্যলিপ্সু, মানববিদ্বেষীরা শেষ বিচারে ইতিহাসের প্রাপ্য দণ্ড নিয়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের মধ্যভাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জীবন সায়াহ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন: প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও পরে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ। 'রক্তকরবী'তে রূপকের মাধ্যমে যেমন ধনতন্ত্রের বীভৎস রূপটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কবি প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন: জীবনের আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।[১] আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর রূপ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন বলে তিনি সরাসরি রাজনীতির রণাঙ্গনে অবতীর্ণ না হলেও তার স্বরূপ নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে লেখা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যা মিস র‍্যাথবোনের চিঠি কবিকে বিচলিত করেছিল। মিস র‍্যাথবোন স্পর্ধাভরে লিখেছিলেন: পণ্ডিত জওহরলাল, আপনার এবং আপনার অনেক সহকর্মীর পক্ষে ইংলণ্ডকে ভালবাসিবার অথবা অন্ততঃপক্ষে ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ আছে। ইংরেজের চিন্তাধারা আপনারা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বিশেষ করে ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকট এমন কি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকটও আপনারা বিশেষভাবেই ঋণী।

এইখানেই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক-ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছিল[২]। কবি রবীন্দ্রনাথের জবাব প্রথমে প্রবাসী পত্রিকায় ও পরে ৫ জুন, ১৯৪১ সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে কবি লিখেছিলেন : ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এইজন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে।[৩] সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যে চরম শোষণ ও মনুষ্যত্বের অবমাননা এ সত্য তিনি হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন বলেই তাদের কোন কূটকৌশলই তাঁকে মানবিক কর্তব্য পালনে বিভ্রান্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করেছেন : 'প্রথমেই বলে রাখা ভালো আমি রাষ্ট্র-নেতা নেই, আমার কর্মক্ষেত্র আন্দোলনের বাইরে।' অথচ 'অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে' পরাধীন জাতি ও ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যেখানে যত অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে, তিনি স্বকীয়ভাবে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন তাঁর কাজ 'আসমানদারী' তবুও তাকে দেখা গেছে জাতির চরম অবমাননার মুহূর্তে তিনি হয়তো কোন শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে চলমান (বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন), আবার কখনো বা প্রতিবাদ সভায় শান্ত সমাহিত কণ্ঠে ব্রিটিশ 'শাসনের বিকৃত চরিত্রে'র, বর্বরতা, কাপুরুষতা ও পশুত্বের সমালোচনারত। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের দণ্ড প্রয়োগের অতিকৃত রূপকে বর্বরতা বলে অভিহিত করেছেন।

'ভারতরক্ষা আইন' ও অন্যান্য আইনে সন্দেহের বশে কিশোর যুবকদের বিনাবিচারে আটক রাখার দণ্ডনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর (১৯১৫, ১৮ মার্চ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'ভারত রক্ষা আইন' বা ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ হলো। কংগ্রেসের 'মডারেট' ও 'ন্যাশনালিষ্ট' গোষ্ঠীর নেতারা এই মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। এদিকে যুদ্ধের শুরুতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ক্রমে বাড়তে থাকে। বাংলায় বিপ্লবীদের এই

প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ইংরেজের দমননীতি ক্রমেই নির্মম ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। ১৯১৬ সালে, কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে 'ভারত রক্ষা আইন' বা ইংরেজের দমননীতি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়।

এই সময় শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ভারতে 'হোমরুল'-এর দাবিতে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। তাতে ইংরেজের দমননীতি আরো প্রবল হয়। এই দমননীতির বিরুদ্ধে স্বভাবতই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনও শুরু হয়। মাদ্রাজ থেকে এই আন্দোলন বোম্বাই উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার সহ প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

অ্যানি বেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের 'হোমরুল' আন্দোলনের পেছনে নামজাদা আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুবকরা দলে দলে সামিল হতে থাকেন। এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল মাদ্রাজ হওয়ায়, মাদ্রাজ সরকার এক সরকারী আদেশে ছাত্রদের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করে দেয়। সরকারের এই দমননীতির বিরুদ্ধে অ্যানি বেসান্ত তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'কমন উইল' পত্রিকায় প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সরকার ১৯১৭-র ১৬জুন অ্যানি বেসান্ত ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী জি-এস অরুণডেল ও বি পি ওয়াদিয়াকে উটকামণ্ড ও কোয়েম্বাটরে অন্তরীক্ষবদ্ধ করে। কিন্তু অ্যানি বেসান্তের কণ্ঠরোধ করার ও আন্দোলন স্তব্ধ করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা সফল হয়নি। বরং সারা ভারতে অন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও আন্দোলন শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'হোমরুল' বা স্বরাজের দাবিতেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলায় 'মডারেট' ও 'ন্যাশনালিষ্ট' গোষ্ঠী মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯১৭ সালের ২২জুন ভারত সভা হলে প্রথম প্রতিবাদ সভা হয়। তার কয়েকদিন পর কলকাতায় 'বেঙ্গল হোমরুল লীগ' গঠিত হয়। এর সভাপতি হলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আর যুগ্ম সম্পাদক হন আই বি সেন ও রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রেপ্তারের আগে অ্যানি বেসান্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক সতর্ক বাণীতে ইংরেজ সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর আবেদনের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সুর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত

করেছিল। ১৯১৭-র ৪ জুলাই অ্যানি বেসান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বেসান্তের সংগ্রামী ভূমিকার জন্য তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন।

এতে কবির এক ইংরেজ বন্ধু মিঃ মাড বিস্ময় প্রকাশ করে তাঁকে এক চিঠি দেন। এক খোলা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দেন। এটি একটি ঐতিহাসিক চিঠি। তাতে তিনি বলেছেন: আমাদের দেশের শাসন কর্তৃত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশভাগের দাবিতে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমাগত আন্দোলন পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্টের উত্তরোত্তর তার বিরুদ্ধাচরণ—এরই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক যুবক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এরই মোকাবিলা করার জন্য সরকার প্রচণ্ড দলননীতির সাহায্য নিয়েছেন। শুধু এক বাংলাতেই শতাধিক মানুষ বিনাবিচারে অন্তরায়িত হয়েছেন—আর তাদের বেশির ভাগকেই কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অথবা নির্জন কক্ষে (সলিটারি সেল) আবদ্ধ রাখা হয়েছে, যার ফলে কয়েকজন বন্দীই হয় উন্মাদ নয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এরই আত্যন্তিক বেদনা দেশের ঘরে ঘরে, যার ফলে অসহায়া নারীরা তাঁদের শিশুদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি শাস্তি বা দুঃখ নির্যাতন ভোগ করছেন।[৪]

এরপর রবীন্দ্রনাথ লেখেন: এ-সবের বিস্তারিত আলোচনায় আমি যেতে চাই না। আমি সাধারণভাবেই বলি: এদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির ব্যাপারটা অনুধাবন করে দেখা যায়, এদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হইয়েছে এবং যুক্তি সংগত কারণে এ কথাও আমরা ধরে নিতে পারি যে এদের অধিকাংশই বিনা অপরাধে শাস্তিভোগ করছেন। আর এদের মধ্যে অনেকে গোয়েন্দাচরের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিভোগ করছেন, কেবলমাত্র এই অপরাধে যে, তাঁরা এক মহান আত্মত্যাগের ব্রতে উন্মত্ত হয়েছেন।[৫]...

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের প্রতি আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লেখেন: এই সংকটকালে একমাত্র বিদেশী বন্ধু যিনি আমাদের দুঃখভাগের অংশভাগী হয়েছেন এবং যার জন্য তাঁর স্বদেশবাসীর ক্রোধ ও ভ্রুকুটিকে কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন, তিনি শ্রীমতী বেসান্ত। আর সেই কারণেই তাঁর মহান সাহসিকতার জন্যই তাঁর উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন বাক্য নিবেদন করছি, বিশেষ করে আজকের এই দুর্দিন

যখন মানবতার বিরুদ্ধে এই অন্ধ তামসিক অভিযান চলছে এবং তার বিরুদ্ধচারণও খুবই বিপজ্জনক।[৬]...

'হোমরুল' আন্দোলন অপেক্ষাও 'ভারত রক্ষা আইন' এবং ইংরেজের স্বৈরাচারী দলননীতির বিরুদ্ধে বেসান্তের বজ্রনির্ঘোষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ঘোষণাটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি করে বেসান্তের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ইংরেজের দলননীতির উত্তরোত্তর পৈশাচিক রূপ গ্রহণ কবির উদ্বেগ ও মানসিক যন্ত্রণার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। শুধু ভারত রক্ষা আইনই নয়, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী আইনের ৩নং রেগুলেশনের যাঁতাকলে বাংলার যুবক ও তরুণ সমাজ নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। ডি আই আর, ডেটিনিউ, স্টেট প্রিজনার, পলিটিক্যাল প্রিজনার প্রভৃতি নানা অভিধায় তাদের কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। এছাড়া নজরবন্দী গৃহবন্দী এবং গোয়েন্দা পুলিশের অত্যাচারে কত ছেলে উন্মাদ ও আত্মঘাতী হয় কবি তারও খবর রাখতেন। মিঃ মান্ডের প্রতি খোলা চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শুধু এই খোলা চিঠি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। ১৯১৭ সালের ১০ আগস্ট আলফ্রেড থিয়েটার হলে বেসান্ত ও তার সহকর্মীদের অন্তরীণাবদ্ধ করার প্রতিবাদে এবং টাউন হলে সভা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার প্রধান বক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষে কবি 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি রচনা করেন। ঐদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। হ্যারিসন রোডস্থ আলফ্রেড থিয়েটারের এক সভায় তিল ধরনের স্থান ছিল না। শত শত লোক বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।[৭]

এই প্রতিবাদ সভার উপলক্ষেই কবি তার ঐতিহাসিক ভাষণ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' রচনা করেন এবং সভায় তা পাঠ করেন। এই ভাষণের শুরুতেই তিনি ভারতের হোমরুল' বা জাতীয় আত্ম কর্তৃত্বের দাবির জোরালো সমর্থন করেন। তিনি বলেন : মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথাটা এই যে কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।[৮]

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যানি বেসান্তের মুক্তি অর্থাৎ তাঁর অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার করা হলে সারা দেশে আনন্দোচ্ছাস বয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মুক্তির পর মডারেট বা ন্যাশানালিস্ট—কোন নেতাই 'ভারত রক্ষা আইনে' ও ১৮১৮ সালে ফৌজদারী আইনের ৩নং রেগুলেশনে অন্তরায়িত ও সাজাপ্রাপ্ত শত শত যুবকের

মুক্তির জন্য কোন উদ্যোগ নেননি। এতে কবিচিত্ত ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হয়। তাদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী কোন প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি না হওয়ায় কবি মর্মাহন হন। শুধুমাত্র বেসান্ত ও তাঁর সাথীদের মুক্তি নয়, পুলিসের পৈশাচিক দমননীতির প্রতিবাদে এবং বাংলার বিনাবিচারে আটক শত শত যুবকের মুক্তির জন্য তিনি একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া অন্তরায়িত ও অত্যাচারিত যুবকদের সঠিক সংখ্যা, তাঁদের পরিজনদের অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং কবি নিজে সেই কমিটির নির্দেশে কাজও করতে চেয়েছিলেন।

'প্রবাসীর' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 'নজর বন্দীদের জন্য কি করা যায়' শিরোনামে লেখেন: ভারত রক্ষা আইন অনুসারে কিম্বা ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুসারে যাহারা স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের জন্য কি করা যায়? এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অনেক কর্তব্য আছে। অনেক পরিবারের প্রতিপালক অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ হইয়াছে। এই কষ্ট দূর করা কর্তব্য। ইহা করিতে হইলে প্রথমত আবদ্ধ লোকদের নাম, ধাম ও সাংসারিক অবস্থা এবং তাহাদের পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা প্রয়োজন। তাহার পর আবশ্যক মত সাহায্য দিতে হইবে। এই সব সংবাদ করা একজন মানুষের দুঃসাধ্য। অন্যান্য কারণেই এই সব সংবাদ ভারতসভার মত কোন বিশ্বাসযোগ্য সভা দ্বারা সংগৃহীত হওয়া কর্তব্য। ভারতসভা এই কার্যের ভার লইতে না পারিলে এইরূপ কাজ করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত; কিন্তু লইতে না পারিবার কোন কারণ নাই।...এই সমিতি স্থাপনের কথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে প্রথম বলিয়াছিলেন এবং তিনি ইহার কর্মীসভ্য হইতে প্রস্তুত ছিলেন। কলিকাতায় ও মফঃস্বলের প্রধান প্রধান লোকদিগকে ইহার সভ্য করিতে হইবে। যে যে ক্ষেত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা চলে সেখানে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া এবং যে ক্ষেত্রে তাহাদের বাড়ির লোকদের সহিত দেখা করিয়া তাহারা কি কারণে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পর গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের মুক্তির জন্য যথাযোগ্য অবেদন প্রেরণ আবশ্যক।[৭]

সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত গবেষক শ্রীনেপাল মজুমদার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের

স্বকীয় প্রচেষ্টার একটি দিক উন্মোচিত করেছেন। ভারতসভা বা দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে এতটুকু উদ্যোগ গ্রহণ না করলেও রবীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। তাঁর প্রেরণায় কবির পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী ও ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন মহিলা উদ্যোগী হয়ে এই গুরুতর সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কলাতায় এক জনসভা করেন। এই সভায় প্রতিমাদেবী অ্যানি বেসান্তের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও কংগ্রেস সভাপতি পদে বেসান্তকে নির্বাচিত করার দাবি জানাতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বাংলার হতভাগ্য অন্তরীণাবদ্ধ ও রাজবন্দীদের দুঃসহ পীড়ন যন্ত্রণার বিবরণ দিয়ে তাঁদের মুক্তির দাবি জানান ও সেই মর্মে দুটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। প্রতিমাদেবীর ভাষণের খসড়া পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। নেপালবাবু মন্তব্য করেছেন, কলকাতার মহিলাদের এই সভা এবং এই সভায় প্রতিমাদেবীর এই ভাষণ এবং গৃহীত দুটি প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিপূর্বে দেশে আর কোন সভায়, বিশেষ করে মহিলা সভায়, 'ভারত রক্ষা আইনের' এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ হয়নি। তিনি বলেছেন, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেল : রবীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমাদেবী উভয়েই এই পর্বে রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর কোন সময়ে তাঁদের এই রকম সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের এই উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন কবির কাছ থেকেই। মনে হয়, প্রতিমাদেবী তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য কবির কাছে শুনে নিয়ে লিখেছিলেন এবং পরে কবি স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন। 'রবীন্দ্রভবন'-এ প্রতিমাদেবীর ভাষণ ও প্রস্তাবের যে খসড়া আছে, তাতে দেখা যায়, স্থানে স্থানে কবির হস্তাক্ষরে সংশোধন ও পরিমার্জন করে দেওয়া হয়েছে। 'প্রবাসী' সম্পাদক ও কবি সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার মহিলাদের এই ঐতিহাসিক সভার তাৎপয নির্দেশ করে লিখেছিলেন : প্রকাশ্য সভা হইতে এরূপ দাবি ভারতবর্ষে ইহাই সর্বপ্রথম করা হয়। ইহাই নারীদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।[১০]...

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক মহিলাসভায় প্রতিমাদেবীর ভাষণ ও প্রস্তাব দুটির পুনরাবৃত্তির প্রাসঙ্গিকতা আজও ম্লান-হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী মানস এই ভাষণ ও প্রস্তাবে বিধৃত। তাই এই ভাষণ ও প্রস্তাব দুটি

আবিষ্কার করে নেপালবাবু এক ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তিনি বক্তৃতার যে অংশবিশেষ রবীন্দ্র ভবনের অনুমতি ক্রমে উদ্ধৃত করেছেন, তা এখানে দেওয়া গেল।

প্রতিমাদেবীর ভাষণ : আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই মানিয়া লইলাম। শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে জাতীয় সভায় সভানেত্রী করিবার প্রস্তাবে এবং তাঁহার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতে আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমরা ঘরের কোণে থাকি, আমরা রাজনীতি ভাল বুঝিনা।...

কিন্তু যে প্রস্তাবের ভার লইয়া আমি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেই প্রস্তাবটি আমাদের এই মহিলা সভা হইতে উত্থাপিত হইবার যোগ্য। তাহা যতটা আমাদের নিজেদের কথা এমন আর কোনটাই নয়। তাহা আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত মা এবং বোনের মর্মান্তিক বেদনার আবেদন। তাহা রাজনৈতিক কূটনীতিকে ছাড়াইয়া যায়, কারণ তাহা আমাদের অন্তরের সত্যকার কথা। রাজপুরুষেরা ইহাকে বাহিরের চাপে চাপা দিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন তাহা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। আজ যে বাংলাদেশ ব্যাপী ইণ্টার্ণমেণ্ট প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এই নিষ্ঠুর আইনের দ্বারা বিস্তর লোককে বিনা দোষে বা সামান্য দোষে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এমনকি ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও বাদ যান নাই। ঐ সকল ইণ্টার্ণড যুক্ত যুবকদের পরিবারের খবর লইতে, সাহায্য করিতে কিংবা তাহাদের পক্ষ হইতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্য আমাদের অধিনায়কদিগের কাহাকেও দাঁড়াইতে দেখিলাম না কেন? আজ এই বাংলাদেশের এত বড় দুঃখের দিনে যে দিন সমস্ত বাংলাদেশের নরনারী হৃদয় প্রতিদিনই আত্মীয় বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে এবং আজ যখন আমরা কেহই জানি না সহসা কখন তাহার গৃহে রাজপুরুষদিগের রাজদণ্ড নামিয়া আসিয়া আমাদের শান্তিপূর্ণ গৃহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে এমন দিনে বাংলাদেশের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা বাংলার গৌরবের বিষয় নহে।

আজ বাঙালী কংগ্রেস লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে, দলাদলি করিয়া মরিতেছে কিন্তু Internment-এর মত এত বড় সমস্যা যাহা আজ সমস্ত দেশের বুকের মধ্যে একটা অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহার প্রতি কাহারও নজরই পড়িল না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেশের পুরুষরা ইহা

সহ্য করিলেও দেশের মেয়েরা বিনা বিচারে এই অবরোধের প্রথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না।

খবরের কাগজে পড়িয়াছি প্রায় দুই তিন জন বাঙালী ছেলে আত্মহত্যা করিয়াছে। এমন কথাও শুনা গেছে যে কোন কোন ইন্টারনড্‌ দেশের প্রতি কয়েদী আসামীর মত ব্যবহার করা হয়, এবং তাদের উপর কয়েদীর মত নিগ্রহ করা হইয়াছে। যারা সন্দেহের জন্য ইন্টারনড্‌ তারা তো জেলখানার কয়েদী নয়। এই সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্বে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় Craddock সাহেব এইরূপ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা নূতন করিয়া কথাটাকে চাপা দেওয়াতে নানা প্রকার আকাঙ্ক্ষায় আমাদের মনকে আরও ব্যাকুল করিয়াছে। একে ত একদিকে প্রকাশ্য বিচার নাই, অন্যদিকেও কোন সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পথ নানা প্রকারেই বন্ধ—এমন স্থলে এই অন্ধকার দেশের লোকের মন যে সকল বিভীষিকা দেখিতেছে তাহা ব্রিটিশ রাজনীতির মহৎ আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর।

যাহাই হউক কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আমাদের ব্যাকুলতা দূর করিতে উপেক্ষা করেন তবুও সকল প্রকার বাধা ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও আমাদের দেশের লোকের এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই তখন অন্তত আমাদের এই মেয়েদের সভা হইতে প্রস্তাবটি গৃহীত হউক ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রস্তাব ঃ সন্দেহ মাত্রের প্রতি নির্ভর করিয়া বিনা বিচারে বহু শত লোককে অদ্য ভারতের কর্তৃপক্ষ অবরোধ দণ্ডে নিপীড়িত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা হ্রাস হওয়ার যে আশঙ্কা ঘটিতেছে এইসভা তাহাকে শোচনীয় বলিয়া অনুভব করে এবং দণ্ডবিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও প্রতিমা দেবী উত্থাপন করেন ঃ অদ্য আমাদের দেশে বহু শত লোক বিনাবিচারে জেলখানায় ও অন্যত্র অবরুদ্ধ হইয়া অপরাধী বন্দীদের মত অপমান ও দুঃখ ভোগ করিতেছে। নিঃসন্দেহে ইহাদের মধ্যে নিরাপরাধ ব্যক্তি অনেক আছে। অবরোধকালে তাহাদের দুঃসহ কষ্ট এবং অবরোধের পর তাহাদেয় ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিরকালের জন্য সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও ক্ষতি স্মরণ করিয়া এই সভা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ অন্যায় ও কঠোর বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন এবং বন্দীদের আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।[১১]

ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক নীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। ১৯১৮ সালের ১১ জানুয়ারি তাঁর একটি বিবৃতি স্মরণীয়। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত বিবৃতিটি হলো: গত ২০ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের ষোড়শবর্ষ ছাত্র অনাথবন্ধু চৌধুরী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় ক্ষোভে আশ্রম হইতে পলাইয়া যায়। সে আট বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যায়ন করিতেছে। পরদিন প্রাতেই পুলিস ভাগলপুরে তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং ভারতরক্ষা আইনের বিধানে তাহাকে এখনও কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অনাথের পিতার আবেদন এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমার তারেও তাহার অবরোধ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়—পুলিস অনাথের আটক সম্বন্ধে কোন সংবাদ আশ্রমে আমাদিগকে দেয় নাই। অনাথের পিতাকে যে ভবিষ্যতে বিশেষ সতর্কভাবে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে অপরাধী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স্ক একটি বালককে দণ্ড দিতে বিলম্ব করা হয় নাই, অথচ দণ্ডদানের কারণ গোপন রাখা হইয়াছে। আমরা উৎকণ্ঠচিত্তে একটি গল্প প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কিন্তু গল্প রচিত হইতে এবং বালকটির মুক্তি লাভ করিতে যে বিলম্ব হয়, তাহা নিষ্ঠুর, যদি আমাদিগের শাসকগণের তাহাই বিধান হয় তবে আমরা কাহারও নিকট কৈফিয়তের বা প্রতিকারের দাবি না করিয়া আমাদিগের অভিযোগ আমরাই সহ্য করিব, কিন্তু আমাদিগকে যখন এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে বলা হয়, তখন অদৃষ্টে নির্ভর করিবার যে ভাব প্রাচীতে আমরা অনুশীলন করি, তাহাতেও আমরা অবিচলিত থাকিতে পারি না।[১২]

কবির এই বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেছেন: ভারতরক্ষা আইনের ইহা অপেক্ষা তীব্র প্রতিবাদ আর কেহ করিতে পারেন নাই[১৩]।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদিন ভারত ছাড়তেই হবে এ বিষয়ে কবির মনে কোন সংশয় ছিল না। তাই ভারত স্বাধীন হবার আগেই তিনি লিখেছেন: আরবার সেই শূন্যতলে / আসিয়াছে দলে দলে / লৌহবাঁধা পথে / অনল নিঃশ্বাসী রথে, প্রবল ইংরেজ, / বিকীর্ণ করেছে তার তেজ / জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, / কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ

বেড়াজাল / জানি তার পণ্যবাহী সেনা / জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না। [ওরা কাজ করে]

২

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সামরিক বাহিনী ও নৌ-বিদ্রোহ এবং উত্তাল গণবিক্ষোভে সারা দেশব্যাপী এক গণঅভ্যুত্থানের আশংকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশ বিভাগের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তানে বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের কাছে তদানীন্তন শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে। খণ্ডিত ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করলো। পাকিস্তানে ধর্মের জিগীর তুলে ক্রমশ গণতন্ত্রকে জবাই করা হলো। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো সামরিক শাসন—এবং তার শাসকগোষ্ঠী দেশটিকে ভারত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ক্রীড়নকে পরিণত করলো।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে সংবিধান চালু হলো তা ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র। স্বাধীনতার আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে রচিত ও প্রযুক্ত বিনা বিচারে আটক আইনসহ সমস্ত দানবীয় কালাকানুনগুলির সমালোচনা করে এসেছেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালের সবগুলি কালাকানুন বাতিল করবে এবং নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দৃঢ় বনিয়াদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁরা জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি ভুলে গেলেন এবং বিপরীত পন্থা গ্রহন করলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর পরিচালিত বুর্জোয়া-ভূস্বামী সরকারের মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র সংকুচিত ও খর্ব করার প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে তা নগ্নভাবে প্রকট হয়।

দেশ স্বাধীন হবার এক বছরের মধ্যেই বিদেশী ইংরেজ শাসকদের রচিত ঘৃণ্য দানবীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে ও তৎকালীন অবিভক্ত মাদ্রাজে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো, পার্টির সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশ বন্ধ করা হলো এবং পার্টির শত শত নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পুলিস ও আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হলো না। এক কথায় ঔপনিবেশিক শাসনের ধাঁচকে

কার্যত অপরিবর্তিতই রেখে দেওয়া হলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামে পুলিস ও প্রশাসন মালিকের পক্ষই অবলম্বন করতে থাকলো। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠী সামন্তবাদের সঙ্গে আপস রফার ভিত্তিতে ভারতকে ধনতান্ত্রিক রাস্তায় নিয়ে যেতে সচেষ্ট হলো। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৯ বছর পরও সারা দেশে বহু কালাকানুনের নিপীড়নমূলক রাজত্ব বজায় আছে এবং পুলিস ও আমলাতন্ত্রের চরিত্রের কোন পরিবর্তনহয় নি।

১৯০৫ সালে বিচারালয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের হেবিয়াস কর্পাস (আদালতে বন্দী প্রদর্শন) আবেদন নিয়ে শুনানী চলছিল। তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ব্রিটিশ আমলে রচিত যে আইনগুলি প্রয়োগ করে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে, আদালত সেগুলিকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করবেন। এটা বুঝতে পেরেই জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি বিনা বিচারে আটকের জন্য একটি কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স—'নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিনান্স' জারি করলেন। এই অর্ডিনান্সই পরবর্তীকালে নিবর্তনমূলক আটক আইনে পরিণত হয়। আদালতের রায়ে মুক্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নির্বতনমূলক আটক অর্ডিন্যান্সে জেল গেটেই আবার গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়। স্বাধীন ভারতে বিনা বিচারে আটকের এটাই প্রথম কেন্দ্রীয় আইন। জওহরলাল নেহেরুর সৌভাগ্য যে ততদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন না।

এই নিবর্তনমূলক আটক আইন ১৯৬৯ পর্যন্ত একটানা চালু ছিল। এটা সুবিদিত যে এই নিবর্তনমূলক আটক আইনকে সারা দেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে প্রয়োগ ও গণআন্দোলন দমনের কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে।

১৯৬৯ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার কার্যত সংখ্যালঘু, কংগ্রেস বিভক্ত। সেই সময় নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। ভি. ভি. গিরি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর বেসরকারী প্রার্থী ও সরকারী কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডি। তখন পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে যুক্তফ্রন্টের শাসন চালু ছিল। আরো কয়েকটি রাজ্যেও অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত। একই বছর নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ হবার কথা। ভি. ভি. গিরিকে নির্বাচিত করার জন্য বিরোধীদের একটা বড় অংশের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। ইন্দিরা গান্ধী কৌশলগত কারণে আটক আইনের মেয়াদ না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং আইনটি বাতিল হয়ে যায়। বিরোধীদের সমর্থনে ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালে 'গরীবী হটাও'-এর চমক লাগানো শ্লোগান তুলে ইন্দিরা কংগ্রেস কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তারপরই বিনা বিচারে আটকের একটি নতুন আইন—'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন' (মিসা) প্রণয়ন করা হয়। জরুরী অবস্থার শাসনের শেষদিন পর্যন্ত ঘৃণিত 'মিসা' বলবৎ ছিল।

কেন্দ্রে জনতা সরকারের শাসনকালে এই 'মিসা' বাতিল করা হয়। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে আবার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নতুন একটি বিনা বিচারে আটক আইন—'জাতীয় নিরপত্তা আইন' (নাসা) প্রণয়ন করা হয়। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই কংগ্রেস সরকার এবং পরে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার কাযত বিনা বিচারে আটক আইনের সাহায্যেই দেশ শাসন করেছে। ব্রিটেনসহ অপর কোন সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে এ ধরনের নিপীড়নমূলক বিনা বিচারে আটক আইনের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ ভারতের শাসকশ্রেণী ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদায় ব্যবস্থা চালু করেছে বলে দাবি করে। আসলে ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির সংসদায গণতন্ত্রেব প্রতি কোন আস্থা নেই। গণতন্ত্রকে এরা কোনদিনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। যখনই জনসাধারণ সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলিকে নিজেদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ণের কাজে লাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন তখনই শাসক কংগ্রেস তার গণতান্ত্রিক নামাবলী খুলে ফেলে দিয়ে নগ্নভাবে দমন পীড়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ও একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার নেশায় কংগ্রেস নির্বাচনে জয় লাভের জন্য জঘন্য কারচুপির আশ্রয় নিয়ে চলেছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনসাধারণের অন্যান্য অংশের গণ-আন্দোলন দমনের জন্য নতুন নতুন কালাকানুন প্রয়োগ করেছে। এটাই হলো স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক। ১৯৭৪ সালে সারা দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট দমনের জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বিনা বিচারে আটকসহ নির্বিচারে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা সুবিদিত।

কিন্তু এই দমনপীড়নের চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ইন্দিরা গান্ধীর সারা দেশে 'আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা' ঘোষণায়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা ভারতীয় সংবিধানের এক মৌলিক গলদ উদ্ঘাটিত করল। কারণ সংবিধানের ৩৫২ নং ধারায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা আছে। শাসকশ্রেণীগুলি এই ধারাটির সুযোগ নিয়ে 'গণতন্ত্র রক্ষার' নামে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার দিকে এগিয়ে গেল।

আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সর্ব প্রকারের গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠন গড়ার অধিকার, গতিবিধির অধিকার, সংবাদ-পত্রের অধিকার প্রভৃতি সমস্ত অধিকার হরণ করা হলো। মিসা ও অন্যান্য দানবীয় আইন বলে লক্ষাধিক মানুষকে আটক করা হলো, সমগ্র দেশকে একটি জেলখানায় পরিণত করা হলো। সংবাদপত্রের ওপর প্রাক-সেন্সারশীপ আরোপ করা হলো। সংবাদের কাযবিবরণী প্রকাশও সেন্সারশীপের কবল থেকে রেহাই পেল না। রবীন্দ্রনাথ এবং জওহরলাল নেহরুর রচনাগুলি থেকে উদ্ধৃতিও সেন্সারশীপের কবলে পড়ল। আটকবন্দীরা যাতে আদালতে যেতে না পারেন তার জন্য 'মিসা' চারবার সংশোধন করা হলো। ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি অবৈধ ঘোষণা করা হলো। এ সমস্ত কিছু করা হলো 'সংসদীয় গণতন্ত্র' রক্ষার নামে। কাযত সংসদীয় গণতন্ত্রকে এক প্রহসনে পরিণত করা হলো। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, সারা ভারতের সংগ্রামী ও গনতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ।

রাতে সিঁদ কাটার আগে চোর যেমন সকালবেলায় সিঁদকাঠি ধার দেয়, তেমনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতব্যাপী জরুরী অবস্থা জারির আগাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বামশক্তির ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের ওপর। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অঘোষিত জরুরী অবস্থার শাসন চলছিল ১৯৭২ সাল থেকে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে যে প্রশাসনিক জালিয়াতি ও পুলিসের সহায়তায় কংগ্রেসের সশস্ত্র হামলাবাজদের আক্রমণ চলে তাতে নগ্নভাবে ভোটদাতাদের ভোটাধিকার হরণের এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হয়েছে। সেই নির্বাচনে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনী প্রহসনের পর সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিস ও ইন্দিরা কংগ্রেসী হামলাবাজদের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পযন্ত এই রাজত্ব চলে। এই সময়ে সি পি আই (এম) এর ১১শ' কর্মী নিহত হন। পার্টির ও গণসংগঠনগুলির প্রায় ৩ হাজার অফিস পুলিসের সহাযতায় ইন্দিরা কংগ্রেসীরা দখল করে নেয়। সি পি আই (এম) এর কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থক পরিবার ঘর ও পাড়া-ছাড়া হতে বাধ্য হন। সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির গোপন পরিকল্পনা করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর সৃষ্ট 'রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইং' বা সংক্ষেপে 'র'।

দেশের জনসাধারণ কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর এই একদলীয় একনায়কত্বের রাজত্ব মেনে নেন নি। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশের মানুষ ইন্দিরা কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং নির্বাচনে পরাজিত হলেন। জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করল। পশ্চিমবঙ্গে '৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস লোকসভা থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু পরে আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে জনতা সরকার ভেঙে যায় এবং ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর একের পর এক আক্রমণ নেমে আসে। প্রথমেই চালু হয় বিনা বিচারে আটক রাখার 'নাসা' আইন। তারপরই জীবনবীমা কর্মচারীদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে একতরফাভাবে কর্মচারীদের বেতন ও চাকরীর শর্তাদি নিধারণ করতে পারেন সেজন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়।

১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে ১৬টি শিল্পে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে 'এসমা' অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। পরবর্তীকালে তা 'এসমা' আইনে পরিণত হয়। এই সব শিল্পে ধর্মঘট করলে যাতে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় সেইভাবে 'নাসা' আইনের সংশোধন করা হয়েছে। 'নাসা' ও 'এসমা' প্রভৃতি আইন বামফ্রন্ট সরকারগুলি প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু কংগ্রেস-(ই) শাসিত রাজ্যগুলিতে শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে তা প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে।

১৯৮২ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন, শিল্প বিরোধ আইন ও মজুরী প্রদান আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। তা ছাড়া হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতির কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করে একটি নতুন আইনের প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করা হয়।

তবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের ক্রমবর্ধমান স্বৈরতান্ত্রিক এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারত জুড়েই শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদ সংগঠিত করে। তাঁরা অনুভব করেন যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালের জুন মাসে আই-এন-টি-ইউ-সি বাদে ৮টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশানগুলির যুক্ত কনভেনশন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের

একটি জাতীয় প্রচার কমিটি গঠিত হয়। এই প্রচার কমিটি ইতিমধ্যে ভারত ব্যাপী বহু প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত শ্রীরাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। অবশ্য এই মুকুট কাঁটার মুকুট। কারণ গত ৩৭ বছরে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে অসমবিকাশের দরুণ যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার জট বেঁধেছে, এ সমস্ত কিছুর আশু সমাধান করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত সমস্যা ছাপিয়ে যে সমস্যাটি তীব্রতম হয়ে উঠেছে তা হলো ভারতের অর্জিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করা। মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের লোভাতুর করেছে। ভারত আজ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা সারা দেশে এক অস্থির অবস্থা সৃষ্টির জন্য নানা ষড়যন্ত্র করছে। সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী শিখদের খালিস্তান দাবি বা সন্ত্রাসবাদী গোর্খা ন্যাশানাল লিবারেশান ফ্রন্টের গোর্খাল্যাণ্ড দাবির পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত রয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে। রাজনৈতিক প্রচার অভিযানের দিকটি অবহেলা করে শুধুমাত্র প্রশাসনিকভাবে ঝটিতি মোকাবিলা করার উদগ্র বাসনার ফলে কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস-(ই) সরকার তড়িঘড়ি যে 'সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী (নিরোধ) আইন' প্রণয়ন করেছেন, তাতে এই আশঙ্কা স্বভাবতই সৃষ্টি হয়েছে যে অন্যান্য নিরোধ আইনের মতো এই আইনটির যথাস্থানে প্রয়োগ না করে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা হবে। সে কারণেই লোকসভা বিরোধীদলের সদস্যরা এই বিল নিয়ে আলোচনার সময় তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আরেকটি দানবীয় আইন পাশ করা হয়েছে। বামপন্থী সংসদ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই) সরকার 'সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী (নিরোধ) বিল, ১৯৮৫' ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেয়। পাশ হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা নিয়েছে এবং আমলাতন্ত্রের ও পুলিসের হাতে বিরাট ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। এতে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই

আইনের অপপ্রয়োগ হবে এবং গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য তা ব্যবহৃত হবে।

এটা দিনের আলোর মতো সত্য যে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বাড়ছে। ফলে শুধু অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে তা নয়, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাও বিপন্ন হচ্ছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস (ই) সরকার বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিজের হাতে যে বিরাট ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন তা সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ দমনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই সব দমনমূলক আইন হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার যে সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্যর্থ হয়েছেন তা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে শুধু আইন প্রণয়ন করে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা হয় যে এই নতুন আইন বিরোধী রাজনৈতিক মত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদী গণ-আন্দোলন দমনের জন্যও প্রয়োগ করা হবে।

ইন্দিরা সরকারের আমল থেকে সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি দমনমূলক আইন পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে দানবীয় ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন। 'নাসা' আইন, সন্ত্রাস কবলিত এলাকা (বিশেষ আদালত) আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে 'নাসা' আইন সংশোধন করে তাকে আরো কঠোর করা হয়েছে। আর্মস অ্যাক্ট (অস্ত্রশস্ত্র) আইন বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

নতুন 'সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের সংজ্ঞা এতো ব্যাপক করা হয়েছে যে, কোন ন্যায্য গণআন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও তার আওতায় পড়তে পারে। এই আইনের বলে অস্বাভাবিক করের বোঝার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা অন্য কোন গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে ও কঠোর শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

এই আইনে সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে। এই আইনে ধৃত ব্যক্তির বিচার সাধারণ আদালতে হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে যে নির্দিষ্ট আদালত নিয়োগ করবেন সেই আদালতেই তার বিচার হবে। এই রকম প্রত্যেকটি আদালতের জন্য রাজ্য সরকার একজন পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ করবেন। এই নির্দিষ্ট আদালত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বা কেবলমাত্র পুলিস রিপোর্টের ভিত্তিতে

ধৃত ব্যক্তির অপরাধ মেনে নেবেন ও বিচার করবেন। বিচার হবে সুরক্ষিত রুদ্ধশ্বাস কক্ষে (সাধারণত কোন জেলখানায়)। সাক্ষীদের নাম বা ঠিকানা জানানো হবে না। এমন কি এভিডেন্স অ্যাক্ট বা সাক্ষ্য প্রমাণের আইনের ধারাগুলিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নির্দিষ্ট আদালত যে শাস্তিবিধান করবেন তার বিরুদ্ধে আপীল শুধুমাত্র সুপ্রীম কোর্টে করা যাবে, হাইকোর্টে নয়। সুপ্রীম কোর্টে বকেয়া ৮৫ হাজার মামলা জমে আছে। ফলে নির্দিষ্ট আদালতে শাস্তি প্রাপ্ত কেউ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলে সে মামলা কবে উঠবে তার কোন স্থিরতা নেই। সন্ত্রাস কবলিত (বিশেষ আদালত) আইনে যাদের ধরা হয়েছে তাদের আপীলগুলির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টে এখনও শুনানি আরম্ভ করতে পারেননি। ফলে শত শত নিরপরাধ যুবক ও ব্যক্তি বছরের পর বছর জেলে পচতে থাকবে।

এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতাগুলিও ভোগ করতে পারবেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধান রাজ্য সরকারগুলিকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, এক কলমের খোঁচায় কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাকেও নাকচ করে দিয়েছেন।

৩

স্বাধীনতার আগে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত ভারতে যে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতের জনগণ আজও তা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। স্বাধীন মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদ থেকে আজও বঞ্চিত। মেহনতি মানুষে মানুষে অটুট একতা ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে পোক্ত কোটি কোটি মুষ্টিবদ্ধ হাতই ছিনিয়ে আনতে পারে মুক্তির সূর্যকে।

সূত্র-নির্দেশিকা :

১. রক্তকরবী : রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা।

২. ১৯৪১ সালের ২৮ মে ভারতীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে এই খোলাচিঠি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস র‍্যাথবোন (Miss Eleanor E. Rathbone) রটেরের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করেন। চিঠিখানির মর্মার্থ আনন্দবাজার পত্রিকা-১৬, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮। ৩০ মে, ১৯৪১-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. মৃত্যুর কিছুকাল আগে অসুস্থ শরীরে রবীন্দ্রনাথ মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাব মুখে মুখে বলে গেলে কৃষ্ণ কৃপালনী তা লিখে নেন। ৪ জুন,

১৯৪১ সালে চিঠিটি প্রকাশের জন্য দেয়া হয় 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে'। পরের দিন অর্থাৎ ৫ জুন ১৯৪১ সালে প্রবাসী [আষাঢ়, ১৩৪৮ ॥ পৃঃ ৩৯২-৯২] ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪ মিঃ মিড (Mr. Mead)-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক খোলা চিঠির অংশবিশেষ।

৫ ঐ

৬. ঐ

৭. Bengalee, August, 14, 1917.

৮ ১০ আগস্ট (১৯১৭) আলফ্রেড থিয়েটার হলে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অংশ বিশেষ।

৯ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৪। পৃঃ ১১১।

১০ প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪, ইং ১৯১৭, পৃঃ ১১৭।

১১. প্রতিমা দেবীর ভাষণের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। মূল পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেস।

১২ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা আছে।

১৩ ঐ। পৃঃ ৪৪-৪৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ রবীন্দ্র জীবনী / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ নেপাল মজুমদার।

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী।

৪ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ : ডঃ রামরঞ্জন রায় / গণমানস. রবীন্দ্র সংখ্যা।

৫. দেশহিতৈষী : শারদ সংখ্যা, ১৯৮৪।

৬. দেশহিতৈষী : শারদ সংখ্যা ১৯৭৭।

৭ শ্রমিক আন্দোলন : বিভিন্ন সংখ্যা।

নারায়ণ চৌধুরী

সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির এক অনির্বাণ জ্যোতির্ময় শিখা। তাঁর আবির্ভাবের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল আর তিনি যখন এ মর সংসার থেকে বিদায় নিলেন তখনইবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল—এই দুইয়ের প্রতিতুলনা করলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছিলেন। আমরা আপাতত তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভার দানের অজস্রতা ও ঐশ্বর্যের কথা ধরছি না, হিসাবের মধ্যে একথাও গণ্য করছি না যে তিনি তাঁর সর্বাতিশায়ী ক্ষমতায় একাই ছিলেন একশো। সে একটা ভিন্নতর প্রসঙ্গ, তার আলোচনা অন্য কোন উপলক্ষে করা যেতে পারে, কিংবা এই আলোচনা আমাদের সাম্প্রতিক সমালোচনা-সাহিত্যে এত হামেশাই হয় যে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির সার্থকতা দেখি না। আপাতত যেটা আমাদের বিবেচ্য তা হল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা শিল্প-সাহিত্যের জগৎ থেকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের জগতের সুরের মৌলিক ভিন্নতা। এই ভিন্নতার পরিমাপ করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথ কত দিক দিয়ে কত ভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে নির্মল ও পরিশোধিত করে গিয়েছিলেন, কবির আগের ও পরের বাংলা সাহিত্য সে যেন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রহলোক, একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সেখানে এসে থেমেছিলেন, সেখান থেকে আর পুরাতন যুগে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না—পুরাতন যুগের রুচি বিশ্বাস অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির আদল তিনি এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যে রবীন্দ্র-যুগ থেকে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ-পরিক্রমার শুরু হয়েছে, ওই পথ-চলার ভঙ্গির সঙ্গে গত যুগের ধরন-ধারন করণ-কারণের কোনই মিল নেই।

কোন জাদুর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিরাট,

প্রায়-অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সংঘটিত করেছিলেন? সে কি শুধুই তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বহু বিচিত্র পথগামী কল্পনার সমৃদ্ধি? নাকি ওই জাদুর মূলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতারও একটা মস্ত বড় ভূমিকা ছিল? তাঁর সৃষ্টিশীলতার ব্যাপ্তি, গভীরতা, অজস্রতা, বৈচিত্র্য ও অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, আমাদের মনে হয় কবি যে-দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন, জগৎ ও মানুষকে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টিকোণটাই ছিল এক অসামান্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যে-অসামান্যতার মধ্যে তাঁর অন্যপরতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়েছিল অত্যন্ত অমোঘ ও অসংশয়িত রূপে। কবির এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিকোণের একটু হিসাব নিকাশ করা যেতে পার।

কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের কলকাতার এক শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ও বিত্তসচ্ছল পরিবারে। কিন্তু ধণী গৃহের বিলাস-ভোগের সংস্কার তিনি নিজ জীবনে গ্রহণ করেন নি, বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন সংযম-শাসনে শাসিত ও আচার-আচরণ অতিরেকের মোহ বর্জিত। তিনি জমিদার-সন্তান, জমিদার-গৃহের তদানীন্তন জীবন যাত্রার রীতি অনুযায়ী তাঁর পক্ষে আমাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া এমন কিছু অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আশ্চয আত্মসংবরণের ক্ষমতার দ্বারা তিনি চারদিককার ক্লিন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই প্রথম বয়সে তিনি যে সকল কাব্য, সঙ্গীত ও গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নাগরিকতার সংস্কার প্রবল এবং জন-জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু এই ত্রুটিপূর্ণ একদেশ-দর্শিতা ও একাঙ্গিতা তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন গ্রাম জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রে। জমিদারী কার্য পরিচালনার উপলক্ষে যখন থেকে বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হল, তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিমিশ্র আনন্দবাদ আর রইল না, তার ভিতর বাংলার বৃহত্তর জনজীবনের দুঃখের চেতনা প্রবেশ করল। সেই থেকে তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক শিল্পী রইলেন না, হয়ে উঠলেন গোটা বাংলাদেশের শিল্পী। বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা তাঁর চৈতন্যের মমমূলে প্রবেশ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল। 'চিত্রা'[১] কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি অম্নি লেখা হয়নি। ওই ঐতিহাসিক রচনাটি কবি-ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের একটি লক্ষণীয় ধাক্কা।

একটি জিনিস লক্ষ্য করবার মত। নাগরিকতার পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে কবি প্রথম বয়সের কাব্য-কবিতা রচনা করলেও অশালীনতা কিংবা রুচিদৈন্য কিন্তু তাঁর রচনা দেহকে কখনোই স্পর্শ করেনি। ওই পর্বের কবিতায় দেহবাদী মনোভঙ্গি অর্থাৎ যৌনতার স্মারক শব্দচিত্র প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, ইচ্ছা করলেই নাগরিক শিল্পাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর তখনকার একাধিক কবিতায় কল্পনার লাগামে আলগা দিতে পারতেন। কিন্তু এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, স্বেচ্ছা-সংযমের বর্মে আপনাকে আবৃত করে কলকাতা শহরের যুবক কবি তাঁর বয়সের পক্ষে বেমানান আত্মশাসন দ্বারা কীভাবে তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে মণ্ডিত করলেন সে একটা রহস্য হয়েই থাকল। এই রহস্যের তল পাওয়া যাবে না যদি-না আমরা স্মরণে রাখি যে, জীবনের একেবারে সূচনা থেকেই কবি বাংলা সাহিত্য-সংসারের তৎকাল প্রচলিত সাংস্কৃতিক সংস্কার ও রীতিনীতি জেনেশুনে বর্জন করেছিলেন এবং তার জায়গায় সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন।

দেখা যায় তাঁর প্রাথমিক পর্বের রচনাগুলিতে বয়সোচিত আঙ্গিকগত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও অমার্জিত রুচির ছাপ নেই। তিনি যখন ছাপার অক্ষরের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সেটা গত শতকের সত্তরের দশকের শেষার্ধ ভাগ। অর্থাৎ বয়স তখন তাঁর চোদ্দ-পনেরো পেরিয়েছে। তার আগে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া খুবই নির্মল ছিল এমন বলা চলে না। বরং এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেম-নবীন-বিহারীলাল প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা বাদ দিলে সাহিত্যের অবশিষ্ট অংশে কুরুচির দাপট খুবই প্রবল ছিল। সেই সর্বাত্মক রুচি দৈন্যের প্রভাব কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথের ওপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি ওই বয়সেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বীয় রুচির বোধ নিজেই নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন এবং তার আলোকে পথ চিনে চলেছিলেন। একথা সত্য যে, গীতি-কবিতার আদর্শের প্রেরণাটি পেয়েছিলেন তিনি তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে। কিন্তু রুচিটি ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই রুচি তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন আপনার স্বপ্ন-কল্পনা-ভাবনা-ধারণার জগৎ থেকে তাঁর একান্ত অনুভূতিপরায়ণ সংবেদনশীল কবি-অন্তর থেকেই সেই রুচির উৎসার এবং সেখানেই ওই রুচির মূল। রুচির এই স্বকীয়তাই পরবর্তী কালে

রবীন্দ্রনাথকে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর গোটা ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রয়োগে প্রণোদিত করেছিল।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ 'কড়িও কোমল'-এর কিছু কবিতা (চুম্বন, বাহু, স্তন ইত্যাদি), 'মানসী' কাব্যের ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, প্রভৃতি, 'সোনার তরী' কাব্যের নিদ্রিতা সুপ্তোত্থিতা, ঝুলন, ব্যর্থ যৌবন ইত্যাদি, 'চিত্রা' কাব্যের উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতা এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের মধ্যে রুচির স্খলন প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করেন এবং সেই নজীরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্য সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আজকের দিনের উদার ও পরিশীলিত সাহিত্যনীতির মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এমনতর অভিযোগ কত না হাস্যকর বলে মনে হয়। কবি উল্লিখিত কবিতাগুলির কোন কোনটিতে নারীদেহ বর্ণনা করলেও মনে রাখতে হবে যে ওই বর্ণনা সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব কবিসুলভ শ্রেষ্ঠ ধ্বনির শাসন দ্বারা সুরক্ষিত, শব্দের লাবণ্য, মাধুর্য ও শ্রুতি লালিত্য নারীদেহ বর্ণনার বাস্তব শারীরসংস্থানচেতনাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিয়েছে। রুচিদৈন্যের একটা প্রধান উৎস হল অনুভবের স্থূলতা ও তজ্জনিত শব্দের কার্কশ্য। রবীন্দ্র-কাব্য এ জিনিস সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সুতরাং কোন রন্ধ্রপথে রুচিবিকার রবীন্দ্র রচনায় প্রবেশ করবে? তথাকথিত আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা বাস্তবতার নাম করে প্রায়ই তাঁদের কবিতায় আটপৌরে ও ও কাঠখোট্টা শব্দের সমাবেশ ঘটান এবং অহেতুক অন্তরের অনুভবকে ছাল ছাড়িয়ে প্রকাশ করেন। আমাদের বোঝা দরকার যে, ওই ছিদ্রপথেই প্রায়শ রুচিদৈন্য কবিতাদেহকে আক্রমণ করে ও তাকে অসুস্থ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতা ও সুস্থতার এক প্রতিমূর্তি। তাঁর কাব্য ধ্বনির সুষমায় আগাগোড়া খণ্ডিত, শ্রুতির সৌগন্ধ্যে অনুলিপ্ত। সুতরাং অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর কাব্যের বেলায় মোটে টেকে না।

আমরা অপসংস্কৃতি ও রুচিবিকারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সংগ্রাম করব। কিন্তু রক্ষণশীলতার শুচিবাইকে যেন কখনও সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। নীতিবাগিশতা আর রুচির পরিচ্ছন্নতা এক জিনিস নয়। রবীন্দ্র-রচনার প্রতি একদা যাঁরা অশ্লীলতার অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তাঁরা প্রমাদবশত শুচিতা

ও শুচিবাইকে সমীকৃত করে ফেলেছিলেন। মজ্জাগত রক্ষণশীলতাই এই অনুচিত সমীকরণের জন্য দায়ী।

আবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগও করা হয়। কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে তিনি ব্রাহ্ম নীতিবাদ দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে জীবনের স্বাভাবিক কামনা বাসনার সার্থক প্রকাশ তাঁর কাব্যে ঘটেনি। দেহগত চাওয়া ও পাওয়ার সুতীব্র উত্তেজনার আনন্দ তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য, রবীন্দ্র-শিল্প অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয়তার চাপে রক্তশূন্য পাণ্ডুরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। বরং জৈব কামনা-বাসনার একান্ত প্রত্যাশিত অভিব্যক্তির শিল্পে গোবিন্দ দাস, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবিরা তুলনায় অনেক বেশী জীবনের কাছাকাছি ছিলেন। একজন প্রখ্যাত সমালোক (ডঃ সুশীলকুমার দে) বাস্তবতার মাপকাঠিতে দীনবন্ধু মিত্রের জীবন-চিত্রণকে 'ব্রাহ্ম শালীনতায়' অধিকৃত রবীন্দ্রনাথের জীবন-চিত্রণের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, শশাঙ্কমোহন সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমালোচনা (রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে সমালোচনা)-ও স্মরণ যোগ্য।

এর উত্তরে বলব, কে কীভাবে সাহিত্যকে দেখেন তার ওপরই নির্ভর করে সাহিত্যের বিচারের তারতম্য। পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পর সাহিত্যের পুরাতন ধ্যান-ধারণার আমূল রূপান্তর সাধিত হতে চলেছিল—ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। তিনি তাঁর একক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের দ্বারা গোটা আবহাওয়াটাকেই পাল্টে দেবার উপক্রম করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও সাহিত্যে দেহবাদীও ছিলেন না আবার কট্টর নীতিবাদীও ছিলেন না। তিনি সর্বদাই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সাধক ছিলেন, 'সুবর্ণ মধ্যম'-এর প্রথাবলম্বী ছিলেন। জীবন ও জগৎকে দেখার ভঙ্গিমায় তিনি তিনি ছিলেন স্থির, শান্ত, আত্মসমাহিত, অনুদ্বেজিত, অনুদ্বেল, কাজেই মানবীয় কামনা-বাসনার প্রকাশে তিনি প্রাকৃত জনোচিত উদ্দামতার সংস্কারকে যেমন প্রশ্রয় দেননি, তেমনি রক্ষণশীল নীতিবাগীশের আসনে সমাসীন হয়ে নীরক্ত অন্ধ-ভাবিকতার পক্ষেও পাতি দেননি। কবির জীবন-রূপায়ণ তথা চরিত্র-চিত্রায়ণ দুই প্রান্তীয় বিচ্যুতিকে বাঁচিয়ে বরাবর 'ঝমঝম নিকায়' বা মধ্যপথ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছে। যুগে যুগে জ্ঞানীদের এইটেই পথ—তাঁরা প্রবৃত্তির অমিতাচার ও প্রবৃত্তিশূন্যতা এই দুই চরমকেই সযত্নে এড়িয়ে চলেন। রবীন্দ্রনাথ তো শুধুই কবি

নন, তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠও বটেন। কবির কল্পনার ঐশ্বর্য ও জ্ঞানীর ক্ষুরধার বিচার পরায়ণতা এই দুইয়ের এককালীন সমাহার ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। সুতরাং কেমন করে তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস অথবা প্রবৃত্তির রক্তশূন্যতার পোষকতা করতে পারেন? এ যে তাঁর তাঁর নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও তাঁর পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের একজন উৎসাহী অনুগামী ছিলেন। তিনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক বছর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারীও ছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণের ক্ষেত্র; তার সঙ্গে তাঁর কাব্যের জগৎকে একত্রে মিশিয়ে ফেললে খুবই ভুল করা হবে। ব্রাহ্ম সমাজের একাংশ নীতির শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করত—এই অভিযোগ যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও ওই সাক্ষ্যের জোরে কবিকে নীতিবাগীশতার কিংবা রুচির খুঁতখুঁতে বাইয়ের অভিযোগ অভিযুক্ত করা চলে না। তা যদি হত তো পূর্বোক্ত কবিতাগুলি তিনি লিখতে পারতেন না কিংবা উত্তরকালের সৃষ্টিশীল জীবনে 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাস 'ল্যাবরেটরীর' মত গল্প তাঁর কলম থেকে বেরোত না। কিংবা তাঁর তুলিকাপাতে থাপ ছাড়া অত্যদ্ভুত এক রূপের জগৎ উন্মোচিত হতে পারত না অগতানুগতিক রঙ ও রেখাঙ্কনের সহায়ে গঠিত এক বিচিত্র চিত্রশালার মাধ্যমে।

আসলে রবীন্দ্রনাথ না নীতিবাদী, না প্রবৃত্তির উচ্ছলতার পক্ষপাতী। তিনি শান্ত-সুন্দরের উপাসক। সুনীতির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন কিন্তু সুরুচির মূল্যে নয়। জীবনের বাস্তব অর্থাৎ জীবনের সত্যকে তিনি প্রভূত গুরুত্ব দেন কিন্তু সৌন্দর্যের মোহন প্রলেপ দ্বারা কমনীয় ও মোলায়েম করে আনবার পক্ষপাতী। এই ক্ষেত্রে কীটসের কাব্যাদর্শ ('ট্রুথ বিউটি, বিউটি ট্রুথ') আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে। অর্থাৎ সত্যের অপহ্নব ঘটিয়ে তিনি সৌন্দর্যের পোষকতা করেন না, আবার সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়ে তিনি সত্যের পশ্চাদ-ধাবণ করেন না। কবির শিল্পদৃষ্টিতে সৌন্দর্যও সত্য 'হরি-হর মিলি হইল এক।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সমন্বয়মূলক শিল্পসৃষ্টিকেই 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি বইতে বিস্তার করে বুঝিয়েছেন,

কবির অনবদ্য ভাষা ও ভাবের লাবণ্য সাহিত্যের তত্ত্ব আর তত্ত্বের কঙ্কালমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য রূপরঙের এক উজ্জ্বল শারীর-প্রতিমা, কবির সাহিত্য-সমালোচনার পরতে পরতে রস, বাঁকে বাঁকে সৃষ্টির স্বাদ। তাঁর প্রত্যেকটি নিজেই এক সৃষ্টি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির পরিপোষক ছিলেন বলা মানেই তিনি সমন্বয় তত্ত্বের সাধক ছিলেন। অর্থাৎ সুন্দরের সঙ্গে শিবের অন্বয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন। একদিকে ভাবের অসংযম, অন্যদিকে ভাবের বন্ধ্যাত্বের তিনি প্রতিবাদী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, তাঁর পক্ষপাত ছিল মধ্যপন্থার দিকে, যার অন্য নাম 'স্বর্ণ মধ্যম' ('গোল্ডেন মীন') অ্যারিস্টটল কথিত এই সোনালী মধ্যযানের মূল কথাই হলো উদারতা। উদারতা চিন্তায় কদর্য, রচনায় এটা একটা 'অ্যাটিচ্যুড' জীবনকে দেখবার একটা বিশেষ রূপ। এই ভঙ্গিতে অতিরেককেও সমর্থন করা হয় না আবার অতিরেক বা আতিশয্যের মধ্যে শক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে স্বীকার করে নেবার মত উদারতা দেখা যায়। এক পরম প্রসন্নতা ও সহিষ্ণুতার জীবনকে গ্রহণ করবার মানসিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতি এমনতর সহিষ্ণুতার হাত ধরাধরি করে চলে, ক্ষমা প্রায়ই সহানুভূতির সহযাত্রী হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই পরম-উদার ক্ষমাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় কল্লোল যুগের তরুণ লেখকদের প্রতি মনোভাবে, সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বিচিত্র মাসিকে প্রকাশিত তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'সাহিত্য ধর্ম' এই প্রতিবাদের দলিল বহন করছে। তার পরেও ওই একই সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের নবত্ব' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধের ভাবটিকে আরও বিস্তার করেন। দুটি প্রবন্ধেই তিনি তরুণ লেখকদের অমিতাচারের সমালোচনা করে তাঁদের ভৎর্সনা করেছেন কিন্তু সেই ভৎর্সনা, লক্ষ্য করার বিষয়, স্নেহ মিশ্রিত, স্নেহের ভিতর উদারতার ভাব ওতপ্রোত।

এই সাহিত্যের নবত্ব প্রবন্ধেই কবি নবীন লেখকদের বেআব্রুতার আস্ফালনকে তিরস্কার করেও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে তাঁদের কারও কারও রচনায় শক্তিমত্তা আছে। লিখেছেন: আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে পরিচয় পাকা

হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি, এ কথা আমাকে মানতে হবে, মাঝে মাঝে ক্ষণ-কালের দেখাশোনা হয়েছে তাকে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি শিক্ষিত হয়েছি।[২] এর পর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লেখেন : যেসব লেখক বেআব্রু লেখা লিখেছে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে, যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। সেটা প্রশংসার যোগ্য সেখানে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়। অন্যত্র নবীন লেখকদের 'লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন'কে নিন্দা করে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তাঁদের স্বীকার করে বললেন, 'বাংলার নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিলেন এঁরাই।' তৎকালীন নবীন লেখকদের অগ্রগণ্য শৈলজানন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।...তিনি সহজেই ঠিক কথা বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কারিপাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। কারি-পাউডারি ভঙ্গি অর্থাৎ নকল ভঙ্গি।

এসব উদ্ধৃতি সংকলিত করবার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য। তা হল, দেখানো যে, কবি অপ-সংস্কৃতির অলজ্জতা ও নকলনবিশীর ঘোরতর বৈরী হলেও ক্ষমাহীন ধিক্কারের পথে তিনি তরুণ লেখকদের স্বীয় স্নেহাচ্ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি, তাঁদের শক্তির বিকাশের সম্ভাব্যতায় তাঁদের জন্য যথেষ্ট প্রশ্রয় নিজের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। সহজাত উদারতা ও দাক্ষিণ্যবুদ্ধির জন্যই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। এটা অন্যায়ের সমর্থন নয়, অন্যায়ের নিরাকরণের রাস্তা খুলে রাখার একটা উপায় মাত্র। দুর্বলতা নয়, পরন্তু পরম সহনশীলতায় ও বাৎসল্যে অনিষ্ট-সম্ভাবনায় ধার খুইয়ে দেয়া। ভৎর্সনার দ্বারা যা পারা যায় না, ক্ষমতার দ্বারা তা অনেক সময় নিষ্পন্ন করা যায়।

কবির পিতামহজনোচিত এই উদারতা পরিণামে ফলদায়ক হয়েছিল। কল্লোলের লেখকেরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তীকালে অপসংস্কৃতির রাস্তা পরিহার করেন এবং কবির উপদেশ শিরোধার্য করে সুস্থতার আদর্শকেই জীবনে বরণ করে নেন। অন্তত তাঁদের বেশীরভাগই যে এটা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

প্রবন্ধকার নারায়ণ চৌধুরীর 'সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পশ্চিমবঙ্গ' থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি ছাপা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ-র রবীন্দ্র সংখ্যায় (বর্ষ ১১ ॥ ৪৮-৪৫ যুগ্ম সংখ্যা / ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ ৯ মে ১৯৭৮। পৃঃ ৯৫৪-৯৫৬ এবং ১০০৪)। সত্তরের দশকে তৎকালীন কংগ্রেস শাসকের জারিকৃত জরুরী অবস্থার সময় দেশে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে গিয়েছিল। সরকারই সাংস্কৃতিক অবরোধ হিসেবে এসবের যোগান দিয়েছিলেন। জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই অপসংস্কৃতি হটানোর জন্য সুস্থ সংস্কৃতি সৃজনের ডাক দেয়া হয়। সরকার এর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র ঐতিহ্য এই সময় অপসংস্কৃতি রোধের বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। [সম্পাদক]

টীকা-টিপ্পনী :

১. চিত্রা কাব্যটির রচনাকাল : ১২৯৯ চৈত্র—১৩০২ ফাল্গুন। এই কাব্যের দীর্ঘ কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' লেখা হয়েছিল রামপুর বোয়ালিয়ায়, ২৩ ফাল্গুন ১৩০০।

২. সাহিত্যের নবত্ব / রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

৩. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির চিঠির অংশবিশেষ।

অজিত মণ্ডল

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা, বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ

মানবসভ্যতা ত বটেই, শিক্ষারও প্রথম সূত্র ভাষা। ভাষা শিক্ষাকে স্বচ্ছন্দ গতি দেয়, সর্বতোমুখী করে। জীবন-জগৎ সম্পর্কে সঠিক ও সত্য উপলব্ধির মাধ্যম ভাষা। তাই, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা অসাধারণ, তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উৎকর্ষ লাভ করেছে।[১]

মাতৃভাষাই শিক্ষার যথার্থ বাহন বা মাধ্যম—একথা সর্বদেশে সর্বকালে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলেও দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনে থাকার পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কোন জনকল্যাণকামী অর্থনীতি যেমন গড়ে ওঠে না, তেমনি থাকতে পারে না এব স্বাধীন শিক্ষানীতি। ভারতবর্ষের মত বহু ভাষাভাষ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের পক্ষে একথা ত আরও সার্থকভাবে প্রযোজ্য, ফলে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে বহুধা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং এর অনস্বীকার্য কার্যকারিতা দেশবিদেশের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি—প্রাথমিকস্তরে ইংরেজিভাষা তুলে দেয়া এবং উচ্চতর শিক্ষায় ইংরেজিকে ঐচ্ছিক করার বিরুদ্ধে ও সপক্ষে পশ্চিমবাংলার মনীষী ও শিক্ষাবিদগণ স্পষ্ট দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। বিরুদ্ধবাদীরা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা শিক্ষার পক্ষে এবং উচ্চতর শিক্ষায় ইংরেজিকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতিকে সমর্থন করে মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষার বাহন করার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন অনেকেই। বস্তুত উভয়পক্ষের যুক্তি ও উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথকে পাশে রেখেই উচ্চারিত হয়েছে। এখন শিক্ষার বাহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হওয়ায়

আমরা তাঁর কথাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

দিগন্তপ্রসারী রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর শিক্ষাভাবনা। এ বিষয়ে তিনি নানা প্রবন্ধে কেবল তত্ত্বালোচনা করেই শেষ করেননি, তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে এর পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন। ফলে, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে জীবনব্যাপী কর্মসাধনায় রূপায়িত করার চেষ্টাও আমরা দেখেছি। তিনি যে কালে জন্মেছিলেন, তখন বিদেশী পদানত, লাঞ্ছিত ও শোষিত ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের ওপর শত শত বছরের শিক্ষাহীনতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার জগদ্দল পাষাণের মত দেশের বুকে বিরাজ করছিল। জড়তা এবং তম-প্রবৃত্তি আমাদের এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও কোন চেতনা ও অনুভূতি ছিল না। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-চেতনা, পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির জীবনকাঠির স্পর্শে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের নিদ্রাভঙ্গ হল। ভারতীয়রা বহুদিন ধরে সঞ্চিত শিক্ষাহীনতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখল। সাম্রাজ্যবাদী অর্থ নৈতিক শোষণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে উদ্দীপিত করল। এর আগে কোন জাতীয় নেতৃত্ব যেমন এ দেশে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি শোষণ উৎপীড়ন সত্ত্বেও ইংরেজদের মত কোন বিদেশী শাসক ও তাদের সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও প্রগতি ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন গড়ে তুলতে সাহায্য করেনি।

তৎকালীন বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় আকৃষ্ট নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বর্তমান দিনের মতই দুটো স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়। একদল যাঁরা মুগ্ধ ভ্রমরের মত প্রতীচ্যের সবকিছুকে উৎকট অনুকরণের নির্লজ্জ প্রীতিকে প্রকাশ করতে এবং স্বদেশ-চিন্তা ও জাতীয় ভাবনার বিরুদ্ধতায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করল না, তেমনি এর পাশাপাশি আর একদল পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষকে দেখা গেল যাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে স্নাত হয়েও নিজেদের লুপ্ত গৌরব ও ঐতিহ্যকে ফিরে পাওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার। সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা তাঁর শিলাইদহ পতিসর প্রভৃতি জমিদারী এলাকায় এবং শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত ছিল খুবই সুস্পষ্ট। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর-পর্যন্ত মাতৃভাষার

মাধ্যমে তিনি শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মৌলিক চিন্তার বিকাশ ছাড়া কোন দেশ কোন জাতি কখনই বড় হতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের অবসান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও আমাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান মাতৃভাষার ওপর নির্ভর করতে না পারায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। কেননা, রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, সাঙ্গীকরণ ছাড়া কোন বিদ্যাই যথার্থ মানুষকে নতুন কিছুর প্রেরণা দিতে পারে না, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমাদের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ।[২] এছাড়া, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের যে আনন্দ তা শিক্ষা-দানের প্রক্রিয়াকেও সার্থক করে, শিক্ষার্থীর চিন্তার ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেয়। শৈশবে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের মাধ্যমে তার চিন্তা মনন প্রেরণা প্রতিভা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সংগঠিত হয়। শিশুরা যে ভাষায় হাসে কাঁদে স্বপ্ন দেখে সেই মাতৃভাষাই তার শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম সহজ উপায়। আনন্দহীন শিক্ষার্জনের কুফল কেবল শুষ্ক মুখস্থ বিদ্যায়, তা প্রাণে সাড়া জাগায় না। কতকগুলি পরীক্ষায় পাস করে ডিগ্রী লাভ করাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। অথচ আমাদের দেশে এই ভয়ানক ভুল শিক্ষানীতিটাই চালু আছে। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষাবিধিকে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন : সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণ শক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্য রকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই ?[৩]

সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্যার একমাত্র সমাধান মাতৃভাষায় নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দান। ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন : শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে,

অর্থ পেলে ; তারাই হল এনলাইটেন্ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে সারা দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেদিন থেকে জলকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংসবাদ্য মন্ত্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা-সুফলা, টানাপাখা শীতলা ; সেইখানেই মাথা তুলল আরোগ্য নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয়নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।[৪]

নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সাক্ষর করার জন্য এবং তাদের নিম্নতম প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একমাত্র মাতৃভাষাকে মাধ্যম করাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার অন্যতম দিক। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে নিচু তলার দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার কথা ভেবেছেন। শিলাইদহে ও পতিসরে থাকাকালীন তাঁর জমিদারী এলাকায় বহু স্কুল ও গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপন করে সাধারণের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছিলেন। কবির এই জনশিক্ষ প্রসারের উদ্যোগ সম্পর্কে পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন 'রবীন্দ্রায়ণ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে। এই সমস্ত স্কুলে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের নির্দেশ ছিল। শুধু তাই নয়, জনশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের শ্রমবৃত্তিমূলক শিক্ষা ও আর্থিক পুর্ণগঠনের প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই জনশিক্ষাদানের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের যোগকে ঘনিষ্ঠ করেছিল। সে যুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা, আভিজাত্য, কৌলিন্যের উচ্চমিনার থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন অতিসাধারণ দরিদ্র নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষের মধ্যে এবং অকৃত্রিম মমত্ববোধ থেকেই তাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তাই নিজে 'ভাগ্যমন্তের ছেলে' হয়েও অনায়াসে তিনি বলতে পারেন : ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরিবের ছেলেকে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন ?[৫] এখানে প্রাসঙ্গিক একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঠাকুরবাড়িতে ইংরেজি চর্চার পাশাপাশি মাতৃভাষা চর্চার গভীর গুরুত্বদান করা হত। রবীন্দ্রনাথও প্রায় বারো বছর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করেছেন।

বস্তুত, বর্তমান দিনেও রবীন্দ্রনাথের ঐ বক্রোক্তির তাৎপর্য বাস্তবতা সমভাবেই ক্রিয়াশীল আছে। পরাধীন ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলে যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে আজও সেই অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। গৃহীত শিক্ষানীতিই এর জন্য দায়ী। শিক্ষার বাহন, পরীক্ষা রীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রভৃতিতে সেই পুরনো বিদেশী শাসকের প্রবর্তিত শিক্ষানীতিই আজো অনুসৃত হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের উনচল্লিশ বছরেও এর পরিবর্তন ঘটেনি। পৃথিবীর কোন সভ্য স্বাধীন দেশ একথা ভাবতেই পারে না। অথচ এই ভারতবর্ষেই বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, জহরলাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদগণ মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। কেননা, শিক্ষাবিস্তারের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের আগ্রহ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।

তবে মনীষীদের এই সঠিক অভ্রান্ত অভিমত সত্ত্বেও পরাধীন দেশে বিদেশী শাসনব্যবস্থায় কোন জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষও তার প্রতিবেশী স্বাধীন অধিকাংশ দেশ যে অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো গ্রহণ করেছে, তাতে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের সবচেয়ে বড বাধা এবং প্রায় অসম্ভব এইসব দেশের রাষ্ট্রচরিত্র। আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুলের পরিকল্পনা তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি হিসেবে যখন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা করলেন, তখন এই শিক্ষানীতির সারবত্তা যেমন একদিকে প্রমাণিত হল, অপরদিকে এর সার্থকতা সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করল। কিন্তু একথাও কারো না মেনে উপায় নেই এই সরকার শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, একে দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারি প্রশাসনস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। এই মহতী প্রচেষ্টায় সরকারের সঙ্গে প্রত্যেক দেশপ্রেমীর সহযোগিতা করা কর্তব্য। আর এও সত্য, বর্তমান সরকার স্কুল কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষাকে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কথা কখনও বলেনি। সম্ভবও নয় এই

সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোয়। আদর্শ ও আদর্শের বাস্তবায়ন ত এক নয়। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীতে তাঁর আদর্শ শিক্ষানীতিকে যথাযথ রূপায়ণ করতে পারেন নি। বামফ্রন্ট সরকারও প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা রাখলেও 'মাধ্যমিক স্তর থেকে মাতৃভাষার অতিরিক্ত প্রয়োজনের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার সিদ্ধান্ত'[৬] বহাল রেখেছেন। যুগচেতনা, পরিস্থিতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার এই শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষার সপক্ষে ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী কমিশনের বক্তব্য অনুসরণ করা যায়। কমিশনের অভিমত: আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতিকে আমরা দেশের সাধারণ অগ্রগতির পক্ষে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করি। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর উদ্দেশ্যে জোর গলায় বলতে চাই যে এর মানে ইংরেজি বা অন্য কোন বিশ্বজনীন ভাষার পথরোধ করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের শিক্ষা যত বেশি কার্যকর এবং ব্যবহারোপযোগী হবে, তত বেশি আমরা এসব ভাষা থেকে লাভবান হতে পারব।[৭]

যে দেশ স্বাধীনতা লাভের পর বছরের হিসেবে যৌবন উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেখানে শতকরা সত্তরজন মানুষ এখনও নিরক্ষর। এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় দেশের ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার মধ্যে আনার যে কথা বলা হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রতিশ্রুতির পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে তার অগ্রগতির খতিয়ানে আশার আলো খুবই স্পষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে এ রাজ্যের সাফল্য প্রমাণিত হয়। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ ক্রমশ এটা উপলব্ধি করছেন, সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক করার ভূমিকায় রাজ্যের বর্তমান সরকার সক্ষম।

১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত সরকারী ভাষা ও শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে জোর বিতর্কের সঞ্চার করে। বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাধ্যম মাতৃভাষায় শিক্ষা নিয়ে। কংগ্রেস সরকারের আমলে গঠিত ও বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুর্ণগঠিত বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ হিমাংশু-বিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ একটি কমিটি দীর্ঘ

আড়াই বছর পরিশ্রমে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে এই প্রাথমিক শিক্ষানীতি কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। এই কমিটির প্রতিবেদনে ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত মুদালিয়র, কোঠারি প্রভৃতি কমিশন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সুপারিশ সমূহও গ্রহণ করা হয়েছে

প্রাথমিক শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় পাঠদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন উন্নতশীল এবং স্বাধীনদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই স্তরে সাধারণত মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষা শেখানো হয় না। বৃটিশ শাসনামলে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, জনস্বার্থে তার পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। সে সময় থেকে রাজ্যে ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা চলে আসছে। শিক্ষাকে যদি বস্তারূপ শক্তি অর্জনের উপায় হিসেবে দেখা যায়, যদি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা ভাবা হয়, তাহলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আর এ কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতিশয় আগ্রহশীল। আর এদিকে তাকিয়েই সরকার যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা ত গ্রহণ করেছেন, তার মূলকথা হলো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি শিশুভাষা হিসেবে কেবল মাতৃভাষা পড়বে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার সাথে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আবশ্যিকভাবে ইংরেজী। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না পড়ানোর সিদ্ধান্তে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ তেতে উঠলেন, যাঁরা ইংরেজী বুলির দৌলতে চাকুরি জুটিয়েছেন, এদেশে বাস করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করছেন এবং সমাজের মধ্যে দুটি শ্রেণী তৈরী করে ফেলেছেন, তাঁরা সরকারের এই ভাষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কিন্তু সরকারের ভাষানীতির সমর্থনেও একদল রাস্তায় নামলেন। জোর তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাকে নিয়ে আন্দোলন হয়ে গেল। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ ৬ ১৯৮১, দেশ ৮ কার্তিক ১৩৮৭ সালে ভাষানীতির বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লেখা হলো। আনন্দবাজার পত্রিকায় ড নীহার রঞ্জন রায় সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখলেন। ১৯৮১ সালের ৮মে সেটি 'সপ্তাহ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হলো। দেশ পত্রিকায় সমালোচনা করে নিবন্ধ লিখলেন সুমন

বসু [১৩৮৭, ২২ কার্তিক]। তবু সম্পাদকীয় কিংবা প্রবন্ধ লিখেই প্রতিবাদীরা ক্ষান্ত হননি, তাদের প্রতিবাদকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য 'শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি' গঠিত হলো। কমিটি গঠনের উদ্যোগমঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা ছিল এস-ইউ-সির। পরে এর সংগে কংগ্রেস যোগ দেয়। ১৯৮০ সালের ২১ ডিসেম্বর ভাষানীতির বিরুদ্ধে মহাবোধি সোসাইটি হলে এই কমিটি একটি সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নীহার রঞ্জন রায়। সরকারের ভাষা ও শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়। এরপর কমিটির পক্ষ থেকে ৭৫ হাজার মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৫ জানুয়ারি এদের কর্মসূচী অনুযায়ী এসপ্লানেড ইস্টে অবস্থান সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন: ড. সুকুমার সেন, ড নীহার রঞ্জন রায়, ড. প্রতুল গুপ্ত, ড. অরবিন্দ বসু, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ, সাহিত্যিক মনোজ বসু, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সমাবেশে সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, হেডমাস্টারস এসোশিয়েশন এবং বাংলা প্রাইমারী টিচার্স এসোশিয়েশনের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। ৮ জানুয়ারির অবস্থান সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে ৯মে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভাষা সংহারকদের প্রতি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। ২ ফেব্রুয়ারি 'শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটির' পক্ষ থেকে মহাকরণ অভিযান করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি এসপ্লানেডে আইন অমান্য করা হয়।

একদিকে যেমন ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, তেমনি সপক্ষে বিভিন্ন সভা সমাবেশ, আলোচনাচক্র, আবেদনপত্র প্রচার ও কনভেনশন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখাও চলতে থাকে। সরকারের এই ভাষানীতির সপক্ষে প্রায় চার শতাধিক শিল্পী, বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। এতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, মন্মথ রায়, তিমিরবরণ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ মিত্র, ড. রমেন্দ্র পোদ্দার, ড. জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ড মহাদেব প্রসাদ সাহা, ড. ক্ষুদিরাম দাস, নারায়ণ চৌধুরী, অরুণ মিত্র, শংখ ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, উৎপল দত্ত, ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, চিন্মোহন সেহানবিশ, নেপাল মজুমদার, অখিল নিয়োগী, সলিল

চৌধুরী, ড. পবিত্র সরকার, অনুপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ড ভূপেন হাজারিকা, নবজাতক প্রকাশনের প্রকাশক মজহারুল ইসলাম প্রমুখ। এদের পক্ষ থেকে ১৯৮১ সালের ৭ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, প্রগ্রেসিভ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এবং ছাত্রব্লকের আহ্বানে একটি কনভেনশন হয়। এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘও এতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন [সম্পাদক]।

উদ্ধৃতি সূত্র

১ বাংলা ভাষা পরিচয় পৃঃ ৪৪৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১৪ খণ্ড / পঃ বঃ সরকার।

২. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, পৃঃ ৬৯৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প. ব. সরকার।

৩. শিক্ষারবাহন, পৃঃ ৬৪৩, রবীন্দ্র রচনাবলী. জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প. ব. সরকার।

৪. শিক্ষার বিকিরণ, পৃঃ ৬৯১, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প. ব. সরকার।

৫. শিক্ষার বাহন, পৃঃ ৬৪৪, ঐ।

৬ শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান : কয়েকজন শিক্ষাবিদের অভিমত, পশ্চিমবঙ্গ, ২০, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১,

৭. ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং (ভারত সরকার) কর্তৃক প্রকাশিত এডুকেশন ডেভেল্যাপমেণ্ট রিপোর্ট অব্ দ্য 'এডুকেশন কমিশন ১৯৬৪-৬৬' থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৫ , অনুচ্ছেদ ১৫৭।

অলখ মুখোপাধ্যায়

শিশুশিক্ষা ও 'সহজপাঠ' বর্জন-বিতর্ক

আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পরিবর্তনশীলতা। চিন্তাধারা, জীবন ধারণের কৌশল সবই দ্রুত পরিবর্তনশীল। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা এবং প্রবণতাই আধুনিক মনোধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আধুনিক শিক্ষাও অনেকাংশে প্রাচান ভাবধারা ত্যাগ করে বর্তমান জীবনাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষাবিদগণ বলেন: শিশুর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সঞ্চারের প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা। এর সঙ্গে অভিব্যক্তি বাদের ধারণা (Theory of evolution) যুক্ত হয়ে এই তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে। জীবজগতে নিরন্তর এক অভিযোজনের প্রক্রিয়া চলছে। পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে যাদের অভিযোজন সম্ভব হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই টিকে আছে। তাই বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদরা বলেন যে, শিক্ষাও এক ধরণের অভিযোজন প্রক্রিয়া।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যও গিয়েছে বদলে। জোর দেয়া হচ্ছে মূলত ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ওপর। ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের চাহিদা উভয়েই পাচ্ছে সমান গুরুত্ব। জন ডিউই বলেছেন: শিক্ষা হ'ল 'Process of remarking experiences, giving it a more socialized value through increased individual experience.'

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার প্রধান তিনটি উপাদানের কথা বলেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠক্রম। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্বন্ধীয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, তাই আমরা আলোচনা করব পাঠক্রম নিয়ে।

প্রাচীন ভাবধারা অনুযায়ী সার্থক শিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীকে মানুষের কৃষ্টিমূলক অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াতেই হবে পাঠক্রমের সার্থকতা। কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যানে পাঠক্রমকে

গতিধর্মী বৈশিষ্ট্য (Dynamic characteristic) দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। এমন কি আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এও বলে থাকেন যে শুধুমাত্র কতকগুলো সংস্কৃতিমূলক বিষয় পড়লেই চলবে না[১]। মনরো বলেছেন : 'The curriculam must persent to the child in idealized from, present life, present social activities, present ethical aspirations, present appreciation of the cultural value of the past.[২] শিক্ষাবিদ্‌ আরও বলেন : উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠক্রমের যে জীবনীশক্তি ছিল বিংশ শতাব্দীতে তার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।[৩]

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিশুশিক্ষা। শিশুকেন্দ্রিক এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুশিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শ দিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরাও এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' বর্জন-বিতর্ক আলোচনা করব।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা দেখতে পাব বাংলা সাহিত্যে এবং অবশ্যই পাঠক্রমে প্রথম সার্থক শিশুপাঠ্যের প্রণয়ন ঘটান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বর্ণপরিচয়ের' প্রকাশ ঘটে প্রথম। বাংলা অক্ষরের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোর পর শিশুকে সাহিত্য জগতে প্রবেশাধিকার দেয়ার দায়িত্বও পালন করেন বিদ্যাসাগর সার্থকতার সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচুর্য-মণ্ডিত সংসারে প্রবেশ করবার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতার বিকাশের বুনিয়াদি শিক্ষা বাংলার শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে এসেছিলো 'বর্ণপরিচয়' থেকে।

বর্ণপরিচয়ের পর বাংলায় সার্থক শিশুপাঠ্য পুস্তক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সহজপাঠের প্রথম প্রকাশ হয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে শিশুমনে 'মিলে'র প্রভাব ও উপযোগিতা অনুভব করে তাঁর শিশুপাঠ্য সহজপাঠে 'মিলে'র প্রাধান্য রাখলেন।[৪] খেলার ছলে বর্ণ শিক্ষার তাগিদে প্রতিটি বর্ণকে নিয়ে আসলেন মিলের মধ্যে। বর্ণ, বাক্যকে শিশুদের উপযোগী ও মনোহারী করে তুলতেই তিনি ছিলেন সচেষ্ট।

শিশুশিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা দীর্ঘদিন

ধরে চলে আসছিল। বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন মহলে নানান ধরণের আলাপ আলোচনার পর বিদেশের মতন এদেশেও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান আধুনিক শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বিশ্লেষক ও পথ প্রদর্শক হয়ে উঠল। সেই মানদণ্ডেই আমরা এখন সহজপাঠকে আলোচনা করব।

এই শিক্ষাবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি হল, স্বাধীনতা, সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা (Education through activity), ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদান (Individualistic instructions), অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা (creative effort), শৃঙ্খলা, ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, মানবীয় সম্পর্ক এবং মনোবিদ্যার প্রয়োগ। এর মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক এবং মনোবিদ্যার প্রয়োগ এই বৈশিষ্ট্য দুটি প্রত্যক্ষভাবে পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় বলে এদের আমরা আলোচনার বাইরেই রাখছি। অন্য সাতটি বৈশিষ্ট্যর নিরিখে সহজপাঠের উপযোগিতা-অপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং তার প্রয়োজনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের মত উদ্ধাব করা হবে।

ক. **স্বাধীনতা**ঃ শিক্ষাদর্শনের যুক্তি দ্বারা সমর্থিত শিশুশিক্ষায় আবশ্যিক স্বাধীনতা দানের বিষয়টি। শিশুর মানসভূমিতে সুপ্ত থাকা নানান ধরণের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন শিশু পাবে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা। অপ্রকাশিত সৃষ্টিইচ্ছার উদ্দীপনাকে স্বাধীনতাই পারে বাস্তবসম্মত আকার দিতে। শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন: শিশুর মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের চিরন্তন প্রয়াসকে বাইরের শক্তি দিয়ে চেপে রাখা অনুচিত। তাকে দেয়া দরকার নিজধর্মে বিকশিত হয়ে উঠবার পূর্ণ সুযোগ। শিশু শিক্ষার স্বাভাবিক আগ্রহ অনুরাগকে ঘিরে গড়ে উঠবে। কারণ এই আগ্রহ অনুরাগই তাকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করবে, এই স্বাভাবিক মনোধর্মের গতি নির্ণয় বাইরে থেকে করা সম্ভব নয়। এইজন্য তাকে দিতে হবে যথোচিত স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যে বিদ্যালাভ করা যায় তা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। 'এ... অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।'[৫] তিনি অনুভব করেছেন যে অত্যাবশ্যক পাঠের সঙ্গে 'সখের' পুস্তকের। যোগ্য সখের পুস্তকের ওপরই ভার চাপিয়েছেন শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযুক্ত স্থান করে দেয়ার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সহজপাঠের মলাটের ওপর

লেখা একটি মন্তব্য 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পাঠ সমাপনের পরেই সহজপাঠ পঠিতব্য।' অর্থাৎ সহজপাঠ প্রকাশক নিজেই অনুভব করেছিলেন যে 'বর্ণপরিচয়' শিশুশিক্ষার ব্যাপারে যে বুনিয়াদি দায়িত্ব পালন করে সহজপাঠ তা করে না। বরং সহজপাঠ বর্ণপরিচয়ের 'সখের' পুস্তক হিসেবে শিশুমনবিকাশে সমর্থ শিশুমনের অবাধ বিচরণের স্বাধানক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী মনে করেন যে, সহজপাঠ প্রথম শিক্ষার্থীর সহায়ক পাঠ্য হতে পারে, কিন্তু মূল বই নয়। 'কারণ প্রকৃতই সহজপাঠ প্রথম ভাগ দিয়ে শিক্ষার্থীর হাতে খড়ি দেওয়া সম্ভব নয়।'[৬] 'শিশুশিক্ষার ভাষা' প্রবন্ধ সংকলনে 'বর্ণপরিচয় থেকে কিশলয়' প্রবন্ধে ডঃ পবিত্র সরকার বলেন: যাঁরা এটি লক্ষ্য না করে ভাষাশিক্ষা প্রাইমার হিসাবে এ বইটিকে পাঠ্য করেছিলেন তাঁদের চিন্তার মধ্যে যেমন ব্যস্ততাজনিত অসম্পূর্ণতা ছিল, তেমনি ভাষাশিক্ষার প্রাইমার হিসাবে এটিকে তুলে দিয়ে নতুন একটি পাঠ্য প্রণয়নের সঙ্কল্প ঘোষণা করায় যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধ বা পিতৃদ্রোহের সংবর্ত দেখে উত্তেজিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন, তাঁদের চিন্তাও ছিল একই রকমের অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন। অধ্যাপক সরকার 'এটি' বলতে সহজপাঠের মুদ্রণ সংবাদের পৃষ্ঠায় কথিত উপরিউক্ত নির্দেশনামাটিকে বুঝিয়েছেন।

সহজপাঠের স্বাধীনতা শিশুদের কতখানি উপযোগী সে বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন শ্রীসরকার তাঁর উপরিউল্লিখিত প্রবন্ধটিতে: কয়েকটি কবিতায় ('কাল ছিল ডাল খালি', 'দিনে হই একমতো', 'কত দিন ভাবে ফুল')' কল্পনার একটু অতিরিক্ততা ও দূরযাত্রা আছে, শিশু তাঁর সহযাত্রী হয় কি না সন্দেহ। স্বাধীনতার বিষয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ মূলত শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ছাত্রদের কথা ভেবেই লিখেছিলেন। কিন্তু উচ্চ কবিত্ববোধের এবং দর্শনের দ্বারা আপ্লুত পাঠগুলি আধুনিক শিশুদের নগরকেন্দ্রিক মানসিকতায় কতখানি উপযোগী হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ আছে। অথবা এই ধরণের কবিতা শিশুদের বোঝানো'র ব্যাপারেও আধুনিক শিক্ষকরা (বুনিয়াদি শ্রেণীর) কতখানি দায়িত্বশীল ও পারঙ্গম সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

খ. সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা: এই ধরণের শিশুশিক্ষা প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত। শিশুকে নিষ্ক্রিয় রেখে আধুনিক শিশুশিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। হাতে কলমে কাজ করা এবং তার জন্য দরকার 'technical knowledge'-

এর। শিক্ষা কমিশনের ১৯৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ জন শিশুছাত্র প্রাথমিক শ্রেণীতে প্রবেশ করলে ৬৩ জন পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়।[৭] এছাড়া রয়েছে আরো হাজারো শিশু, যারা উচ্চশিক্ষা দূরের কথা যুক্তি বোধগম্য বিদ্যাও লাভ করতে পারে না। স্বভাবতই এমন একটা পরিবেশে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই তত্ত্ববিদ্যা ছেড়ে কর্মবিদ্যার প্রতি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাটুকু পাবার পর একটা বিরাট শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদ্যার আওতার বাইরে গিয়ে হাতে কলমের শিক্ষার প্রতি আসক্ত হয়। অতএব আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশুরা ভবিষ্যতের প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়, আজ সমস্ত পৃথিবীতেই তাই সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাদান রীতিমতন গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তরে' অমিতাভ চৌধুরী বলেন যে, শুধুমাত্র সৌন্দর্যবোধ বা বর্ণপরিচয়ই নয়, শিশুকাল থেকে একটা বিজ্ঞানী মন গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থের সাহায্যে। বলতে বাধ্য হচ্ছি শ্রীচৌধুরীর এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় জাগছে। দৃশ্যবস্তুর বর্ণনাময় কাব্যের সঙ্গেই বিজ্ঞান এসেছে এখানে—শ্রীচৌধুরী বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিত্বময় ভাষা ও পাঠ, যেখানে প্রকৃতির বর্ণনাই মুখ্য, সেখানে বিজ্ঞানের আবির্ভাব কতখানি যুক্তি-সঙ্গত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ড শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, দেশেও শিশুদের বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা মেটাবার নতুন নতুন উৎসাহ, দাবি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের পরিবর্তন এ দাবি জোরদার করছে। সহজপাঠে যে এই যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিচয় অনুপস্থিত, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।

সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার এ ছাড়াও রয়েছে কয়েকটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। যেমন এই শিক্ষা হবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কোনো 'বর্ণকেন্দ্রিক'। এবং, দ্বিতীয়ত এই বিশেষ কর্মটি হবে কিছু উৎপাদনভিত্তিক। যে কারণে একে বলা হয় উৎপাদন-ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্ব (Productive Principle)। তৃতীয়ত শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা-ভিত্তিক কিছু কর্ম নির্বাচন করতে হবে। চতুর্থত এই শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা হবে উপজাত ফল (by product) মাত্র। পঞ্চমত এতে শিশু যেন পরিপূর্ণ আনন্দময় পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু সহজপাঠ-এর কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই আধুনিক শিশুকে উৎসাহিত

করে না। সোমনাথ দে বলেছেন: সহজপাঠের মধ্যে দলগত সক্রিয়তার কোনো স্থান নেই[৮]। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করার যে প্রচলন আছে এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ত্বের যে গুরুত্ব এই ইন্দ্রিয় ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল, রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ তার থেকে দূরে। অথবা এমন কথাও মনে করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠে এই উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেন নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব এই সমষ্টিগত উদ্যোগকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রীসোমনাথ দে তার প্রবন্ধে বলেছেন, সহজপাঠ প্রসঙ্গে 'এখানে সমষ্টিগত কর্ম, উদ্যোগ, যৌথ প্রচেষ্টা পরিচালন ও নেতৃত্ব গঠনের যে পরিকল্পনাগুলি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বলে থাকেন, তার কোন উপাদান নেই'।

সহজপাঠ মূলত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী চিন্তা ও মননের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু, প্রশ্ন এই যে, চিন্তা ও মননের তত্ত্বের ওপরে নির্ভরশীল যে বুনিয়াদি শিক্ষা আধুনিক শিশু পাবে, ভবিষ্যতে বাস্তব জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাজগতে প্রবেশ করবে সেখানে কি তার মননের বুনিয়াদি ভিত্তিটা অসংলগ্ন হয়ে উঠবে না? সেখানে সহজপাঠের সাহিত্যধর্মী সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা তাদের কতখানি উপকারে আসবে বলা শক্ত। 'সহজপাঠ' সেই সমস্ত শিশুদের হয়তো উপযুক্ত যাদের পারিবারিক কৃষ্টি উচ্চতর, অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো এবং ভবিষ্যতে সাহিত্যধর্মী ও প্রভাব-আশ্রিত শিক্ষালাভে সমর্থ। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের পক্ষে সহজপাঠ সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা দিতে অক্ষম।

গ শৃঙ্খলা: গতানুগতিক শৃঙ্খলার ধারণাকে পরিবর্তিত করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মুক্তশৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুক্ত-শৃঙ্খলা বলতে আমরা বুঝি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে সংহতি আনে, তাই হ'ল শৃঙ্খলা (Discipline)। উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য: 'ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে'।

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। শিশুশিক্ষার মূল নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিশুকে কতকগুলো বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক ভিত্তি থেকেই ভাষা, শব্দ ও বাক্য চয়নে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা। সেই নিয়মও হওয়া উচিত বিজ্ঞজন সমর্থিত

প্রচলিত ব্যাকরণের ধারা অনুযায়ী। প্রাথমিক অবস্থায় এই সময়োপযোগী নিয়মগুলো আত্মস্থ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে স্বাধীনরচনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না। যে কোন রচনাকেই বলিষ্ঠ করে তুলতে হলে তার Form-কে করা উচিত বিজ্ঞান-সম্মত। আর Form তখনই বিজ্ঞানসম্মত হবে, যখন তা হবে ব্যাকরণসম্মত।

এখন এই ব্যাকরণগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ কতখানি ভূমিকা পালন করছে সেই দিকে লক্ষ্য করা যাক্। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের সময়ের সহজপাঠ রচনাকাল অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ব্যাকরণ-এর সঙ্গে আজকের আশির দশকের ব্যাকরণের অনেক প্রভেদ ঘটে গেছে। অনেক নতুন শব্দ শুরু হয়েছে বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে, অনেক পুরানো শব্দ ভেঙে নতুন আকার নিয়েছে। শিশুরাও এর বাইরে নয়।

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়[৯] সহজপাঠের বানান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সশ্রদ্ধভাবে সহজপাঠের বানানের অসংগতি ও বৈষম্যগুলি উল্লেখ করেছেন আজকের শিশুদের বানান শেখা বা শেখানোর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে : সহজপাঠ প্রথম ভাগে খুসি (পৃ-৫৪) আর খুশী (পৃ-৩৬), ডিঙি (পৃ-৩০) আর ডিঙ্গি (পৃ-৯) একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমভাগে তৈরী (পৃ-৪২) কিন্তু দ্বিতীয়ভাগে তৈরি (পৃ-১৪, ৩১, ৩৪, ৪৪)। দ্বিতীয়ভাগে ধুলো (পৃ-২৩) প্রথমভাগে ধূলো (পৃ-৩৬)। প্রথমভাগে তিলখেত, তিসিখেত (পৃ-৩১) অথচ দ্বিতীয়ভাগে সর্বত্র ক্ষেত (পৃ-১২, ৪২)। এছাড়াও প্রথমভাগের ৪৬ পৃষ্ঠায় শাড়ী আর দ্বিতীয়ভাগে ২৮ ও ৫৬ পৃষ্ঠায় শাড়ি। দ্বিতীয় ভাগে ২৮ পৃষ্ঠায় শালিক, আবার ১৯ পৃষ্ঠায় শালিখ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে রবীন্দ্রনাথ 'হলো' বোঝাতে 'হ'ল', 'হোতো' বোঝাতে 'হ'তো' এবং নিয়ো, এসো প্রভৃতি বানান ব্যবহার করেন সহজপাঠে, অথচ অন্য জায়গায় (ছেলেবেলা) তিনি লিখেছেন উর্দ্ধকমা এবং 'ও'-কার বর্জন করে। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রয়োজন বোধ করেছেন বানানের uniformity-র।[১০]

একই প্রসঙ্গে ডঃ পবিত্র সরকার উল্লেখ করেন[১১] সহজপাঠে একাধিক বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি। শ্রীমতী অনিলা দেবীও বলেছেন একই কথা এবং এও বলেন যে বর্ণপরিচয়ের পর স্বরচিহ্নগুলির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় স্থাপনের জন্য অনিবার্য যে কয়েকটি পাঠপর্বের দরকার ছিলো, সহজপাঠে তা খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।[১২]

শ্রীসরকার তাঁর বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ 'য়', 'ৎ', 'ড়', 'ঢ়', 'ং', 'ঃ', 'ঁ' ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে 'ক্ষ'-কে বিদ্যাসাগর যুক্তব্যঞ্জন বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ একথা সমর্থন করেন, এবং যুক্তিও দেখান এই প্রসঙ্গে, কিন্তু সহজপাঠে 'ক্ষ' স্থান পেয়েছে একক বর্ণের তালিকায়। শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের মতন তিনিও সহজপাঠ বানান সংক্রান্ত অসংগতির কথা উল্লেখ করেন। যেমন, 'ধোঁয়া' (পৃ-১০) ধোঁওয়া (পৃ-৫৫)। 'গাইবে' অর্থে 'গাবে', 'কাঁসি = কাঁসর' অর্থে 'কাঁশি', এবং 'ফোঁড়া' অর্থে ফোঁড়া র বানান তাঁকে বিচলিত করেছে। শ্রীসরকার বলেন : 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, শিশুকে বাংলা বাক্যের যেটা স্বাভাবিক (unmarked) ক্রম—sov অর্থাৎ subject-object-verb—সেটাই আগে শেখানো ভালো, যদি না অর্থবৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যতিক্রমের একান্ত দরকার হয়।' তিনি উল্লেখ করেন সহজপাঠের 'পাঁচটি বাক্যে inversion ঘটেছে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কর্তা, কর্ম বা অধিকরণ পদের আগে চলে আসছে।'

শিশুর Linguistic sense-কে বলিষ্ঠ করে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার যে শক্ত বাঁধুনির ব্যাকরণ অনুসরণ দরকার, তার অভাব সহজপাঠে প্রবল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীপবিত্র সরকার সহজপাঠের অলঙ্করণগুলিকে নেহাৎই অলঙ্করণই বলেছেন, শিশুশিক্ষার কোনো বিশেষ দায়িত্ব তাদের নেই। পাঠের সঙ্গে তাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রায় নেই বললেই চলে।

অতএব শৃঙ্খলার দিক থেকে সহজপাঠ আধুনিক শিশুর মনন ও বিকাশের কতখানি উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে সহজপাঠ ঠিক প্রয়োজনমতন সচেতন হয়ে উঠতে পারে নি, অসংগতির উপস্থিতি প্রকট।

ঘ. সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ : আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব এর গুরুত্বকে মর্যাদা দেয়। রবীন্দ্রনাথ সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের মূল নীতিকে আঁকড়েই (Creative self-expression) তাঁর শিক্ষানীতি ও সহজপাঠের প্রণয়ন করেন। সহজপাঠে শিশুদের সৃজনীক্ষমতার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা আছে। সাহিত্যধর্মিতা এবং কবিত্ব শক্তির প্রভাব শিশুর মনে রঙীন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে, যেখান থেকে তার স্বাধীন রচনার উৎসাহ আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রকৃতির যে কাব্যময় বর্ণনা সহজপাঠে আছে, শিশু তাতে আপ্লুত হয়। শিশুর মানসিকতার সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক আত্মিক যোগাযোগের সেতু হয়ে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ তাঁর

অনুপম কবিতাগুলির মাধ্যমে। প্রকৃতি থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়েছে এবং তা থেকে শিশুমনে এক সর্বজনীন অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। সেই অনুভূতিই দেয় তাকে সৃজনের উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথ বলেন: Children have their active sub-conscious mind which like a tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them atmosphere is a great deal more important than rules and method, buildings, appliances, class teaching and text books.[১৩] প্রসঙ্গত অমিতাভ চৌধুরী বলেন যে, সহজপাঠে রবীন্দ্রনাথ অ-কার এ-কার শেখাতে গিয়ে আমাদের চিনিয়ে দেন বাংলা প্রকৃতিকে। তিনি বলেন: সহজপাঠ আসলে 'সচিত্র বঙ্গপরিচয়।'[১৪] কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব গুরুত্ব দেয় শিশুর ব্যবহারিক বা একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিবেশের বর্ণনা ও প্রভাবের ওপর, যে বক্তব্য আমরা জানতে পারি শ্রীপবিত্র সরকারের বক্তব্য থেকে। তিনি সহজপাঠের content-গত সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেন। 'এতে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক চিত্র বা সৌন্দর্যের বর্ণনায় যতটা মনোযোগী, শিশুদের প্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ (খেলাধুলা, পশুপাখি ইত্যাদি) ততটা উদ্ধার করেননি।' অথবা 'সহজপাঠের প্রাসঙ্গিকতায়' উল্লেখিত বক্তব্য 'সহজপাঠের ভাষা ও বিষয়বস্তুকে বিচার করলে দেখা যাবে অনেকক্ষেত্রেই এদের অন্তর্গত বাক্য, শব্দ, শব্দগুচ্ছ, অর্থানুষঙ্গ অধিকাংশ প্রথম শিক্ষার্থী শিশুর প্রাথমিক ব্যবহারিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়' এবং ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তীও তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, 'তমিজ মিঞার গরুর গাড়িতে যে খোকা রোজ সকালে শহরে আসত, তার মধ্যে আজ সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির আরো স্পষ্ট প্রতিফলনের আকাঙ্খা জেগেছে।' চাকর দাসী প্রভৃতি কথাগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধেও সচেতন বক্তব্য রেখেছেন। শিশুর জীবনে সম্ভাবনার বিকাশের প্রয়োজনে সামাজিক পরিবেশই মুখ্য। যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষা, ছন্দ, কল্পনা, ভাব, পরিবেশ ও মানবসংশ্রব সুপরিকল্পিতভাবে বিধৃত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সহজপাঠের যুগের সঙ্গে আজকের যুগের বিরাট পার্থক্য ঘটে গেছে। পরিবর্তন ঘটেছে শিশু মানসিকতারও। সামাজিক পরিবেশের আধুনিকতম বিবরণ আজ দরকার, টিভি, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতিতে পুষ্ট এবং ম্যাচিওর আধুনিক শিশুর মানসিক বিকাশের প্রয়োজনে। 'দাদা কেনে পাকা আতা সাত আনা দিয়ে'—কিন্তু 'আনার' concept

আজকের শিশুর কাছে অবাস্তব, অমিতাভ চৌধুরী কটাক্ষ করলেও। ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীও মনে করেন যে, পরিবর্তমান পরিবেশে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনও হওয়া উচিৎ। হীরেণ দাশগুপ্ত 'প্রাথমিক পাঠ্যসূচী ও সহজপাঠ' নামক পুস্তিকায় সহজপাঠের চরিত্রগুলির নামের বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। মৈনি, কৌল, বাংলা, পল্লু প্রভৃতি এবং স্থানের নাম পাংশুপুর, উল্লাপাড়া প্রভৃতি। তিনি বলেন যে, সহজপাঠে বর্ণিত পারিপার্শ্বিক চিত্রের সঙ্গে আজকের পরিবেশের বিস্তর পার্থক্য। তিনি বলেন, '...কিন্তু যে কথা আজ বলা দরকার সেটি আর একটু অন্যরকম। ওরা সমাজবদ্ধ নয়, ওরা সমাজের অংশই শুধু নয়, ওদেরই শ্রমের উপর সমস্ত সমাজ দাঁড়িয়ে আছে...' কিন্তু সহজপাঠে সে ধরণের কোনো শিক্ষা দেয়া নেই। তাঁতি কুমার জেলে প্রমুখের সহজপাঠে অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেন। শ্রীদাশগুপ্ত ব্রাত্যশ্রেণীর সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের শিশুদের কাছেও এটি সামাজিকভাবে কতখানি আদরনীয় হবে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক পরিবেশের মানদণ্ডের বিচারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে সহজপাঠ প্রচীনদর্শী হয়ে পড়েছে। হয়তো স্বাভাবিক অর্থে এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও সৃজন ক্ষমতা পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, তবে অন্য অর্থে তা হবে কেবলই কল্পনার রঙীন জগৎ, বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো মিলই থাকবে না।

ঙ. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা: আমরা অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতার বা (word experience) সম্বন্ধে আলোচনা করব না, করব পাঠক্রমে এর উপযোগিতা নিয়ে। অতীত কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতাকে আধুনিক পাঠক্রমে পাঠপর্বে স্থান দেয়ার ব্যাপারেই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা গুরুত্ব দেন। এছাড়া ঐতিহাসিক বারত্বমূলক ঘটনা এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। একে বলা হয় জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা। এতে কলা, হস্তশিল্প, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানোর প্রাথমিক দায়িত্ব থাকে।

সহজপাঠে এর কোনোটাই নেই। ঐতিহাসিক বিবরণ ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী বলে মনে করেন আধুনিক শিক্ষাবিদগণ। সহজপাঠের মধ্যে সামান্য পরিমাণে অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার (conative) পরিচয় আছে।

চ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদান: প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মগ্রহণ

করে এবং কালক্রমে নিজ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ লাভে সচেষ্ট হয়। তার এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে হ'লে শিক্ষাদান পদ্ধতিকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে হবে। তাই বর্তমানে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাই সর্বত্র।

ব্যক্তি জীবনে উন্নতি সাধন এর মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনে উন্নতি সাধন করে সামাজিক দায়িত্ব পালনে পারঙ্গম ব্যক্তিত্ব তৈরী করা এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির কয়েকটি অসংগতি আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদ সৃষ্টি হবার প্রভূত সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বলে আগে সমাজ পরে ব্যক্তি, এটাই হওয়া উচিৎ জৈবিক ভিত্তি। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব, ব্যক্তির যাবতীয় নিরাপত্তা নির্ভরতা সমাজের জন্যই। তাই শিশুশিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে শিশু সমাজকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, উৎসাহ পায়। দেয়া উচিত ব্যক্তিকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে শিক্ষা—Man as a social individual. না হলে এই শিক্ষা স্বার্থপর করে তোলে, ব্যক্তিজীবনের সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে। সমাজের অতীত সংস্কৃতি ও বর্তমান কৃষ্টির সঙ্গে দরকার শিশুর আত্মিক যোগাযোগ, যাতে সে তার পারিপার্শ্বকে চিনতে পারে, নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সময়োপযোগী ব্যক্তিসত্তায় পরিবর্তিত করতে হবে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা। রস বলেছেন: By individual we have in mind. Ideal not yet attained, the attainment of which is the end not only of education of life অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে এমন কিছুকে দাঁড় করানো হবে, যার পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র সমাজ পরিবেশেই সম্ভব। Hegal বলেছেন: সমাজ জীবন পুষ্ট হ'লে ব্যক্তি জীবনও পুষ্ট হবে। কারণ ব্যক্তি সমাজেরই একজন।

এখন লক্ষ্যণীয় সহজপাঠে এর কতখানি কি করা হয়েছে। সহজপাঠে আগেই বলেছি যে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যেকার যে আত্মিকতা তা যেন দূরেই রয়ে গেছে। শিশুর ব্যক্তিগত মতামত ও অনুভূতির জগৎই তাতে প্রকাশিত, কিন্তু তাতে সামাজিক প্রভাব পড়ে নি। এতে কি শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয় না? আধুনিক শিশুরা যথেষ্ট সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ। এদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহজপাঠ পিছিয়ে পড়েছে। সহজপাঠে শিক্ষার আপাত লক্ষ্যই বড় হয়ে উঠেছে,

সামাজিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ছ. ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ : এই তত্ত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য, যথাক্রমে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণের বিকাশ।

আগেই উল্লেখ করেছি ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে দরকার যথাক্রমে জ্ঞানমূলক (cognitive), অনুভূতিমূলক (affective) এবং কর্মমূলক (conative) বৈশিষ্ট্য সমূহের কথা। সহজপাঠে এদের উপযুক্ত বিকাশ নেই। মানসিক গুণের বিকাশ, কৃষ্টিমূলক। এখন কৃষ্টি অর্থ আধুনিকতার মানদণ্ডে, মানুষের ক্ষমতার চর্চা, যার দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে সমাজের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়। জন ডিউই এ মতে বিশ্বাস করতেন। সহজপাঠে এর উপস্থিতি নেই।

নৈতিক এবং দার্শনিক যে তত্ত্ববোধ শিশুপায় সহজপাঠ থেকে, তাতে তার মানসিক বিকাশ পূর্ণ হয় ঠিকই, কিন্তু সামাজিক রীতির অনুপস্থিতি তাকে এক স্বতন্ত্র করে তোলে।

অতএব আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ যে বৈজ্ঞানিক শিশুশিক্ষা তত্ত্ব ও দর্শন, প্রচলিত সহজপাঠের তার সঙ্গে কোনো সহজ সম্বন্ধ নেই। সহজপাঠ শিশু-মন বিকাশের উপযুক্ত পাঠ্য, কিন্তু মূল পাঠ্য হিসেবে এর সার্থকতা কমে গেছে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সহজপাঠ মূলত সাহিত্যের বই, বুনিয়াদি শিক্ষার পক্ষে একটু জটিল এবং অন্য ধরণের।

এক সময়ে এবং সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সময়েও 'মানুষ' ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সম্পূর্ণ মানুষ। কিন্তু বর্তমান কালে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আর কাম্য নয়। যেহেতু আমরা সামাজিক প্রাণী এবং শিশুকে বর্তমানে সমাজ-সচেতন সুস্থ মানসিকতার মানুষ তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য, সেই হেতু শিশুকে বর্তমানে শিক্ষাদান কালে বর্তমান সমাজ-চেতনাকে অস্বীকার করে অন্যভাবে শিক্ষাদান অনুচিত হবে। তাই আধুনিক সমাজ-চেতনার বিজ্ঞান অনুসরণ করে বলা যায় যে এই সমাজব্যবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে কোনো সামাজিক অবদান (social contribution) অথবা সামাজিক প্রতিবাদ (social agitations) রাখা সম্ভব নয়। শিশু বয়স থেকেই তাদের মনে গণ-চেতনার বোধ উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয়। তাহ'লে শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর সামাজিক উন্নতি অথবা প্রগতি'র জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হবে না। এই বিষয়ে

উল্লেখযোগ্য একটি মন্তব্য : সত্যব্রত প্রোমিথিউস, জ্ঞানভিক্ষু ফাউস্ট, আজও আছেন জীবনে, তবে সেকালের ব্যক্তিমানুষ একালে রূপ নিয়েছে 'জনগণ' (people) নামক এক বৃহৎ শক্তির মধ্যে[১৫]। অতএব শিশুকে সেই বৃহৎশক্তির সক্ষম অংশ গড়ে তোলবার কাজ তার পাঠক্রমের। সহজপাঠ এ বিষয়ে কতখানি পারঙ্গম তা সন্দেহের অবকাশ রেখে যায়। যদিও আগেও বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের সময়তেও মানুষ ছিল ব্যক্তি মানুষ, কিন্তু পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় সহজপাঠ প্রকাশিত হবার অর্ধশতাব্দী পরে এককালের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতন সম্পর্ক (appropriate relation) যে সহজপাঠ বহন করেছিল, সেই দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত নয় বর্তমানে।

এবার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে দেখা যাক্ অন্যদিকে। মার্কস শুধু বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সার্থক ও আদর্শ সমাজবিজ্ঞানী। সেই দিক থেকে তাঁকে বিচার করে আমরা বলতে পারি, মার্কসের দর্শন অনুযায়ী, সমাজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমাজ প্রতিকারের উপায়। পরিবেশ সমাজেরই অঙ্গ। অর্থাৎ যে শিশু ভবিষ্যতে সমাজ সংস্কারক না হ'লেও সমাজ-সচেতন নাগরিক তৈরি হবে, তাকে তার সচেতনতার অঙ্গ হিসেবেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে হবে তার পরিবেশের সঙ্গে।

আজকের শিশুরা বেশীরভাগ নগরবাসী (অর্থাৎ যারা seriously পড়াশোনা করবে বলে ভাবে)। ভোরের নরম আলো অথবা দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়া প্রভৃতি অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক অনুভূতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। বরং তারা শিশু জীবনের কোমল মানসিকতার পক্ষে অনভিপ্রেত রূঢ় নগর অভিজ্ঞতার কার্কশ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। এদের জীবনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে একাধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নাগরিক-প্রাপ্ত-বয়স্ক অভিজ্ঞতার প্রয়াসে। আগেকার দিনে শিশুরা বড় হবার পথে বিস্তৃত স্থান পেত মানসিক অভিজ্ঞতা চয়নের জন্য। পেত একাধিক মানুষের সঙ্গ। কিন্তু বর্তমানকালে রূপকথাও হারিয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। শিশুসাহিত্যে একদিন 'রূপকথা'র, 'দাদু-দিদিমার গল্পে'র ছিল বলিষ্ঠ স্থান। এখন আর নেই। আধুনিক শিশুরা বরং ভালোবাসে পাশ্চাত্য থ্রিলার অথবা বলা যায় অকারণ উত্তেজনা। আসলে এই উত্তেজনাটাতো সর্বত্রই। দিদা-দাদুর পরিচালনায় বৃহৎ সংসারের একজন নয় আধুনিক-নাগরিক-শিশু। বেশীর ভাগ সংসারই ছোট ছোট 'unit'-এ ভেঙে গেছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি

অর্থাৎ বাব-মা-দাদা-দিদি-র ব্যবহারিক জীবন তাকে করছে প্রভাবিত। গ্রাম-বাংলার বিস্তৃত প্রকৃতির সৌন্দর্য তার কাছে অজ্ঞাত। সহজপাঠের বর্ণনা তার পাশ্চাত্যধর্মী কল্পনার সঙ্গে মেলে না। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে শিশুকে পাশ্চাত্যধর্মী বর্ণনা পাঠক্রমে দিতে হবে। দেয়া উচিত তার পারিপার্শ্বিকের বিশ্বাসী বর্ণনা। সেই পারিপার্শ্বিকতা থেকেই তার দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে প্রাকৃতিক বাংলার সৌন্দর্যের দিকে। তাকে চেনাতে হবে, বোঝাতে হবে আমাদের একান্ত নিজস্ব বাঙালী কৃষ্টির মূল কথাগুলো। সামাজিক ও ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানগুলোর যথার্থ তাৎপর্যও যেন সে বুঝতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি যে সহজপাঠে কোনো রকমের অনুষ্ঠানই বর্ণিত নেই।

আগে কথিত পবিত্র সরকারের দুটো উক্তি আবার স্মর্তব্য: 'ব্যবহারিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়' সহজপাঠ। 'শিশু ভাষা শেখে পরিবেশ থেকে।'

শিশুর পারিপার্শ্বিক কথ্যভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করলেই দেখা যাবে সেখানে সুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা কম পরিবারেই পাওয়া যায়। বাংলার বিশাল জনতা এখনও অশিক্ষিত। শহর জীবনে অভ্যস্থ শিশু যেমন তার চারপাশে পাশ্চাত্যধর্মী উত্তেজনামূলক slang শব্দ শুনছে, তেমনই গ্রামীণ শিশুরা অভ্যস্থ হচ্ছে পারিবারিক সদস্যদের অশিক্ষিত (Academi) কথাবার্তায়। এখন পাঠক্রমের সামঞ্জস্য তাদের সকলকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য platform এ দাড় করাতে পারে।

অতএব, সহজপাঠ বর্জন-বিতর্ক বিশ্লেষণ করে আমরা এই কথাই উপলব্ধি করি, পরিবর্তিত পরিবেশে সহজপাঠ তার প্রাসঙ্গিকতা অনেকটা হারিয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে সহজপাঠ বাঙালী শিশুদের কাছে কৃষ্টি নির্মাণের এক অনুপম বই। এবং অবশ্যই এ বইটির জন্য বাঙালী শিশুরা গর্ববোধ করতে পারে। প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেছেন ' সহজপাঠ এ বইটি হচ্ছে শিশু জীবনের সাহিত্য পাঠের প্রথম বই'।

এখন বিদ্বজ্জনের একমত হ'য়ে আধুনিক শিশু পাঠের উপযুক্ত প্রাসঙ্গিকতা পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের প্রণয়নের সময় উপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সহজপাঠ' 'বাতিল'-এর প্রশ্ন নিয়ে ১৯৮০ সালের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তুমুল ঝড় ওঠে। এবং ঝড় ক্রমশ একটা আন্দোলনের রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক

শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সিলেবাস কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি বর্তমান পরিবর্তিত সময় এবং সমাজমনস্কতা, শিশু মন, ভাষারীতি ইত্যাদির দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে সহজপাঠের বিকল্প গ্রন্থ ঘোষণা করায় কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদে আরেকদল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ফলে 'সহজপাঠ' গ্রন্থটিকে রাখা-না-রাখা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। সহজপাঠের বদলে বিকল্প গ্রন্থ ঘোষণাকে ড নীহার রঞ্জন রায়, সুশোভন সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, গোপাল হালদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল মুখোপাধ্যায় 'মূঢ় উদ্যোগ' বলে ঘোষণা করে 'অবিমিশ্র কারী ব্যবস্থা' থেকে সরকারকে নিরস্ত হবার আহ্বান জানান। ১৯৮০ সালের ২৩ অক্টোবর সুবিনয় রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন, পূর্বাদাস প্রমুখ কণ্ঠ শিল্পীরা বিবৃতি দিয়ে সহজপাঠ বর্জনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ড. সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, পুতুলচন্দ্র গুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সঈদ আয়ুব-ও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের বিবৃতিটি ১৯৮০ সালের ৪ নভেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। শুধু বুদ্ধিজীবী নন, কিছু কিছু রাজনৈতিক দলও 'সহজপাঠ' প্রত্যাহারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাজ্য কংগ্রেস (আ)-র তৎকালীন সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী সরকারের সিদ্ধান্তকে বামহঠকারিতা বলে বর্ণনা করেন (যুগান্তর ১৯/১০ ১৯৮০)। কং-(আ)-র মত কং-ইও আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। সি পি আইও সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলো।

প্রতিবাদ জানালো সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য কাউন্সিল, সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ অভিভাবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে আনন্দবাজার (সহজ পাঠ: কঠিন কথা ২১. ১০. '৮০) এবং যুগান্তর পত্রিকায় (অনিলা দেবীরা আবার ভাবুন / ৩০ ১০ ১৯৮০) সম্পাদকীয় লেখা হলো। সহজ পাঠের পক্ষে প্রবন্ধ লিখলেন কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর ২৫/১০/৮০); সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী (যুগান্তর ২৫ ১০/৮০), ড বিজন বিহারী ভট্টাচার্য (যুগান্তর ৩০/১০/৮০) এবং ড. সুকুমার সেন (আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩১ ১০/১৯৮০)।

এদিকে সহজপাঠকে প্রত্যাহার করে নেবার সরকারি সিদ্ধান্তকে যাঁরা সমর্থন

করে সংবাদপত্রে নিবন্ধ রচনা করেন, তাদের মধ্যে আছেন ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী (নতুন পাঠ্যসূচী ও সহজপাঠ সত্যযুগ : ২৪ ১০ ১৯৮০), ড শুভংকর চক্রবর্তী (সহজপাঠের বিকল্প ভাষা পাঠ কি অন্যায় হবে / গণশক্তি : ১ ১১ ১৯৮০); অনিলা দেবী (দৈনিক বসুমতি : ২৮ ১১ ৮০), এবং সোমনাথ দে (সহজপাঠ : কিছু ভাবনা / গণশক্তি ২ ১১ ১৯৮০)। এই বিতর্কের কথা মনে রেখেই এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। [সম্পাদক]

তথ্য নির্দেশ

১ শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন : সুশীল রায়।

২ Text book in History of Education / P. Monroe.

৩ শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন . সুশীল রায়

৪ জীবনস্মৃতি · রবীন্দ্রনাথ ' চিত্তরঞ্জন দেব সহজ পাঠের সুবর্ণ জয়ন্তী' সাপ্তাহিক দেশ]

৫ রবীন্দ্র প্রবন্ধ সংকলন শিক্ষা রবীন্দ্র রচনাবলী।

৬ নতুন পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ : ড প্রভাতকুমার গোস্বামী, সত্যযুগ পত্রিকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮০।

৭ ভারতীয় কমিশনের চোখে শিশু শিক্ষার ভাষা/ড শুভংকর চক্রবর্তী। গণশক্তি, ১ নভেম্বর ১৯৮০।

৮ সহজপাঠ : কিছু ভাবনা সোমনাথ দে, গণশক্তি। ২ নভেম্বর ১৯৮০।

৯ শিশু শিক্ষার ভাষা অমিতাভ মুখোপাধ্যায, প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাংলা আকাদেমি।

১০ ঐ।

১১ বর্ণ পরিচয় থেকে কিশলয় / ড পবিত্র সরকার, শিশু শিক্ষার ভাষা, প্রবন্ধ সংকলন।

১২ অনিলা দেবীর নিবন্ধ দৈনিক বসুমতি। ২৮ অক্টোবর, ১৯৮০।

১৩ রবীন্দ্রনাথ। সুশীল রায় উদ্ধৃত, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন।

১৪ অমিতাভ চৌধুরী, যুগান্তর। ২৫/১০/১৯৮০।

১৫ সাহিত্য বিবেক : বিমল মুখোপাধ্যায়, পৃ ২১৯।
এবং বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা দিলীপ মজুমদার।

মুকুলেশ বিশ্বাস

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ বনাম বিশ্বভারতী বিল

সভ্যতার অগ্রগমনে আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিকদর্শক—আত্মানুসন্ধানের আলোক বর্তিকা। তাই সংকটে বিপদে ও স্বপ্নে কুণ্ঠাহীনভাবে তাঁর কাছে হাত পাতি, সামনে চলার পথে চাই এগিয়ে যাওয়ার গতি-নির্দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মূলত রবীন্দ্রনাথ কবি হওয়া সত্ত্বেও আত্ম-বিকাশের সেই ভয়ংকর প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি দেশকে, দেশের মানুষকে জাতীয় জীবনে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও বেদনাকে দেখেছিলেন সত্যদ্রষ্টার এক সর্বমানবিক অনুভূতি নিয়ে। তাই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর জীবনকালে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহে ভাবনা ও কর্মের দিক থেকে তাঁর ছিল এক গভীর সংযোগ। এমন কি, দেশের বহু সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যেখানে নীরব থাকলেও তাকে অভিযুক্ত করার তেমন কিছু কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার গ্লানি এবং আত্মবিকাশের স্বাধীনতাহীনতার বিরুদ্ধে বহু ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী বিবেকের কণ্ঠস্বর বহন করেছেন। ইংরেজ সরকারের কাছে যা মোটেই পছন্দের ছিল না। বিশেষ করে শিক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকদের থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারেই বিপরীতধর্মী। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার যখন ইংরেজী ভাষার প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক কারণে কেরানী তৈরির শিক্ষা চালু করতে সচেষ্ট, রবীন্দ্রনাথ তখন চাইছেন এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা জ্ঞানের আলোকে জাতিকে উদ্বোধিত করতে পারে।

আত্মবিকাশের সহায়ক সেই শিক্ষার মাধ্যম নিজস্ব মাতৃভাষা। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়'। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পরাধীনতার

অভিশাপ মোচনে জনশিক্ষার বিকল্প কোন পথ নেই। একদা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষী কর্তৃক জাতীয় জাগরণ প্রচেষ্টার নেপথ্য প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে উজ্জীবিত করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনায় এক বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করে। বিগত শতাব্দীর শেষ পর্বে রোমান্টিক ভাব কল্পনার সঙ্গে তাঁর নিজের মধ্যে বাস্তবের একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কবি কোনটাকে অস্বীকার করতে পারছিলেন না। এই টানাপোড়েনের দোলাচল অস্থির অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সরলতা ও শুদ্ধতা, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার ঊর্ধে ওঠার নিরন্তর প্রয়াস সর্বকর্মে অসীমের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুলতা, নিয়ত শান্তির অনুধ্যান প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি কবি সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ভাবনার এই সত্যতাকে প্রয়োগের দিক থেকে কার্যকর করতে গিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ-ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের কর্মচেতনার ধারা এভাবেই নতুন নতুন রূপ নিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক ইতিবাচক স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসে ফুটে উঠেছে সেই সৃষ্টিশীল ব্যাকুলতার ছাপ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মে তাই তিনি চির নতুনের সন্ধানী এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই বিশ্বাস করতেন সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শর্ত শিক্ষা। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা কবির মনে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া রাজনৈতিকভাবে যে-সব ঘটনা সংঘাত রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী করে, তার অন্যতম কারণ ১৮৮২ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে গ্রেপ্তার থেকে মুক্তিলাভের পর রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে প্রচণ্ড দুর্বলতা লক্ষ্য করেন, যা কবিকে বিশেষভাবে ব্যথিত করে। 'ন্যাশনাল ফণ্ড' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন, যার মূল কথা—সমগ্র জাতিকে কথা বলতে শেখাতে হবে। দু' চারটি লোক ভয়ে ভয়ে কিছু কথা বললে চলবে না। ব্যাপক জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তবেই স্বরাজের স্বপ্ন সফল হতে পারে। কারণ সে যুগের রাজনীতি ইংলণ্ডের নিয়ম-

তান্ত্রিক 'ঢঙ সর্বস্ব' আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা ও জনসংযোগহীনতা, বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের আবেদন নিবেদন সর্বদাই ছিল উপরওয়ালাদের কাছে অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের কাছে, জনগণের কাছে নয়। তাই তাদেব ভাষার মাধ্যমও ছিল ইংরেজী। কিন্তু দেশের জনগণকে সচেতন করতে হলে তা জনগণের ভাষায় হওয়া দরকার, বাংলা ভাষায় হওয়া দরকার। এ কথা রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে অনুভব করেন। 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।' এই কথা তৎকালীন বাংলায় বিদ্যাসাগবের পরে হযতো রবীন্দনাথই প্রথম বলেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিষয় গুরুত্বেব সঙ্গে উল্লেখ করেন: প্রথমত, জাতীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর থেকে, তাব প্রবাহ থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। আর দ্বিতীয়ত, গণশিক্ষার প্রসারে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। এই মানসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারীর কাজে সাজাদপুব, শিলাইদহ ও পতিসর যান, তখন অনেকগুলি জনকল্যাণমূলক কাজ হাতে নেন। কৃষি স্বাস্থ্য সমাজ সেবার সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নও সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায। ঐ সব অঞ্চলে তিনি বেশ কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। স্বনির্ভরতা অর্জন করে চিন্তা ও কর্মে গোটা জাতিকে জাগিযে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। পরবর্তী সময়ে ১৯০১ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব মৃত্যুব পর রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং শিক্ষা নিযে আরো বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। প্রাচান ভারতীয় শিক্ষাব তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মশিক্ষার প্রচলনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেন। এরই ফলশ্রুতি শান্তিনিকেতনে কবি কর্তৃক আশ্রম বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন। এ ছাড়াও প্রাচীন ভারতের অরণ্য বিদ্যালয়ের ধারণা কবিকে আশ্রম বিদ্যালয গঠনে উৎসাহিত করে।

১৯০৫ সালে কার্জনের শিক্ষাবিল, ভাষাবিচ্ছেদ ও বঙ্গভঙ্গের অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বুঝতে পারেন জাতীয় শিক্ষার ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। জাতিকেই বহন করতে হবে। তাই বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভিপ্রায়ে প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে মুক্ত চিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষণ-প্রণালী, সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক সব কিছুই পৃথকভাবে প্রয়োগ করা দরকার—এই মৌলিক ভাবনা কবির মনে

উদয় হয়। তাই শহর থেকে দূরে আলাদা পরিবেশে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন বীরভূমের কোন এক অখ্যাত জায়গায়। রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের এই শুকনো ডাঙ্গা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষানিকেতনের স্থান হিসাবে। কারণ এর পূর্বদিকে নান্নুরে চণ্ডীদাস, কাঁদড়ায় জ্ঞানদাস, পশ্চিমে কেঁদুলিতে জয়দেব আর এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল বাউল আর সাঁওতালী সুর। এখানে আকাশ মাটি ও মানুষ একই সূত্রে গাথা। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক শিক্ষার জীবনবিমুখ কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। তিনি মনে করতেন ঃ 'শিক্ষাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাবে না তাকে মুক্তি দিতে হবে, ব্যপ্ত করতে হবে—চারিদিকে প্রবহমান জীবনযাত্রার উপর আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে।' তাই শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও ব্যপ্ত করার আয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। উৎসবে অনুষ্ঠানে নাচে গানে নানাবিধ চারু ও কারু শিল্পে। ফসলফলানো, ঘর সাজান প্রভৃতি কায়িক শ্রমে।

লোকায়ত সমাজের বিশ্বাসে সংস্কারে পরিব্যপ্ত যে জীবন, তার ঠিক মাঝখানে তিনি স্থাপন করিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীকে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে বেঁচে থাকার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। লোকজীবনের নানাবিধ ব্যবহারিক বিদ্যা, চারু ও কারুকলাসহ শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

শান্তিনিকেতনে যে পাঠক্রম রবীন্দ্রনাথ প্রচলন করতে আগ্রহী ছিলেন, তার প্রধান বৈশিষ্টগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. সকল প্রকার চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষ সাধনে প্রথম থেকে ছাত্রদিগকে সাহায্য করা, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

খ আশ্রমে ও আশ্রমের বাইরে গ্রামগুলিতে যাতে ছাত্ররা পর্যবেক্ষণ শক্তির নিয়মিত ব্যবহার ও ফলাফল লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পায়, তার ওপর গুরুত্ব প্রদান, গাছপালা পশু পাখিসহ।

গ. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির জীবনযাত্রার পরিচয় সম্পূর্ণ করা। কৃষি, তাঁতের কাজ, কামার, কুমোর, তিলির কাজ গ্রামের যে, সকল জীবিকা আছে তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ঘ. ভিন্ন ঋতুতে গ্রামে যে সকল পালা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তার বৈশিষ্ট্য

সম্পর্কে ধারণা অর্জন ও খবর সংগ্রহ করা।

ঙ. হিন্দু মুসলমান সাঁওতাল গ্রাম এবং হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে সকল গ্রামে বাস করে, তাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা জানা।

চ. ধর্মানুষ্ঠান, ভূতপ্রেত বিশ্বাস, চিকিৎসা, জন্মমৃত্যু বিবাহের সম্বন্ধে জানা।

ছ. গ্রামের লোকের যে সমস্ত দুঃখ দুরবস্থা আছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তার কারণ অনুসন্ধান করা।

জ. শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা, দূরবর্তী অঞ্চলের অভিজ্ঞতা অর্জন। ম্যুজিয়মে রক্ষার যোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখে রাখা।

ঝ. ঘর তৈরি ও মেরামতের যোগ্যতা অর্জন এবং গ্রামবাসার কাজে সাহায্য করা।

ঞ. ছুঁতোরের কাজ, তাঁতের কাজ ও বাগানের কাজ আয়ত্ব করা।

ট. সাবান, কালি, কাগজ প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত কবার ক্ষমতা অর্জন।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মপ্রেরণা তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও কিছু করণীয় ছিল—যা সমন্বিত মনোভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির পরিমণ্ডল রচনার অনুকূল। যেমন :

১. প্রত্যেক শিক্ষকেব দায়িত্ব অধ্যাপনা ছাড়াও আশ্রমেব সর্বাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া।

২. ছাত্রদিগকে বা ছাত্রীদিগকে নিযে ব্রতীবালক বা ব্রতীবালিকার দল গঠন করা ও কৃত্য অভ্যাস করানো আবশ্যিক ছিল।

৩. এই ব্রতীবালকেরা যাতে গ্রামে গিয়ে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা পালন করে তার ব্যবস্থা করা।

৪. নিজের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করে তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তি, ছাত্রদের হাতে কলমে সেই শিক্ষা প্রদান।

৫. আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে স্বদেশের উন্নতির ক্ষেত্রে যে সব বাধা আছে, তা অনুশীলন করাও আবশ্যক।

৬. অন্য দেশে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ এবং লোকহিতকর অনুষ্ঠানে

কিরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে, তার খোঁজ খবর নেওয়া।

৭ অন্য দেশের আচার ব্যবহার ও লোকযাত্রা সম্বন্ধে ছাত্রদের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি যাতে দূর হয়, সে সম্পর্কে সতর্ক করা।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শিক্ষা ধারার মূল কথাই হচ্ছে দেশকে জানা—মানুষকে চেনা—লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা নীতির মধ্যে এই পরিচয়ই প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় তা আরো ব্যাপক ও চিন্তার প্রসারতা নিয়ে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে তার সবজনীন রূপ। বিশ্বভারতী বিভিন্ন উদার ও উন্মুক্ত জীবন ভাবনার প্রকাশ হিসাবে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সর্বজনীন রূপ লাভ করতে প্রয়াসী হয়। বিশ্বভারতী বলতে তাই কোন ব্যক্তি, ধর্ম বা সম্প্রদায়কে না বুঝিয়ে একটি আইডিয়া (idea) হিসাবে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। সর্বমানবিক বৈশিষ্ট্যে যার আত্যন্তিক চরিত্র ফুটে ওঠে। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন তাতে বিশ্বভারতী স্থাপনের আভাস মেলে। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কবির মন তখন আন্দোলিত। ন্যাশনালিজম (Nationalism) যে বিশ্ব-শান্তির শেষ কথা নয়—একথা তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করে চলেছেন। কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—এখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে। ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।' ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিবেশ সামনে রেখেই তিনি জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বভারতী গড়ার উদ্যোগ নেন। যেখানে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের হিন্দু সংস্কারের সমস্ত রকম ভাবধারা অতিক্রম করে Modern knowledge-এর সমন্বয় ঘটাবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আধুনিক শিক্ষার আলোকে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বমানবিকতার বিস্তীর্ণ পটভূমিকে উদার শিক্ষাদর্শে নতুন করে ঢেলে সাজাবার উদ্‌যোগ নেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর অন্যতম মূলনীতি হিসাবে বিদ্যা বিতরণের সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা

চলে। শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে সাধারণের জন্য উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের সভাপতিত্বে একটা সভা হয়। সেখানে সভাপতি বলেন: 'বিশ্বভারতী আক্ষরিক অর্থে আমরা বুঝি যে 'ভারতী' এত দিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু 'এর মধ্যে' আর একটা ধ্বনিগত অর্থ আছে বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌছবে—সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্ত রাগে অনুরঞ্জিত করে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে উপস্থিত করবো। সেই ভাবেই বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা আছে।' সেদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'কোন জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।' বিশ্বভারতীর শিক্ষা প্রস্তাবনায় তাই কোন সংকীর্ণতা ও নিয়মের কঠোর বাঁধন ছিল না। প্রথম Prospectus-এ ঘোষণা করা হয়েছিল: 1. The Visva-Bharati is for higher studies. 2. The system of Education will have no place whatsover in the visva-Bharati, nor is there any confering of degrees. 3. Students will be encouraged to follow a definite course of study, but there will be no compulsion to adopt it rigidly ?' এই সময় কবির কাছে ধর্মচেতনা ও জীবনাণুভবের প্রত্যয় ধারণা—অনেকখানি বাস্তবধর্মী ও বলিষ্ঠ। ধর্ম তার কাছে হিন্দু, মুসলমান খৃস্টানের নয়—ধর্ম মানুষের এবং তা হচ্ছে মানব ধর্ম। তাই কবির বর্ণনায় মহামানব কোন মহাপুরুষ নয়—The Man। বিশ্বভারতী ভাবনার উদয়ে যে বিদ্যাসাধনা আয়োজন করা হয়, সেখানে জাত পাতের কোন স্থান হয় না, তার দ্বার খুলে দেওয়া হয় সবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের আর একটা মূল কথা ছিল শিক্ষার সঙ্গে আনন্দকে মিলিয়ে দেওয়া। নৈসর্গিক পরিবর্তনে ও বৈচিত্র্যে জীবনের প্রবাহকে গতিশীল করে তোলা। ঋতু বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানব প্রবৃত্তিকে বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে স্থাপন করে এক নান্দনিক জীবনবোধের অনুষ্ঠান ঘটানো। এই শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ বলা যায় না। কারণ, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক নিজস্ব শিক্ষাভাবনা ছিল বর্তমান। প্রচলিত

শিক্ষানীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার এখানেই স্বাতন্ত্র্য। জীবনের অভিজ্ঞতায় যে ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি অন্য জায়গায় দেখেছিলেন—যার পীড়নে একদিন কলকাতায় তাকে স্কুল পলাতক হতে হয়েছিল, সেই সব ত্রুটি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীতে। তিনি বুঝেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষার দ্বারা শিশু মনের কল্পনা-শক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। এমন কি সুকুমার বৃত্তিগুলিও পুষ্ট হয় না। পঠিত বিষয় পরীক্ষার জন্য মুখস্থ হয়ে থাকে, সহজ বিশ্বাসে সাবলীল হয়ে উঠে না। শিশুমন শেষ পর্যন্ত এক তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় তাই তিনি হৃদয়হীন বন্ধনকে শিথিল করে দিলেন—প্রকৃতির অফুরন্ত পটভূমিতে। ঋতু বৈচিত্র্যে শিশুমন স্থাপিত হল। কবি তাদের জন্য গান রচনা করলেন। বর্ষা বসন্তের উৎসব আয়োজন করলেন। অভিনয়ে উৎসবে শিক্ষা সঙ্গীত হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ খেলা ও কাজের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন শিক্ষার পাঠক্রমে। এইভাবে 'Work in Education'-কে Work in joy'-এ রূপান্তর ঘটালেন। 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ' এই মনোভাব ফুটে উঠলো শিক্ষার অঙ্গনে। তাই শান্তিনিকেতন সৃষ্টির পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি লেখেন, তার অনেকগুলিই প্রকৃতি-নির্ভর শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী। শারদোৎসব, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী তার মধ্যে অন্যতম। এই নাটকের মধ্যে অচলায়তনকে গ্রীষ্মের, ডাকঘরকে হেমন্তের বার্তাবহরূপে ব্যাখ্যা করা চলে।

তবে রবীন্দ্রনাথ যদিও মনেপ্রাণে স্বাধীন ও সুস্থ শিক্ষানীতির পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু আর্থ-সামাজিক পটভূমি তাকে এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে দেয়নি। শিক্ষাদর্শ-বিরোধী কিছু ঝোঁকের সাথে আপস করতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার চাপে তিনি পরীক্ষাপদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য হন। এ ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের শর্ত হিসাবে তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের কথা চিন্তা করে ইংরেজী শিক্ষায়ও গুরুত্ব দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা একটা বেদনার কারণ ছিল।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই কবি ছাত্রদের মধ্যে একটা আত্মকর্তৃত্ব-বোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, একে অন্যের সহায়ক বন্ধু। শিক্ষক ছাত্র সকলেই সমমর্যাদায় শিক্ষায়তন গড়ে তুলবেন, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে কাম্য। কবি তাই শান্তিনিকেতনের

নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের আত্মকর্তৃত্বের অবকাশ প্রদান করে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন : নালিশ যেখানে কথায় কথায় মুখর হয়ে উঠে, সেখানে সঞ্চিত থাকে নিজেরই লজ্জার কারণ। তাই ছাত্রদের তিনি আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীন এবং উন্নতচেতনা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিতে আগ্রহী ছিলেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীর অপরিসীম গুরুত্বের কথা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন : 'ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্মকে প্রণালীবদ্ধ করে তুলতে পারে সেই দিকে তাদের উৎসাহিত কোরো··· । এ সম্বন্ধে তোমরা মনে কোন সংকোচ রেখো না। এই ছাত্ররাজ শাসনপ্রণালী যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটা মস্ত জিনিস হবে।' রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা খুব দৃঢ়মূল ছিল যে, তরুণ কিশোর যুবকেরা সাধারণভাবে উদার মনের অধিকারী। তাদের সাথে ঠিক মতো ব্যবহার করলে এবং দায়িত্ব অর্পণ করলে তারা তা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করে। কখনই যা খুশী তাই করতে পারে না। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা, শিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিচালনায় তাই তিনি ছাত্রদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন : ছাত্রদিগকে যারা শ্রদ্ধা করতে পারে না, ছাত্রদের কাছ থেকে তারা ভক্তি পাবার উপযোগী নয়। ছাত্রদের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রাখারও তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাই ছাত্রদের যারা কড়া শাসনের জালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেঁধে ফেলতে চান, তাদের সতর্ক করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'জেলখানার কয়েদি নিয়মের গড়বড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না। কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়।···কিন্তু ছাত্রদের জেলের কয়েদি ভাবতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে।' এ কথা বিস্মৃত হওয়া সামাজিক অপরাধ।

রবীন্দ্রনাথের এই আবেদন আজ বিশ্বভারতীতে চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। লজ্জাহীন স্পর্ধায় ও ঔদ্ধত্যে তাকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বভারতী বিলে (১৯৮৪) বিশ্ব ভারতীর ভাবমূর্তিকে আইনের কাঁটাতারে ঘিরে ফেলা হয়েছে। 'ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীর' গোটা প্রেক্ষিত অস্বীকার করা হয়েছে এই বিলের বিভিন্ন ধারায়, যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন শিক্ষাদর্শকে করা হয়েছে শৃঙ্খলিত। এই পদক্ষেপ সমস্ত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে

ধ্বংস করে এককেন্দ্রীক ঝোঁকের প্রকাশ ঘটিয়েছে নগ্নভাবে। এই আইনে নামমাত্র ছাত্রদের কিছু অধিকারের কথা বলেও তাকে অস্বীকার করার সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা হয়েছে কর্তৃপক্ষের তথা উপাচার্যের হাতে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্ব সর্বস্তরে খারিজ করে দেয়া হয়েছে এই বিলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের কিছু মতামত ও সুপারিশের অধিকারের কথা স্বীকার করা হলেও যাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হবে তারা সকলেই কর্তৃপক্ষের মনোনীত হবেন। যে 'Executive Committee' সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা, সেখানে ছাত্র অধ্যাপক বা কর্মী কারুরই প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষরা বয়সের অভিজ্ঞতারভিত্তিতে মনোনীত হবেন। আর ৩ জন অধ্যাপক ও Seniority-র ভিত্তিতে এই কমিটিতে আসতে পারবেন। সংশোধিত আইনের ১০নং ধারায় স্পষ্ট করে তার উল্লেখ রয়েছে: (X). Three persons to be elected by the Samsad (court) from amongst its members, none of whom shall be an employee or a student of the university·· (page 42). Court-এও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক কোন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রাখা হয়নি। Academic council-এ দুইজন ছাত্র All round development of personality-সম্পন্ন ছাত্র মনোনীত হতে পারবে। ফলে একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই যে, সমস্ত স্তরের নীতিনির্ধারক সদস্যরা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় মনোনীত হবেন এবং তাদেরই ইচ্ছায় কার্য পরিচালনায় বাধ্য থাকবেন।

Students Council সম্পর্কে বলা হয়েছে: এটিও কোন ছাত্রদের নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি হবে না। কেবলমাত্র কৃতি ছাত্রদের দ্বারা গঠিত হবে। বছরে অন্তত একবার এরা বসবে। তাদের কার্যকর তেমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কেবল কিছু পরামর্শ এরা দিতে পারবে। কর্তৃপক্ষ তা মেনে না নিলে সে ব্যাপারেও তাদের করণীয় তেমন কিছু থাকবে না। এই আইনে উল্লেখ আছে: The Functions of the Student Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the university in regard to the programme of studies, student welfare and the matters of importance in regard to the working of the University in general and such suggestion shall be made on the basis or

consensus of opinions. বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও তাঁর নীতির বিরুদ্ধে নতুন সংশোধিত আইনে যে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, অপমানিত ছাত্রসমাজ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার, উত্তাল। বর্তমান কর্তৃপক্ষ সে কারণে ভীষণ উদ্বিগ্নও বটে। আর এ উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নিরাপত্তা বাহিনী বা সি, আর, পি-র আশ্রয়প্রার্থী। একদা নিসর্গের লীলাভূমি উদার নীল আকাশ ঘেরা সবুজ শ্যামলের প্রাণপ্রবাহে সজীব দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতীক রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও কর্মসাধনার উৎসভূমি শান্তিনিকেতনে প্রায়ই শোনা যায় সি, আর, পি'র বুটের আওয়াজ। বেয়নেটের চেয়ে ধারালো গণতন্ত্র হত্যার নতুন নতুন ফরমান। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ জাতীয় বিবেকের কণ্ঠরোধের নামান্তর। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তীতে তাঁর প্রতিকৃতি সামনে রেখে অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা যদি সহস্রকণ্ঠে ধিক্কার জানাতে না পারি, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা নিজের কাছেও হব আত্মপ্রতারণার দায়ে অপরাধী।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান উপাচায এক বিবৃতিতে বলেছেন : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে যথেচ্ছভাবে দোকান, বাড়ি, ভিডিও সেণ্টার ইত্যাদি গজিয়ে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্নবোধ করছেন। এ ব্যাপারে অবিলম্বে যদি কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তা হলে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। সাংবাদিক বৈঠকে উপাচায উদ্বেগের সঙ্গে বলেন : বর্তমানে যে-ভাবে জমি নিয়ে ফাটকা চলছে, তা চলতে থাকলে বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে (আনন্দবাজার ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬)। এই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বভারতীর ভেতর ও বাইরের চেহারা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থা কি এক দিনে তৈরি হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে কি কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা ছিল না? এ ব্যাপারে তাদের কি কোন প্রশ্রয় নেই? কিন্তু ছাত্র এবং কর্মীদের শাসনে তো তাঁরা সি, আর, পি ডাকার শৈথিল্য দেখান না। স্বাভাবিক কারনেই এ প্রশ্ন আসা অসঙ্গত নয় যে, এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার পেছনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের হয়তো ছায়াপথে পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। আমরা জানি না এর পরিনতি আরো ভয়াবহ রূপে নেবে এবং কে এর জন্য দায়ী থাকবে। দেশের সমস্ত রবীন্দ্রপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে তাই ভাবনার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব

এড়িয়ে গেলে চলবে না।

সহায়ক রচনাপঞ্জী

১. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড): নেপাল মজুমদার।

২ পুরানো সেই দিনের কথা: প্রমথ নাথ বিশী।

৩. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা: প্রবোধ চন্দ্র সেন।

৪. আমি তোমাদেরই লোক: ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৫ ঐকতান গবেষণা পত্র, রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী স্মারক সংকলন।

৬ বিশ্বভারতী নতুন সংশোধিত আইন (১৯৮৪)

৭ রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ: রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ভাবনা ও বর্তমান রূপ: নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা।

৮ L. K. Elmhurst-Sikaha Satra

৯. Or, H. B. Mukherjee : Education for Fulness , A Study of Educational thought and experiment of Rabindranath Tagore.

১০. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রয়াস: একটি সমীক্ষা / সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভংকর চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবী ঐতিহ্য। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অর্থ তাঁর সৃষ্টিকর্ম কী পরিমাণ বর্তমানের সেবা করতে সক্ষম, তার পরিমাপ করা। এই সেবাযোগ্যতা যেদিন রবীন্দ্রনাথ হারাবেন, সেদিন তিনি ঐতিহ্য না হয়ে অতীতের মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হবেন। কিন্তু আজও তিনি সে সেবাযোগ্যতা হারাননি বলেই রবীন্দ্র-শিক্ষা চিন্তার আলোকে ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ বিচার করা যাবে।

সন্তানের পক্ষে, সমাজ ও দেশের পক্ষে শিক্ষার একটা যুগান্তকারী হিতকরতার ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রশিক্ষা চিন্তার এই কল্যাণকরতা পরিমাপক যন্ত্রস্বরূপ। রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তা প্রয়োগ করে যে কোনো শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিধির ভেতরটা দেখা যাবে এবং সহজে বিচার করে দেখানো যাবে উক্ত শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাপ্রণালী সন্তান ও দেশের পক্ষে হিতকর, কি ক্ষতিকর। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সদ্য পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রয়োগ : বড়ো আইডিয়া ও তার রূপায়ণ

বড়ো একটা আইডিয়া ও তার রূপায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি মনে করতেন : আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না।[১] যেখানেই লঙ্ঘন করা হয়েছে, আইডিয়া 'ধ্যান করা নেশা করা মাত্র' হয়ে উঠেছে। এই প্রাজ্ঞ উপলোব্ধি প্রয়োগ করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ বিচার করা যাবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক এপ্রিল, ১৯৮৬-র উপস্থাপনায়—National Policy on Education 1986—A presentation—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা খুবই বড়ো আইডিয়া,

অভিমুখের সংকল্প, উজ্জ্বল সদিচ্ছা। যেমন সকলের জন্য শিক্ষার কথা, সমাজ-তন্ত্রের লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি বড়ো সব আইডিয়া রয়েছে—National cohesion, scientific temper and independence of mind and spirit thus furthering the goals of socialism, secularim and democracy[৭] এসব উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। এ নিয়ে কারও মতভেদ নেই, কেউ বিতর্ক করবেন না। এসব আইডিয়া কার্যকর করা হলে সন্তান বর্তমান যুগের শিক্ষার অস্ত্রবস্ত্রে মানুষ হয়ে উঠবে। দলমত নির্বিশেষে দেশবাসী মাত্রেই আমরা তা চাই। কিন্তু এই সব উজ্জ্বল আইডিয়াকে রূপায়িত করা যাবে কী উপায়ে—শিক্ষা বিষয়ে এই জাতীয় নীতিতে তা বাস্তবিকভাবে ও সুনির্দিষ্টরূপে দেখানো হলো না। তার কোনো উপলব্ধিই সরকারের আছে বলে নিশ্চিন্ত হতে পারা গেল না। একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

আমাদের শিক্ষানীতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের সদিচ্ছা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আইডিয়াটা কি? কীভাবে এই আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেয়া হয়? সমাজতান্ত্রিক আইডিয়া হলো এই সুন্দর উপলব্ধি যে, শিক্ষার যাবতীয় সুফলকে দেশের সকল মানুষের কাছে সহজপ্রাপ্য করা হবে। শিক্ষার আলো একাংশের ওপর পড়বে, আরেক অংশে লাগবে পূর্ণগ্রহণ—সে তো জাতির জীবনে আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপ। অগ্রসর শিক্ষা দিয়ে জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান চেতনার মান নিরন্তর উন্নত করা হবে। এই পথেই দেশের জনগণ তাদের প্রতিভা ও দক্ষতাকে উৎকর্ষে বিকশিত করতে পারবে। কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সমাজতান্ত্রিক দেশ এই বড়ো আইডিয়াকে কার্যে রূপ দিতে পেরেছে? সে হলো, শিক্ষার লক্ষ্যকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো, উৎপাদন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দিয়ে। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আইডিয়ার এই উপলব্ধি ও তার রূপায়নের এই কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

বর্বর জার্মান নাজি আক্রমণে চারটা বছর ধরে (১৯৪১-৪৫) সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করেছে, দেড়কোটি ছাত্রের ৮২ হাজার স্কুল ধ্বংস করেছে, ৩৩৪টি উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র পুড়িয়ে দিয়েছে, অগণিত শিক্ষক ও হাজার

হাজার ছাত্রকে হত্যা করেছে। এই মরুধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পরবর্তী দুই দশকের মাথায় ১৯৭০ সালের মধ্যে সে দেশ আবার সকলকে শিক্ষার সীমার মধ্যে এনেছে, শিক্ষিতের হার তুলেছে পুরুষের মধ্যে ৯৯.৮ শতাংশ, নারীদের মধ্যে ৯৯.৭ শতাংশে। এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে শিক্ষার মহৎ আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেবার নির্দিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেই। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন বড়ো আইডিয়া ও তার রূপায়ণের মধ্যে সর্বদা এই নিবিড় প্রবন্ধ দরকার।

কিন্তু আমাদের এই সভাপাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলো, অথচ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দূরের কথা, উৎপাদন কাঠামো ও পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যকে যুক্ত করে দেবার কোনো সুনির্দিষ্ট কথা কোথাও বলা হলো না। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য লেখা হলো অথচ শিক্ষাকে সকল দেশবাসীর কাছে সহজপ্রাপ্য করার ও জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান চেতনার মান উন্নত করার কোনো নিশ্চয়তা দেয়া হলো না। সকলের জন্ত শিক্ষা 'Our national objective is that education should mean education for all'[৩] ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কীভাবে ভারতের সকল ঘরে শিক্ষার ফসল উঠবে তার নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা রাখা হলো না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হলো—'The main task is to strengthen the base of the pyramid, which might touch billian at the turn of the century. Equally important is to see that those at the top of the pyramid are among the best in the world.'[৪] লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর বসতি জুড়ে বিস্তৃত পিরামিডের গোড়াটা মজবুত করার কথা বলা হলো কিন্তু কীভাবে তা করা হবে, বলা হলো না, এর জন্ত অর্থবরাদ্দ হলো না, পরিকল্পনা হলো না। সে দায়িত্ব ভবিষ্যতের কাছে রেখে বলা হলো শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানের উত্তর রাষ্ট্রকেই খুঁজে বার করতে হবে—'As in the case of other areas of development, the National has to find its own answers to the problems afflicting Educations.'[৫] কিন্তু বড়োই আশ্চর্যের পিরামিডের শিখরে যারা থাকবে তাদের দুনিয়ার সেরা সন্তানদের সমকক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো এবং কীভাবে সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তার জন্ত ছক

কাটা, অর্থ বরাদ্দ সব করা হলো। অবৈতনিক ও আবাসিক আদর্শ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করে এই আইডিয়া সফল করতে সরকার এতো উৎসাহী হলো যে শিক্ষার দলিল লোকসভায় পেশ করার আগেই এ বিষয়ে কাজ শুরু করে দিল। এ ঘটনা সমাজতান্ত্রিক উপলব্ধি নয়, সমাজতান্ত্রিক আইডিয়ার ঘোর বিপরীত। অথচ শিক্ষানীতিতে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, সকলকে শিক্ষা দেবার লক্ষ্য—এসব আইডিয়া রাখা হলো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার বিচারে এরূপ আইডিয়া হলো ওপর সাজ, ওপর চাল, কথার কথা—সমাজতন্ত্রের ধ্যান ও নেশা, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ছলনা। এহলো শিক্ষার অসাম্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ, শ্রেনীতে শ্রেনীতে অস্পৃশ্যতা। এর ফল বিষময়।

দ্বিতীয়বার প্রয়োগ : শিক্ষার বিস্তার

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে বলে গিয়েছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই, কখনও প্রসঙ্গ টেনে এনে বারংবার বলেছেন : আধুনিক কালের নতুন শিক্ষার যে আবির্ভাব তার প্রবাহ যেন সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইতে থাকে ; সাধারণের ঘাটে ঘাটে যেন প্রবাহিত হয় সে ধারা। মৃত্যুর একবছর আগেও ১৯৪০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিয়েছেন : 'যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন · সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।' 'বিদ্যা মনুষ্যত্ব লাভের উপায়।' বিদ্যালাভে মানব-মাত্রেরই সহজাত অধিকার।'[৬] পরাধীন দেশের শিক্ষা সংকোচনের মুখে দাঁড়িয়ে দাবি করেছেন, বিদ্যার প্রসারে যে প্রাচীর বাধা রয়েছে তা ভাঙতে হবে। 'যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যাক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতে হইবে। ...স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে।'[৭] রাশিয়া ভ্রমণকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তি নিহিত রয়েছে প্রাচীর ভেঙে সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। নিবিড় আবেগে রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন : আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন।[৮] কবি বিশ্বাস করতেন : 'অশিক্ষার মন জড়তাপ্রাপ্ত হয়, প্রবঞ্চিত, পীড়িত হয়'। শিক্ষার মহাশীর্বাদ পেলে ভারতের 'যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসের মুক্তি' ঘটবে ; দেশবাসীর অবিদ্যা দূর হবে, চিত্তে আলো আসবে, নিজের ওপর স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগবে, আত্মবিশ্বাস আসবে। এই

জন্যই শিক্ষা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন অশিক্ষার আত্মগ্লানিকে। 'আজ হিন্দু-মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী এই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, আত্মীয়কে তুলেছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষে।'[২]

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার আলোকে নয়াশিক্ষা-নীতির শিক্ষাবিস্তারের আইডিয়া কতদূর আন্তরিক ও বাস্তবিক, বিচার করা যেতে পারে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে শিক্ষাদানের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার সুযোগ যখন এলো, শিক্ষার প্রসারের পথে প্রাচীর বাঁধাটা ভাঙার কাজে সঠিক আগ্রহে সেদিন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে রাজ্যে হাত দিলেন না। সংবিধানে যদিও সংকল্প লিপিবদ্ধ হলো যে ১৯৬০ সালের মধ্যে দেশের সন্তানদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা দেয়া হবে, কিন্তু সে বড়ো আইডিয়াটা আজ পর্যন্ত ধ্যানের বস্তু হয়ে রইল। যথার্থ ইচ্ছা ও উদ্যোগের অভাবে বিস্তার জমিতে নিরক্ষরতা আগাছার মতো বাড়তেই লাগল। বাড়তে বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটিতে, একবিংশ শতকের আরম্ভ বছরে সে সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ কোটিতে। ৫০ কোটির এই সংখ্যাতত্ত্ব নতুন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দিয়েছেন। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে নয়া শিক্ষানীতির দলিল রাখার সময় এই তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন ১৯৯০ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে দেশের সকল সন্তানকে আনা হবেই। ৪০ বছরের সুদীর্ঘ বিলম্ব সত্ত্বেও দেশবাসী উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচমাসের মাথায় ১৯৮৬-র জানুয়ারি মাসে নতুন শিক্ষানীতির দ্বিতীয় দলিল রাখার সময় আরও পাঁচ বছর চেয়ে নিয়ে সুপারিশ করা হলো ১৯৯৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। দেশবাসী ক্ষুণ্ণ হলেন, সন্দীহান হলেন। তিন মাসের মাথায় যে দলিল লোকসভায় পেশ করে পাশ করিয়ে নেয়া হল, সেখানে দেখা গেল ১৯৯৫ সালের বছরের সীমাটাও তুলে দেয়া হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা দেবার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ, বছরের উল্লেখই করা হলো না।

আজ থেকে ৭১ বছর আগে মহাত্মা গোখলের সর্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব

দেশের নেতৃত্বের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। এত বছর পর স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে উদ্যোগে উপেক্ষা দেখে দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগছে—বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করতে এবং শিক্ষার ধারাকে সর্বজনমুখী করতে স্বদেশের কেন্দ্রীয় সরকার আদৌ আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক কিনা। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থের অভাবের কথা যদি তোলা হয়, বলতেই হবে শিক্ষার দানে মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে দিতেই হবে। কারণ শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণে দেশের অগ্রগতির শিকড়ে রস জোগানো যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই অর্থাভাব কখনই নেই। দেশের ধনীজনকে একাধিক তিনটি কর ছাড় দিয়ে (সম্পদ কর, ভূ-সম্পত্তি কর, আয়করের হার হ্রাস) সরকার বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা হারাচ্ছেন। অপরদিকে রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর বৃহৎ রপ্তানীকারীদের ভর্তুকি দিতে প্রায় আরেকহাজার কোটি টাকা সরকার হারাচ্ছেন। শতকরা এক জনের কম দেশবাসীর জন্য আদর্শ স্কুলের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। এই আড়াই হাজার কোটি টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয়ে সর্বজীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার সর্বাগ্রে করণীয় কাজ সম্পাদন করলে দেশের ভাণ্ডারে মহার্ঘ সম্পদ তোলা সম্ভব হতো। অর্থের অভাব নেই, অভাব রয়েছে সকলকে শিক্ষা দেবার দৃষ্টিভঙ্গীর এবং তাকে কার্যকর করার বাস্তবিক পরিকল্পনার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষার প্রাচীর বাধাটা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া এতদিনে যেতই। সে লক্ষ্য না থাকলে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক কোনো দিন সর্বজনীন শিক্ষাদানের কোনো নির্দিষ্ট বছর ধার্য করতে পারবে না। দেশের সন্তানরা শিক্ষার মহাশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। করণীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করে কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে যা করছে তা হলো কেবল বাধার প্রাচীরটা যাতে চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রাচীরটাকে একটা বিশাল দামী ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা। এই ত্রিপলটি হলো প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ত্রিপল। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা দেবার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা শিক্ষার হিতকর বিস্তারের ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সময়ের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল কাজ দিলেও, স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এ ব্যবস্থা কখনও কল্যাণপ্রদ

হবে না। সে হবে স্কুলশিক্ষায় অর্জনে সকল শিশুর প্রবেশের সুযোগদানের অক্ষমতাকে আড়াল করার ব্যবস্থা। স্কুল ব্যবস্থায় শিক্ষালাভের অধিকার শিশুর জন্মগত অধিকার। শিক্ষার সে সুযোগ এতে প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হবে। এক অংশ শিশুসন্তান স্কুলশিক্ষায় সুযোগ পেল, আরেক বৃহত্তর অংশের শিশু তা থেকে বঞ্চিত রইল। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, উৎসাহমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যে এদের স্কুলের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না করে এবং পড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পথটা সিমেন্ট করে বন্ধ করার পরিকল্পনা না করে ঠেলে দেয়া হবে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে। এর ফলে শিক্ষা বিস্তারের প্রাচীর বাঁধাটা নতুন এক বিষের বাঁধার রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়াবে। স্বজাতি শিক্ষাকামী সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ উপ্ত হবে। পর্যাপ্ত বিদ্যালয় খুলে সকলকে শিক্ষা দেবো না বলেই যদি এই সব পরিকল্পনা হয়ে থাকে, এই উদ্যোগের মধ্যে সেই অনিচ্ছা ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এরূপ অনিচ্ছার মূল খুঁজতে গিয়ে টলস্টয়ের একটা উক্তিকে সমর্থন করে বলেছেন, সরকার জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার চায় না, কারণ জনগণের অশিক্ষা অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের শক্তি রয়েছে নিহিত—'The strength of the government lies in the people's ignorance and the government knows this and will therefore always oppose true enlightenment.' [১০] রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিতে নয়াজাতীয় শিক্ষানীতি বিচার করলে সন্দেহ হবেই যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশের জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না ঘটুক। দলমত নির্বিশেষে সন্তান-হিতাকাঙ্ক্ষী স্বদেশবাসী অভিভাবক ও আত্মহিতকামী সন্তান মাত্রেই এই ঘটনায় গভীর উদ্বিগ্ন হবেন।

তৃতীয়বার ব্যবহার : উচ্চবর্গীয় শিক্ষা

শিক্ষার উচ্চবর্গীয় চরিত্রের বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ বরাবর করেছেন। মুষ্টিমেয় ভারতবাসী রায় দেবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী তা 'জো হুজুর' বলে মাথা পেতে নেবে—এই বিধির শিক্ষার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন লেখায় শিক্ষার এই উচ্চবর্গীয় চরিত্রকে, অভিজাত্য সৃষ্টির শিক্ষা-প্রণালীকে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করতে বলেছেন। পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসকের শিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল এই যে, ইংরেজ শিক্ষাকে স্বর্ণ-তরবারি রূপে ব্যবহার করে সমাজটাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এই

প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। ইংরেজের এই শিক্ষাবিধিকে বলেছেন: রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল। কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে সুপ্ত। কারখানার গাড়িটা যেন সত্য। আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।[১১] 'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।'[১২] দেশের পল্লী এবং গ্রামবাসীদের বিষয়ে যখনই আলোচনা করেছেন, শিক্ষার এই আভিজাত্য সৃষ্টির বিধিকে তিনি নিন্দা করেছেন, লক্ষ্য করেছেন শিক্ষার উচ্চবর্গীয় চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে 'সকলের চেয়ে বড জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।'[১৩] রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সিঁড়িতে গাঁথা একটা ইমারতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একতলার মানুষ যেন সিঁড়ি বেয়ে শিক্ষা ইমারতের ছাদে উঠতে পারে। কিন্তু ইংরেজ সরকার শিক্ষা-ইমারতের সিঁড়ি গোড়া থেকেই রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে রাখে নি। ফলে একতলার মানুষ সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে পারবে না। পরাধীন দেশের শিক্ষার এই মস্ত ফাঁকটা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তিনি তখনকার অনেক রাজনৈতিক নেতাদের বলেছিলেন: দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সেকথা স্পষ্টভাষায় উপেক্ষিত হল।'[১৪] দেশ যখন স্বাধীন হলো বিরাট জনসাধারণের অশিক্ষার অন্ধকার দূর হল না; রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে রাষ্ট্রনায়কগণ কেবল আলো-আনার সংকল্প ও সদিচ্ছাই ঘোষণা করলেন।

রবীন্দ্রশিক্ষাবিস্তারের এই উপলব্ধি প্রয়োগ করলে দেখবো, ঔপনিবেশিক যুগের সেই ফাঁকটা সদ্য পাশ হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েই গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই দেশের শিক্ষাবিধিতে এ-ফাঁক ছিল; এবার তা জাতীয় শিক্ষানীতির ছাপটা গায়ে দিয়ে সম্মুখ আগলে এসে দাঁড়াল। দেখলাম, তার চরিত্র উচ্চবর্গীয়, তার পিরামিড চেহারা। পিরামিডের শিখরে উঠবার সিঁড়ি গোড়ায় নেই—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'সিঁড়ি হারা শিক্ষাবিধান'। ফলে একতলার মানুষ কোনোদিনই এই শিক্ষাপিরামিডের শিখরে উঠতে পারবে না। তবে 'নবোদয় বিদ্যালয়ের সুউচ্চ ছাদ থেকে বাছাই করা ছাত্রদের পিরামিডের শিখরে সরকারী চঙ্কুতে করে তুলে তুলে রেখে

আসা হবে। সেখানেই তারা সরকারী পিতৃমাতৃস্নেহে পালিত হয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা পেতে থাকবে। আজ পিরামিডের গোড়াটা শিখরকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নেবে, তার ভার বহন করবে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করবে না—দাম জোগাবে, মাল আদায় করবে না। এ রবীন্দ্রনাথেরই ক্ষোভের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যা উৎকৃষ্ট তাতে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। মৃত্যুর এক বছর আগে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণে বলেছেন: মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার।...আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এছাড়া কোনো পথও নেই। নতুন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।[১৫] নতুন শিক্ষানীতি 'জাতীয়' নাম ধারণ করলেও জাতির সে দাবি পূরণ করল না। জনসাধারণকে পেছনে রেখে আলোকিত একটা সমাজ তৈরির বিধি প্রণয়ন করল।

শিক্ষাবিষয়ে জাতীয় নীতির এই উচ্চবর্গীয় চরিত্র প্রথম লক্ষণীয় হবে প্রথাভুক্ত শিক্ষার বিকল্প হিসেবে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন পরিকল্পনায়। সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে যাবার বয়স হয়েছে, দেশের এমন ছাত্র জনসমষ্টিরও বড়ো এক অংশ স্কুলশিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যাবে। দু-ধরণের শিক্ষাবিধানের মধ্যে শিশু সন্তানরা শুরু থেকেই বড়ো হবে।

এই শিক্ষানীতির উচ্চবর্গীয় চরিত্র দ্বিতীয়বার স্পষ্ট হয়েছে আদর্শস্কুল বা নবোদয় বিদ্যালয়ের (space setting model school) পরিকল্পনায়। প্রথাভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় যারা প্রবেশ করতে পারবে, তাদের মধ্য থেকে অতি ক্ষুদ্র একটা অংশকে বেছে আলাদা করে নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে। বাছাই-এর মাপদণ্ড হবে মেধা। অথচ মেধা সর্বদাই আর্থিক সচ্ছলতা ও সুযোগ এবং অনুকূল আয়োজনের কর্ষিত জমিতে ফলন দেয়। কদাচিৎ দেখা যায় দারিদ্র্যপিষ্ট ঘরে মেধা জঞ্জাল কাটিয়ে রক্তকরবীতে ফুটে উঠেছে। দেশের সরকার অন্নের স্বাস্থ্যের সুযোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করতে না পারলে, কখনই তার পক্ষে নবোদয় বিদ্যালয়ে সকলের প্রবেশ সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সকলের জন্য নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগের ঘোষণা আরেকটি

বড়ো মাপের আইডিয়া, যার ধ্যানের রূপ, পেশার রূপটাই সত্য ; বাস্তবিক রূপটা কোনোদিন বর্তমান ভারত সমাজ কাঠামোতে যথার্থ দেখা যাবে না। এই সামাজিক সত্যের পথে নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ অবারিত থাকবে সমাজের সম্পন্ন অভিজাত ঘরের সন্তানদের কাছে। নবোদয় বিদ্যালয়-প্রণালী ভারত সমাজের উচ্চশ্রেণীর সন্তানদের জনগণ থেকে বেছে আলাদা করার সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাজ করবে। আমেরিকা ইংলণ্ডের মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশে এ ধরণের স্কুল এই উদ্দেশ্যই সাধন করছে। আমেরিকান শিক্ষাবিদ E. Digby Baltzell বলছেন ওদেশে এসব স্কুল 'serve the sociological function of differentiating upper class in America from the rest of the population.' আমাদের দেশে সম্পন্ন ঘরের সন্তানদের সাধারণ-দেশবাসী থেকে বেছে আলাদা করার বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যমান রয়েছে। এবার সরকারী উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে বিধান ঘোষিত হলো।

খুবই লক্ষণীয়, আমাদের নতুন শিক্ষানীতির এই উচ্চবর্গীয় চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নতুন অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন, নতুন অর্থনীতি হলো আর্থিক দিক থেকে সমাজকে প্রকটভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে দেবে। 'কার্যত দেখা যাচ্ছে যে সরকারী নীতি উন্নত প্রযুক্তি ইত্যাদির নাম করে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ রঙিন আশা সঞ্চার করে যে অবস্থাতে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা হবে আর্থিক দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত সমাজ, যার উপরের তলায় থাকবে বিত্তশালী একটি শ্রেণী, যারা তাদের জীবনযাত্রাতে পাশ্চাত্যদেশের ধনীজনের জীবনের মানে পৌঁছে গিয়েছে এবং যার নীচের তলাতে থাকবে একটা বিরাট জনসংখ্যা যারা জীবনধারণের নিম্নতম মানেও পৌঁছতে পারবে না।'[১৬] এই অর্থ-নীতিরই প্রতিফলন হিসেবে নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার দিক থেকে সন্তান, সমাজ ও দেশকে ভাগ করে দেবে। একদল থাকবে শিক্ষা পিরামিডের শিখরে—তারা আধুনিক সমুন্নত ও অগ্রসর শিক্ষার সর্ববিধ ধারাবর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে উপযুক্ত মানুষ হবে। তারা মান পাবে, অর্থ পাবে, তারা হবে এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। তারাই হবে একবিংশ শতকের ভারতসমাজের ক্যাপটেন। আর দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি পাবে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, অল্পশিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা। এই আলোকিত ক্যাপটেনরা রায় দেবে আর

শিখর ধারণকারী গোড়ার মানুষরা সেই রায় 'জো হুজুর' বলে মাথা পেতে নেবে।' মুষ্টিমেয় নবোদয়ের পেছনে গোটা দেশটাতে লাগবে পূর্ণগ্রহণের অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথও অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির এই পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে বলেছিলেন : অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে।[১৭] নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর জন্য এই ঐশ্বর্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা'। এর ফল বিষময়। শহরে, গ্রামে, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের তরবারি দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চালানো হবে। জনহিতকর একটা সরকারের হাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্মল তরবারির কাজ করে। তা নির্মল এই জন্য যে তা দেশের সকল সন্তানের মানুষ হবার পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করে দেয়। আর তরবারি এই জন্য যে তা এই পথ তৈরির ক্ষেত্রে যে-কোনো শত্রুবাধার শিরচ্ছেদ করে। অপর পক্ষে জনগণের শত্রুভাবাপন্ন সরকারের হাতে শিল্প-সংস্কৃতি ঘৃণ্য তরবারি হয়ে ওঠে। কারণ ঠিক বিপরীত কাজেই এই তরবারিকে সরকার ব্যবহার করে থাকে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে বলি দেয় অল্পসংখ্যক মানুষের স্বার্থের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চবর্গীয় শিক্ষাবিধির ঘোর বিরোধিতা করেছেন, সে বিধি ঘোরতর জোরদার হয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির নাম ধরে আজ পাকা হলো। দেশের লোকসভায় জনপ্রতিনিধিদের বৃহৎ এক অংশ জনসাধারণকেই বঞ্চিত করার এই শিক্ষানীতি পাশ করিয়েও ভারত রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে রাষ্ট্রনায়ক রূপেই বিরাজ করছেন।

ড. শুভংকর চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা : জাতীয় শিক্ষানীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র যুবমানসের জুলাই [১৯৮৬] সংখ্যায় প্রকাশিত হয় [পৃঃ ১০-১২]। এই লেখাটি 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি' শিরোনামে এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হলো। [সম্পাদক]

তথ্য নির্দেশ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২৬।

২. National policy on Education 1986—A presentation, ch. 2. 5.

৩. Ibid,

৪. Ibid, ch. 9. 2.

৫. Ibid, ch. 9.

৬. স্ত্রী শিক্ষা : শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৭।

৭. শিক্ষাবিধি : শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১৮।

৮. রাশিয়ার চিঠি / রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২য় খণ্ড।

৯. শিক্ষার বিকিরণ / শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২১।

১০. শিক্ষাসংস্কার : শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৭।

১১. শিক্ষার বিকিরণ : শিক্ষা / রবীন্দ্রনাথ, ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩।

১২. ঐ।

১৩. ঐ।

১৪. শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন : ভাষণ / রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৫।

১৫. শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসবে ভাষণ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬. ভবতোষ দত্ত, ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সের আলোচনা সভায় সমাপ্তি ভাষণ, অক্টোবর ১৯৮৫।

১৭. উপেক্ষিত পল্লী / রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৪।

প্রবীর নিয়োগী

রবীন্দ্ররচনার স্বত্ব ঃ সরকার বনাম বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র সৃষ্টির স্বরূপ ও স্বকীয়তা শেষ পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে কি? 'কপিরাইট' বা স্বত্ব বিলোপের দিন যত এগিয়ে আসছে এই প্রশ্নটি রবীন্দ্র সাহিত্য রসিকদের কাছে তত তীব্র হয়ে উঠছে। আর মাত্র পাঁচ বছর পর কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। সে বছরই অর্থাৎ ১৯৯১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার গ্রন্থ স্বত্বাধিকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। পুস্তক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রকাশন সংস্থাগুলি এখন সেই দিনটির অপেক্ষায়ই আছে। স্বত্ব-বিলোপের পরই তাঁরা রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের মহোৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। যেমনটা দেখা গিয়েছিল কয়েক বছর আগে শ্রীম কথিত 'কথামৃত' প্রকাশের সময়। রবীন্দ্র সাহিত্য রসিকদের আশংকা সেজন্যই। তাঁদের আশংকা স্বত্ব-বিলোপের পর থেকে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের যে মহোৎসব শুরু হবে, তাতে কবির অপরিমেয় সৃষ্টির কোনদিকগুলি বিপর্যস্ত হবে। সে কবিগুরুর সাহিত্যের দিকও হতে পারে, গানের দিকও হতে পারে। আমাদের আলোচ্য সাহিত্যের দিক নিয়ে।

১৯৯১ সালে যে কবিগুরুর সমস্ত রচনার 'কপিরাইট' বা গ্রন্থস্বত্ব বিলোপ হচ্ছে, তা বাংলার সুধীসমাজের অজানা নয়। অথচ এই নিয়ে কোন মহলেরই তেমন মাথাব্যথা নেই। এ ব্যাপারে যাদের সবচেয়ে বেশী মাথাব্যথার কারণ ছিল সেই বিশ্বভারতীরও তেমন কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে তাঁদের যে সব পদক্ষেপ নেবার কথা ছিল তা তারা আদৌ নেন নি। এ ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল সেটা অথাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীর সুসম্পাদিত ও সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করার কোন উদ্যোগ এতদিন পর্যন্ত তাঁরা নেন নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যাপারে যখন এগিয়ে এলেন, তখনই বিশ্বভারতীর কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। বরং চড়া রয়্যালটির বোঝা চাপিয়ে রাজ্য সরকার যে পরিমাণ গ্রন্থ ছাপার

পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা থেকে তাদের পিছিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য সম্প্রতি বিশ্বভারতী রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-স্বত্বলোপের পর রবীন্দ্র সাহিত্য অবিকৃত রাখার পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার গ্রন্থস্বত্ব বিলোপের পরও তার স্বরূপ ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে সবচেয়ে প্রধান কর্তব্য কি ছিল? এ ব্যাপারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের অভিমতই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। বামফ্রণ্ট সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক সেন প্রথম খণ্ডের কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেও সামগ্রিকভাবে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন এবং সুলভ মূল্যে রেশনকার্ডের মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী সরবরাহ করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। রেশনসপের মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী বণ্টন'—কথাটা যে সেন মহাশয় আক্ষরিক অর্থে বলেন নি বুঝতে কোন অসুবিধার কারণ নেই। তিনি প্রকারান্তরে রবীন্দ্র রচনাবলীর ব্যাপক প্রসারের কথাই বলেছিলেন। এবং ওই একই উদ্দেশ্য নিয়েই বামফ্রণ্ট সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সরকার যেভাবে এগিয়েছিলেন তাতে অধ্যাপক সেনের প্রস্তাব মত রেশনসপের মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী বণ্টন করা হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল খোদ বিশ্বভারতীই। এবার সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

পশ্চিমবাংলার মানুষের রবীন্দ্রপ্রীতি ও অনুরাগের কথা নতুন করে বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। একথা মনে রেখেই বামফ্রণ্ট সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হন। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পরই রাজ্য সরকার বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্ররচনার গ্রন্থ স্বত্বাধিকারী অন্য দু'টি সংস্থার কাছে একলক্ষ কপি ছাপার অনুমতি চাইলে তারা তা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এত কপি ছাপার অনুমতি দিলে নাকি বিশ্বভারতীর বই বিক্রি কমে যাবে, লোকসান হবে। রয়্যালটির হার নিয়েও তাঁরা দর কষাকষি করতে থাকে। অনেক টালবাহানার পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে ৫০ হাজার কপি রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপার অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত শতবার্ষিকী সংস্করণে বিশ্বভারতী ও অপর দু'টি সংস্থাকে রয়্যালটি বাবদ যে টাকা দেয়া হয়েছিল

সেই টাকাতেই রক্ষা হয়। রয়্যালটি বাবদ বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিকে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এছাড়াও কাগজ মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বাবদ বিপুল টাকা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিকে ও বিশ্বভারতীকে দিতে হয়[১]।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮ খণ্ডের তিন কিস্তিতে গ্রাহকদের দিতে হয়েছে মাত্র ৩২০ টাকা। এই সুলভ সংস্করণের জন্য রাজ্য সরকারকে ভরতুকী দিতে হয়েছে দু'কোটি টাকা। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এ ধরনের প্রয়াস রাজ্যের সাহিত্যামোদীদের অভিনন্দন পেয়েছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরই সুধী মহলের কাছ থেকে তো বটেই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহক হওয়ার জন্য আবেদন আসতে থাকে। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য রাজ্য সরকার পুনরায় বিশ্বভারতীর শরণাপন্ন হন। আরো ৭০ হাজার কপি রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের অনুমতি চাওয়া হয়। বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় জানান, গ্রন্থ-বিভাগের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থেই আর ছাপার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। আর ছাপার অনুমতি দিলে বিশ্বভারতীর আর্থিক ক্ষতি হবে। ৫ হাজার নয়, আর বড় জোর ২০ হাজার কপি ছাপার অনুমতি দিতে পারেন এবং তার জন্য রাজ্য সরকারকে ২০ শতাংশ রয়্যালটি দিতে হবে। যে রাজ্য সরকার ভরতুকী দিয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেছেন তার পক্ষে ২০ শতাংশ রয়্যালটি দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। সেটা বিশ্বভারতীও ভালই জানে। রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপার অনুমতি না দিতেই এই অসম্ভব চড়া দাম হাঁকিয়ে বসেছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

যে সময় এই সব ঘটনা ঘটেছে কেন্দ্রে তখন জনতা সরকার। এর পর ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন পুনরায় ক্ষমতায় এলেন এবং বিশ্বভারতীর আচার্য-পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে অতিরিক্ত রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন।[২] চিঠিটির পূর্ণবয়ান এইরকম :

৫ অক্টোবর, '৮২

ডি. ও. নং ১৪৪৬ শিক্ষা (য) ৫৭

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণের কাছে বণ্টনের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ সেট রবীন্দ্র রচনাবলী ভরতুকী দিয়ে কম দামে পুনর্মুদ্রণের কাজ হাতে নিয়েছেন। ১৬ খণ্ডের এই প্রতিটি সেটের দাম পড়বে ৩২০ টাকা। দু'টি খণ্ড এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ বাবদ প্রধান দুই সত্ত্বাধিকারী বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিকে যথাক্রমে ১০,৬২,৫০০ টাকা ও ৫,৩১,২৫০ টাকা রয়্যালটি দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্ররচনার সস্তা সংস্করণের জন্য জনসাধারণের চাহিদা যেহেতু খুবই বেশী, তাই বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে প্রথমবারের ৫০,০০০ কপির মত একই রয়্যালটিতে যেন আরো ৫০,০০০ সেট রবীন্দ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেয়া হয়। পরে উপাচার্য রাজ্য সরকারকে জানান যে ১২ লক্ষ টাকার রয়্যালটির বিনিময়ে আরো ২০,০০০ সেট পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। বিশ্বভারতী এবার রয়্যালটি অনেক বেশী চাওয়ায় কেনন, প্রথমবারের ৫০,০০০ সেটের জন্য ১০,৬২,৫০০ টাকার পরিবর্তে এবার ২০,০০০ সেটের জন্য ১২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে—রাজ্য সরকারের পক্ষে বিশ্বভারতীর প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্য জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে রাজ্য সরকার আরো ৫০,০০০ সেট পুনর্মুদ্রণের বিশেষ আগ্রহী বলে বিশ্বভারতীর আচার্য হিসেবে আমি আপনার কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর আরো ৫০,০০০ কপি মুদ্রণের রয়্যালটি প্রদান মঞ্জুর করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুকূলভাবে বিবেচনা করতে আবেদন জানাই।

ধন্যবাদান্তে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী — ভবদীয়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী — এস. ঘোষ

(স্বাক্ষর)

উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ভেবেছিলেন, আচার্য হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য সরকারের আবেদন মঞ্জুর করে আরো ৫০ হাজার রচনাবলী ছাপার অনুমতি দেবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ওই চিঠির

কোন জবাবই দেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অতিরিক্ত ৫০ হাজার কপি রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপার অনুমতি দিলে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিক্রি কমে যাবে—আর্থিক ক্ষতি হবে বলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয় আর্থিক মুনাফালাভই তাদের লক্ষ্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার নয়।

রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থস্বত্ব লোপের পর বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশন সংস্থা যাতে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের মহোৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্বকীয়ত্ব বিকৃত করে তুলতে না পারে, তার জন্য বিশ্বভারতীকেই ঘরে ঘরে রবীন্দ্র রচনাবলী পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল কিন্তু এতদিন তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে নি। বিশ্বভারতীর সব দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেয়ার ৩২ বছর পর পর্যন্ত তাঁরা সুসম্পাদিত ও সুলভ রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কোন উদ্যোগ নেন নি। অতি সম্প্রতি তাঁরা রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিকই, তবে তা সুলভ কিনা তা তার গ্রাহকমূল্যের হার থেকেই অনুমেয়। ১৬ খণ্ডের রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্য বিশ্বভারতী গ্রাহকমূল্য ধার্য করেছেন ৩০০ টাকা করে দু' কিস্তিতে ছশ' টাকা। সেখানে রাজ্য সরকারের ১৬ খণ্ডের গ্রাহকমূল্য মাত্র ৩২০ টাকা। বিশ্বভারতীর সব দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তখন আরো সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী সরবরাহ কি খুবই অসম্ভব ছিল? মোটা টাকা গ্রাহকমূল্য ধার্য করে রবীন্দ্র রচনাবলীকে সুলভ করা দূরে থাকুক, দুর্লভই করে রাখা হল। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মহান শিল্পী ও সাহিত্যিকই ছিলেন না। শিক্ষা সমাজ সংস্কার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কোন দেশে কোন কালে কোন শিল্পীকে বড় একটা নিতে দেখা যায় নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন কোন সংকট ছিল না যা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। এ সব ব্যাপারে তিনি যেসব প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার সংখ্যা হাজারের নিচে নয়। জীবনে তিনি কম করে ১২ বার বিদেশে গেছেন। যেখানেই গেছেন সেখানেই শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক ও মনীষীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, আলাপ করেছেন। ফ্রয়েড, আইনস্টাইনের

মত প্রতিভাধরদের সঙ্গেও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে। সেই সব আলোচনার লিখিত দলিলও আছে।[৩] কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কবির মৃত্যুর পর ৪৫ বছর কেটে গেলেও সেই সব চিঠিপত্র, আলোচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। কবির জীবদ্দশায় অজস্র চিঠিপত্র সমসাময়িক বাংলা দৈনিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কবির জন্ম শতবর্ষের পরও ওই চিঠিপত্রের একাংশও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। এইসব চিঠিপত্র রবীন্দ্র ভবনের মহাফেজখানায় এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে তিলক, মালব্যজী, অ্যানি বেশান্ত, গান্ধী, মহাদেব দেশাই, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের কাছে লেখা চিঠিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তারবার্তাও আছে। নানা দিক থেকেই সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এই চিঠিগুলি একেকটা ঐতিহাসিক দলিল। জাতীয় সম্পদ বটে। এগুলির মধ্যে ইংরেজ সরকারের পীড়নের বিরুদ্ধে রাজপুরুষদের কাছে লেখা চিঠিপত্রও আছে। এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় কবির অনেকগুলি দিকই দেশের মানুষের কাছে অজানা থেকে গেছে।

আরেকটি ব্যাপার খুবই দুঃখজনক যে রবীন্দ্রনাথ এখনো বাঙ্গালী কবি হয়েই রয়ে গেলেন। তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য কৃতিত্ব তো বটেই, মনীষী চিন্তাশীল হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর যে ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে অন্য রাজ্যের মানুষের খুব একটা ধারণাই নেই। কেন নেই? তার কারণ বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের অপ্রতুলতা। রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ইংরেজীতে ১২ খণ্ডের একটি রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করা গেলে এ কাজে অনেকটা এগুনো যেত। কিন্তু তার কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি। দিল্লীতে 'Publication Division of India বলে ভারত' সরকারের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা আছে। সেখান থেকে সুলভে যেমন গান্ধীজীর জীবনী এবং তাঁর রচনা সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কি রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করা যেত না? কেন্দ্রীয় সরকারতো বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের সাহায্যেই কবির এ সব গ্রন্থ সুলভে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। কপিরাইট চলে যাবার আগেই যখন তাঁরা এ সব উদ্যোগ নেন নি, তখন কপিরাইট চলে যাওয়ার পর এসব বই কারা ছাপবে? অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কি দশা হবে তা কে জানে!

সূত্র-নির্দেশিকা

১. সব মিলিয়ে বিশ্বভারতীকে দেয়া হয়েছিল ১০,৬২,৫০০ টাকা। রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটিকে ৫,৩১,২৫০ টাকা।

২. ৫ অক্টোবর ১৯০২ সালে চিঠিটি লেখা হয়। ডি. ও নং ১৪৪৬—শিক্ষা (ম) ৫৭।

৩. আইনস্টাইনের সংগে কবিগুরুর কথাবার্তার লিখিত বিবরণ রেখেছিলেন প্রয়াত কবি অমিয় চক্রবর্তী।

গঙ্গানারায়ন চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-পল্লীভাবনা ও আজকের পঞ্চায়েতীরাজ

বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রাণের প্রতি অনুরাগ রবীন্দ্রমানসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে তাঁর উত্তর জীবনে 'যথার্থ রবীন্দ্রনাথে' পরিনত করেছিল। পল্লীপ্রকৃতিই তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল দেশ-মাতৃকার। তাই তিনি পল্লী প্রকৃতিকে ভাল বাসতে গিয়ে পল্লীবাসীকে ভালবেসেছিলেন হৃদয় দিয়ে। সৌন্দর্য-প্রিয়তা কবির সহজাত প্রকৃতি হলেও বাস্তবের অনুভব ও তার প্রকাশের সাক্ষর তার সৃষ্টিধারা, কর্মধারার বিশাল আয়তন জুড়ে বিদ্যমান। কবি তাঁর ভাবনাগুলিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর বিশাল বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যে, যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে, নাটকে, গানে, সাহিত্য সম্ভারে শিক্ষা বিকাশে এবং গ্রাম উন্নয়ণ কর্ম যজ্ঞে। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল তাঁর রোমান্টিক কাব্য সোনারতরী, চিত্রা ও চৈতালীর রচনাকাল, অথচ এই সময়-কালেই রচিত 'গল্পগুচ্ছের' গল্পে দেখা যায় গ্রাম বাংলার মর্মস্পর্শী চিত্ররূপের উদ্ঘাটন; বাস্তবতার অনুভূতি। তিনি শুধু ভাবুক কবির দৃষ্টি দিয়ে পল্লীবাসীদের দেখেননি—দেখেছিলেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে।

১

রবীন্দ্রমানসে পল্লীভাবনার বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ঠাকুর বাড়ীর কড়িবরগার চার দেওয়ালের বাইরে একবার এসেছিলেন পেনেটির বাগান বাড়ীতে, পরবর্ত্তীকালে কৈশোরে পিতার সঙ্গে বোলপুর এবং হিমালয় ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের সঙ্গে একবার শিলাইদহেও গিয়েছিলেন। কিন্তু পল্লীবাংলার প্রকৃতি, পল্লীবাসী এবং পল্লীসমাজের সঙ্গে তখনো তাঁর স্থায়ী অথবা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেনি, ১৮৯১ সালে জমিদারীর ভার গ্রহণ করার পরেই তাঁর সুযোগ হল বাংলা দেশের একটি অঞ্চলের পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের। এই সময় তিনি পল্লীর মানুষ, নিসর্গ ও সমাজকে নূতন করে এবং গভীর ভাবে দেখতে পেলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভৌগোলিক, সমাজতাত্ত্বিক অথবা অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোন থেকে শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর অঞ্চলের নিসর্গ ও মানুষকে দেখেননি—দেখেছিলেন কৌতূহল ও সহমর্মিতার দৃষ্টি নিয়ে। তাই তিনি যতদিন পল্লীতে ছিলেন, ততোদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পল্লীর মানুষদের সুখ দুঃখ ও তার কার্যকারণগুলির সম্পর্কেও ধীরে ধীরে সম্যক ধারণা তৈরীর সুযোগ লাভ করেছিলেন।

গ্রামের ছুতোর, কামার, কলুর চেয়ে তাঁর অনেক বেশী চোখে পড়েছে চাষীদের। তারা নদীর ধারের মাঠে চাষ করে মাঝে মাঝে গরুকে জল খাইয়ে নেয় নদী থেকে।[১] শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসর অঞ্চলে নিসর্গের পাশাপাশি বিপুল মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থান কালে কবির সামনে এক নূতন জগত উন্মোচিত হয়েছিল, পল্লীর-নরনারীর প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, পল্লীনিসর্গ সমাজ এবং অর্থনীতি সবকিছুই কবির পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিপুল যোগাযোগ তাঁর অভিজ্ঞতাকেই শুধু প্রসারিত করেনি, তাঁর মনকেও মুক্তি দিয়েছিল শহরের ক্ষুদ্র সীমানার নিরস বন্ধন থেকে।

পল্লীজীবনের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বে এই পল্লীসমাজ ও তার অর্থনীতির ব্যাপক এবং গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাতে পুরানো সমাজ কাঠামোর অবক্ষয় কবিকে বিচলিত করেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নূতন ব্যবস্থায় গ্রামের আলো নিভে গিয়ে শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলে উঠেছে। সে গ্রাম আজ শুকিয়ে গেছে।[২] বিত্ত, বিদ্যা, সম্মান এখন মুষ্টিমেয় শহরবাসীর হাতে।[৩]

'বর্তমান সভ্যতার এক‌জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে, আর একজায়গায় ভিন্ন একদল মানুষ সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্যদিকে ধনের সম্মান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। ফলে আরাম, আরোগ্য, আমোদ শিক্ষার ব্যবস্থাও শহরে কেন্দ্রীভূত। পল্লীর নিকট এই ভোগের যা কিছু পৌঁচায় তা উচ্ছিষ্ট মাত্র।[৪]

নগর ও পল্লীর মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তা গ্রাম বাংলার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে। তাই দেখা যায় ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি পল্লীসমাজ ও পল্লী-অর্থনীতির সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তাঁর এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার একটি মাত্র অনুচ্ছেদের শেষ অংশটুকু অনুধাবন করলে তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে না : ......যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা তাহাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে, তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলো অতিথির মত আসে এবং কুটম্বের মত রহিয়া যায়। ডিপথিরিয়া রাজ যক্ষা, টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি একস্প্রয়েটেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি, আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার অর্পন করিয়া বসিয়া থাকি।[৫]

কবি তাঁর এই বক্তৃতায় পল্লীসমাজের অন্তর ও বাইরের দৈন্যদশার চিত্ররূপ আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর এই সচেতনতা নিয়েই পল্লীর আরও কতকগুলি প্রাত্যহিক অভাব, অভিযোগ ও দুর্দশাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন পল্লীর নিশ্চেষ্ট মানুষ বছরের পর বছর জলকষ্ট সহ্য করে, মেয়েরা চার পাঁচ মাইল উত্তপ্ত বালুর মধ্যদিয়ে হেঁটে গিয়ে জল আনে।[৬] কখনো আগুনে গোটা পাড়া ভস্ম হয়ে যায়, তবু পল্লীবাসীরা নিজেদের বাড়ীর কাছে একটা কূপ খনন করে নেয় না।[৭]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার সংস্পর্শে এসে গভীর ভালবাসা ও সহমর্মিতা নিয়ে পল্লীবাসীদের দুঃখ দুর্দশা, অশিক্ষা, কুসংস্কার পশ্চাৎপদতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রামের মানুষের ভাবনা তাঁর হৃদয়কে করেছিল ব্যথিত মথিত, তাই তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের কথায়, তাদের হিতকামনায়। পল্লীসমাজ তথা দেশকে একান্ত আদরের ধন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন : দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি......ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।[৮] রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে স্বদেশেই প্রবাসী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে এসে

জমা-ওয়াশীলের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে তিনি স্বদেশকে সম্যকরূপে দেখতে পান, চিনতে পারেন আপন অন্তরসত্তা দিয়ে। স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে তাঁর ধারনা বিপুলভাবে পাল্টে যায়। পরাধীনতা বলতে তিনি বুঝেছিলেন 'পরজাতির অধীনতাই বোঝায় না'[৯], বিরাট দেশ ব্যাপী উন্নতি, বা অধঃপতনেই আছে দেশের সত্যকারের উন্নতি কিংবা অবনতি। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন 'তাঁর সমাজ,—স্বদেশের মতই মাটি দিয়ে গঠিত নয়', মানুষ দিয়ে নির্মিত। আসলে যে মূল সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাহল, গ্রামই দেশ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের মানুষের উন্নতি ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামকে বাদ দিয়ে যে উন্নতি তা অপূর্ণ ও অবাস্তব। তাই দেখা যায় তাঁর 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধে এই কঠিন সত্যের উক্তি, তিনি বলেছেন : দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কনা কনা জোনাকীর আলো গর্ব্বে পড়ে সরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই অন্তত অমরা আছি পুরা বেঁচে তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকে টানে।[১০]

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই সময়ে কবি মন গজদন্ত মিনার থেকে সাধারণ মানুষের সমাজের মধ্যে নেমে এসেছিলো। তাদের দিয়ে বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে সুরু করেন। কি ভাবে কেমন করে তাদের এই মরণদশা থেকে বাঁচান যায়, সেই চিন্তা এই সময় থেকেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাধ্যানুসারে তিনি এই দরিদ্র মানুষদের উন্নতির চেষ্টা করবেন। এই প্রেরণা বশত সাময়িক কালের জন্য হলেও কবিত্বের পথ ছেড়ে কর্মের পথে নিজের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে প্রকৃতি মানুষ ও সমাজ তাকে যে সত্যের সন্ধান দেয় তাই তাকে বাধ্য করে, **'to come out of the Seclusion of my literary career and take part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me and the text which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it.'**[১১]

গ্রাম বাংলার সংযোগ, গ্রামীন মানুষের প্রতি তার সর্বব্যাপী সহানুভূতি, সেই সঙ্গে গ্রামীন মানুষের অনন্ত দুর্দশা ও সমস্যার কথা উপলব্ধি করে কবি সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, কিংবা রাজনীতিবিদ এসবের কিছুই না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশের বৃহত্তর সমাজের সমস্যাবলী যেমন দেখেছেন এবং সে সবের সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

২

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী

পল্লী-পুনর্গঠনের কাজ রবীন্দ্রনাথ সুরু করেছিলেন ১৯০০ সালে শিলাইদহ অঞ্চলে। সে সময় একজমিতে একাধিক ফসলের কথা তিনি চিন্তা করে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। এসময় পরিকল্পিতভাবে গ্রামোন্নয়ণের ধারাবাহিক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি। সমবায়ভিত্তিক চাষ ও সমবায়ব্যাঙ্কের কথা তিনি ভেবেছিলেন। পাশ্চাত্যভ্রমন কালে তার ধারণা জন্মেছিল সমবায় প্রথাই গ্রামীন জীবনের দুর্দশা লাঘবের একমাত্র উপায়। পরবর্ত্তীকালে পতিসরে, পরে শিলাইদহে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলেই কৃষিকাজে ট্রাক্টর, পাম্পসেট প্রচলন করেন ১৯১০ সালে। এবং সেসময়েই উন্নত মানের অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহারও করেন। একাজে তাকে সহযোগিতা করেছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। চাষীদের মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯০৫ সালে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯১৪-১৫ সালে তাঁর তিনটি পরগনাতেই ব্যাপকভিত্তিতে গ্রামউন্নয়নের পরিকল্পনা নেন। এবং নোবেল পুরস্কারের সব টাকাই কৃষিব্যাঙ্কে নিয়োজিত করেন। কৃষি ও কুটীর শিল্পের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, পথ-ঘাট সংস্কারে ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদির কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যবস্থা নেন। কয়েকবছরের মধ্যে ব্যাঙ্ক-ঋণ অনাদায়ের ফলে কৃষিব্যাঙ্কগুলি ফেল হয়ে যায়। তবুও তিনি হতাশাগ্রস্ত হননি। শান্তিনিকেতনে এসে নূতন করে আবার গ্রামোন্নয়নের কাজে হাতদেন।

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ এলমহার্ষ্টের সহযোগিতায় ব্যাপক ভিত্তিতে শ্রীনিকেতনে গ্রাম উন্নয়নের যে উদ্যোগ নেন, সেই কার্যধারা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি একটা কর্মসূচীর চিত্র পাওয়া যায়। তাহল: ১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রসারণ ব্যবস্থা। ২. সালিশির মাধ্যমে গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা। ৩. স্থানীয় শিল্পের উন্নতি ও স্বদেশী জিনিসের প্রচলন। ৪. বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চা। ৫. বিধিমুক্ত প্রকৃতি নির্ভর-শিক্ষাধারার প্রবর্তন। ৬. প্রতি পল্লীতে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন। ৭. পানীয় জল নদী-নালা পথ-ঘাট সংস্কার ও জন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান। ৮. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও খামার স্থাপন। ৯. দুর্ভিক্ষ নিবারণী ধর্মগোলা। ১০. শিল্পকর্মে স্ত্রীলোকদের প্রশিক্ষণ। ১১. মাদকদ্রব্য বর্জনের উদ্যোগ। ১২. পল্লীর ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ। ১৩. পল্লীর মিলন মন্দির। ১৪ জেলা সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি ও সভাসমিতির কাজের সমন্বয় সাধন, সংযোগ ও সহযোগিতাবৃদ্ধি করা। ১৫. ব্রতী বালক সংঘ গঠন ইত্যাদি। এই কর্মসূচীগুলি প্রধানত রূপায়িত হয়েছিল শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করেই।

১৯১২ সালে রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়ীটি দশ হাজার টাকায় কিনে তা সংস্কার করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল করার লক্ষ্যে আবার নূতন করে গ্রাম উন্নয়নের কাজে ব্যাপকভাবে হাত দেন ১৯২২ সাল থেকে অবশ্য এর বহু পূর্বে ১৯১৩ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সন্তোষ মিত্রকে সুরুলের কুঠি বাড়ীতে থাকতে পাঠান। সেই সময় থেকে চাষের কাজ সুরু হয়। সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা। কবি অবশ্য এর অনেক আগেই পুত্র রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে মার্কিন দেশ থেকে কৃষিবিদ্যা ও গোপালন বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়ে এনেছিলেন।[১২]

১৯২১ সালে লেনার্ড এলমহার্ষ্ট আসেন শান্তিনিকেতনে। এবং প্রকৃত-পক্ষে তিনি আসার পর থেকেই শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রামউন্নয়নের কাজ সুরু হয়। এলমহার্ষ্টের সহযোগী ছিলেন শান্তিনিকেতনের দু'জন শিক্ষক, কালীমোহন ঘোষ ও গৌর গোপাল ঘোষ। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শান্তিকেতনের দশটি ছাত্র এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে শ্রীনিকেতনের নাম পাওয়া যায়, কবে কিংবা কখন শ্রীনিকেতন নামকরণ হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা নেই। এর আগে গ্রাম উন্নয়নের কাজের জন্য কবি যে সংগঠন তৈরী করেছিলেন তার নাম ছিল 'সুরুল সমিতি।' কাজ

পরিচালিত হত সুরুল কৃষিবিভাগের অধীনে। এলমহার্স্ট বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন সেইটাই ঠিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমাজ মিলেই গ্রামের উন্নতি করতে হবে। গ্রামকে সবদিক থেকে দেখা ও গ্রামের সার্বিক উন্নতির পরিকল্পনা শ্রীনিকেতনের অবদান। বলা যেতে পারে গ্রামোন্নয়নের কাজে গবেষনার গুরুত্ব শ্রীনিকেতন বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিল। শ্রীনিকেতনেই এলমহার্স্ট গবেষনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সুরু করেন। ১৯২৩ সালে প্রথম শ্রীনিকেতনে ডিস্‌পেনসারির পত্তন হয় এবং গঠিত হয় স্বাস্থ্য সমবায়। এই কাজ শুধু মাত্র শ্রীনিকেতনেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, অন্যান্য গ্রামেও এই কাজ ছড়িয়ে দেবা হয়েছিল। শ্রীনিকেতন ছিল সমস্ত কাজের কেন্দ্র ও উৎস। অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, ডাক্তার, ধাত্রীশিক্ষা ও গ্রামীন শিল্পের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এখান থেকেই নানা ভাবে কাজ করতেন। গ্রামের কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এঁদের কাছে আসতেন এবং শিক্ষা ও সমাধান সূত্র নিয়ে ফিরে গিয়ে নিজ গ্রামে কাজ করতেন।[১৩] ১৯২৪ সালে কালীমোহন ঘোষের তত্ত্ব-বধানে তিনটি একমাস ব্যাপী ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছিল, ৩৪ জন শিক্ষানবিশ যোগ দিয়েছিলেন আশে পাশের ২২টি গ্রাম থেকে। এছাড়া শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে চার রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালুকরা করা হয়েছিল : ১. শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় (১৯২৪)। ২. গ্রামের কিশোরদের জন্য 'লোক শিক্ষা সংসদ' (১৯৩৬)। ৩. গৃহস্থদের জন্য 'শিক্ষাচর্চা ভবন' (১৯৩৭)। ৪. প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্য এবং পল্লী সংগঠন প্রণালীতে ডিপ্লোমাকোর্স (১৯২২ থেকে) কলেজের ছাত্রদের জন্য।[১১]

শ্রীনিকেতন তার পরিধি কতটা বিস্তৃত করবে এসম্পর্কে কোন নিখুঁত ও পরিষ্কারভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে তার কোন সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। শ্রীনিকেতনের কাজ সুরু হবার ১০ বছর পরেও দেখা যায় শ্রীনিকেতনের কর্মী সংখ্যা ছিল ২৪ জন এবং বাৎসরিক আয় ছিল ৫০,০০০ টাকা। এই দশ বছরে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় কোষ তৈরী হয়েছিল, ১৯২৭ সালে। ১৯৩১ সালের মধ্যে এই কোষের অধীনে বীরভূমের তিনটি থানা আনা হয়েছিল, যার জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। মোট ২০০টি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সময় কালে। চাষীদের ঋণ দান, ধর্মগোলা ইত্যাদির কাজে এই সমবায়গুলি নিযুক্ত ছিল। এই এলাকাগুলি ছিল শ্রীনিকেতনের

বিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র। এই এলাকার আন্দাজ ৩৫ বর্গমাইল (Intensive) নিবিড় কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছিল সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোন থেকে। এ কাজের জন্য ১২টি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়। বল্লভপুর তাদের মধ্যে একটি গ্রাম। এই নিবিড় কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল—গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন। গ্রামের মধ্যে থেকে গ্রামের পরিবর্তন আনা—দূর থেকে উন্নয়ন নয়।[১৫]

কিন্তু ১৯৩০ দশকের শেষের দিক থেকেই শ্রীনিকেতনের কার্যধারার মূলগত পরিবর্তন ঘটে। গ্রামকে স্বনির্ভর করার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এর বহুবিধ কারণের একটি হল রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর বিরাট ঋণের বোঝা। দেনার দায়ে তিনি তাঁর বইয়ের স্বত্ব স্বল্পমূল্যে ছেড়ে দিতে শুরু করেন। নিজের আঁকা ছবি একের পর এক বিক্রী হয়ে যায়। স্ত্রীর সঞ্চিত অলংকার এই চোরা স্রোতের টানে হারিয়ে যেতে থাকে। তাই অনুমান করলে ভুল হবেনা, কবি শ্রীনিকেতনের কাজের মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই শেষদিকে দু একটি গ্রামকে বেছে নেয়া হয়েছিল উন্নয়নের কাজের জন্য। তাও সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়েছিল। শ্রীনিকেতনকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল অর্থকরি প্রতিষ্ঠানে। তবুও আজকের পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা গভীরভাবে আমাদের মনে রেখাপাত করে। কারণ তিনি যে কাল পর্বে (একশো বছর আগে) এই গ্রাম উন্নয়নের উদ্যোগ নেন, তখনো পল্লী-পুনর্গঠনের ধারণা ও তার বাস্তবায়নের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। গ্রামজীবনের নিদারুন পশ্চাৎপদতার মূলীভূত কারণগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মত এমন করে কেউ চিন্তা করেননি। পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ তো দূরের কথা। রবীন্দ্র-সমকালে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী। অবশ্য পরে গান্ধীজি, তারও পঞ্চাশ বছর পরে ভারত সরকার পল্লী উন্নয়ন কাজের চিন্তাভাবনা করেছিল।[১৬] প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের মত পল্লী, কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশে সমবায়ভিত্তিক চাষ আবাদ, যৌথ খামার, কুটীর শিল্পের প্রসার, শিক্ষা বিস্তার—সামগ্রিকভাবে পল্লী-পুনর্গঠনের স্বাবলম্বী নীতি গ্রহণ ব্যতীত গ্রামজীবনের তথা ভারতবর্ষের উন্নতির কোন বিকল্প পথ নেই, কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ এই সার-সত্যটুকু বহু পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করে কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তার এইটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

৩

আজকের পঞ্চায়েতীরাজ

রবীন্দ্র-ভাবনায় যে মূল সত্যটি ধরাপড়েছিল, তা হল গ্রাম ও নগর জীবনের অসমবিকাশ। এবং গ্রামীণ বিকাশের লক্ষ্যেই তিনি কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও লক্ষ্য ছিল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি সাধন করা। আজকের পঞ্চায়েতী কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই, তবে কর্মসূচী ও তার প্রয়োগে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। আজকের পঞ্চায়েতী কাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রামীণ ও নগর জীবনের অসম বিকাশ দূরীভূত করা। গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ সাধন। গ্রামের মানুষ নিজেদেরকে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এইসব লক্ষ্য নিয়ে পঞ্চায়েতী রাজের পত্তন হলেও সুরুতে তার কোন গতিশীলতা ছিলনা—ছিলনা কোন কার্যকর ভূমিকা। এরাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজের কাজকর্মে চঞ্চলতা দেখা যায় ১৯৭৮ সালের পর। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে (গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ) ছাপান্ন হাজার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। গ্রাম পুনর্গঠনের প্রশ্ন রাষ্ট্র ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সহযোগিতার যেমন একটা স্থান আছে, তেমনি রাজনৈতিক মনন ও মানসভিত্তিক নির্বাচন এবং দ্বন্দ্বেরও একটা স্থান আছে। কারণ, সংসদীয় গনতন্ত্রে নির্বাচন হল একটি দ্বিমুখী স্রোতধারা। প্রথম ধারার লক্ষ্য উন্নয়নশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নেতৃত্ব, যে ধারায় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে হয় যে সংসদীয় গণতন্ত্রে 'অসম বিকাশ' তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কারণ উন্নয়নশীল পরিকল্পনার মধ্যেই অসমবিকাশের মূলবীজটি নিহিত থাকে। তবে পরিকল্পনাগুলি যদি গণমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত ও বাস্তবায়িত হয়, তবে প্রান্তিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের কিছুটা প্রতিফলন ঘটে। আজকের পঞ্চায়েতীরাজ সেই লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর এবং তাতে বেশ কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে, অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

গ্রাম উন্নয়নের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যে মূল ভাবনা ছিল অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্তি, সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা, আজকের পঞ্চায়েতীরাজের বাস্তবধর্মী পরিকল্পনার ও রূপায়নের লক্ষ্যও তাই। বিকাশমুখী গ্রামীণ

পরিকল্পনার কর্মোদ্যোগে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এক স্বয়ম্ভর অর্থনীতির-ভিত্তি-গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু সঠিক গ্রাম উন্নয়নের প্রশ্নে সামগ্রিক পরিপূর্ণতা আশা করা সম্ভব নয়। তার কারণ, যে সকল বাধা-বিপত্তি রবীন্দ্রযুগে ছিল, আজও বহুলাংশে তা বর্তমানে। রবীন্দ্রযুগেও ভূমি-ব্যবস্থা যেমন গ্রাম উন্নয়নের অন্তরায় ছিল, আজও তা বিদ্যমান। তবে উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার ও বন্টনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক ক্ষেত্রে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। জনস্বাস্থ্য আজও বিশেষ অগ্রসরতালাভ করেনি। তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে আজকের পঞ্চায়েতী রাজের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। রবীন্দ্র-ভাবনায় যে শিক্ষার প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল, আজকের পঞ্চায়েতীরাজ সেদিক থেকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছে। ঘটেছে সমবায় প্রথার প্রসার। এ-রাজ্যের মানুষের গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির ভূমিকাটিকে পঞ্চায়েতীরাজ গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, বলা চলে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গ্রাম এলাকায় সীমাবদ্ধতার মধ্যে বর্তমান পঞ্চায়েত-গুলি দীর্ঘকালের স্থবিরতা কাটিয়ে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে এবং বেশকিছু স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চায়েতীরাজের কর্মযজ্ঞের, পর্যাপ্ত না হলেও, সুফলগুলি গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে, একথা অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। ষাটের দশক, এমন কি সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধেও এ-রাজ্যের গ্রামজীবনের যে অবস্থা ছিল, আজ তার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রযুগের সামন্তবাদী ব্যবস্থার কোন মৌলিক পবিবর্তন আজও 'ঘটেনি', ফলে সার্বিক উন্নয়ন পদে পদে ব্যহত হচ্ছে, একথা স্মরণ রাখাদরকার। সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকার ও গ্রামের মানুষেরই নয়, দায়িত্ব নিতে হবে গোটা সমাজকে।

সূত্র নির্দেশ

১. পত্রসংখ্যা ৪১, ছিন্ন পত্রাবলী, পৃঃ ১১৩।

২. পল্লীসেবা, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।

৩. পল্লী উন্নতি / ঐ / পৃঃ ৫০২।

৪. উপেক্ষিতা পল্লী / ঐ / পৃঃ ৫২৯।

৫. সভাপতির অভিভাষণ / পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন, আত্মশক্তি ও সমূহ / ঐ / দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮২১।

৬. সম্ভাষণ, পল্লীপ্রকৃতি / রবীন্দ্ররচনাবলী / জ. শ. সংস্করণ / দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮।

৭. পল্লী-উন্নতি, রবীন্দ্ররচনাবলী / জ. শ. বার্ষিকী সংস্করণ / ত্রয়োদশ খণ্ড / পৃঃ ৫০৩ / শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ।

৮. অভিভাষণ, আত্মশক্তি ও সমূহ / র. জ শ. ব. সংস্করণ / দ্বাদশ খণ্ড / পৃঃ ৮১০।

৯ অভিভাষণ, র. র জ. শ ব সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩।

১০. পল্লী প্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী / ঐ / ঐ / পৃঃ ৫৩০-৩১।

১১. The Religion of Man. P. 165.

১২ রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠন-চিন্তা ও শ্রীনিকেতনের কাজ: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বাংলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চা ১৮১৮-১৯৪৭: সেমিনার পেপার ১৯৭৮। উমাদাশগুপ্ত'র নিবন্ধ।

১৩. ঐ।

১৪. ঐ।

১৫. ঐ।

১৬ K. Kripalani : Rabindranath Tagore, P. 148.

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে—যার পর গত ৪৫ বছর ধরে রবীন্দ্রচর্চা নানা পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে এক একটি লক্ষ্যের দিকে চলেছে। আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কিছু কিছু স্মৃতি এখনো আবছা মনে পড়ে। তখন রবীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকো পরিবারের ভূমিতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দোসর হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা চলত। এই কথাটি তাঁর বিশেষ বিশেষ কবিতার আবৃত্তি, বিশেষ বিশেষ প্রহসন ও কাব্যনাট্যের অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হ'ত যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সনাতন আদর্শের তল্পিবাহক ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যও মূলত একান্ত ভাববাদী। ৬০-এর দর্শক থেকে ঐ চিন্তাধারার মূল বাহক ছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ও রবীন্দ্রমেলা, তাছাড়া রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি এবং বিশ্বভারতীতো ছিলই। ঐ ৬-এর দশকে একদল প্রগতিশীল সমালোচক রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে গভীরে দৃষ্টি মেলে অন্য রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে ফেরার চেষ্টা করেন। নেপাল মজুমদার [১] তাঁর সুবৃহৎ 'জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সাহায্যে রবীন্দ্রজীবন কর্মের এক প্রতিবাদী সচল মানসিকতা উদ্ঘা নে সচেষ্ট হন। এরপব সত্তর-এর দশকে যখন সঙ্কীর্ণতাবাদী নকশালপন্থীরা রবীন্দ্র রচনার বহ্নুৎসবে মেতে ওঠে তখন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কেবল যে রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন তা নয়, তাঁকে আশ্রয় করেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাঁচবার পথ খুঁজে পান। ১৯৭৫-এ জরুরীঅবস্থা জারী এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই কালপর্বে তথাকথিত দেশপ্রেমিক কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কেবল মার্কস, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের নির্বাচিত রচনা সেন্সর করেই বসে থাকে নি, তারা যথেচ্ছভাবে রবীন্দ্ররচনাকে সেন্সর করেছেন। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'মাটির কাছাকাছি' কবি হয়ে যান এবং ব্যাপক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আলোচনার মাঝে এসে দাঁড়ান।

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রচর্চার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে বর্তেছে গণতান্ত্রিক শক্তি-

গুলির ওপর। এখন আর রবীন্দ্রমেলা অনুষ্ঠিত হয় না ভাববাদীদের দ্বারা, পক্ষান্তরে বামফ্রন্ট সরকারকে রবীন্দ্রমেলার ব্যাপক আয়োজন করতে দেখি। এ-ও লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা ও পানীয়জলের সু-সরবরাহের গ্যারান্টি দিতে। রবীন্দ্রনাথের তপোবন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে পরিচালক কর্তৃপক্ষের কাজ যখন বালখিল্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদলেহন করা, তখন প্রগতিশীল শক্তির কাজ শুরু হয়েছে বিশ্বভারতীর স্বাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সরকারী সাহায্যে প্রকাশ, সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্রবিষয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ ইত্যাদি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে কবির আবাল্য সংগ্রামী রূপটিকে যথার্থ মূল্য দেবার প্রচেষ্টার অভাব নেই।

সেই কাজে প্রগতিশীল গণসংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘে'র অবদানও প্রভূত। এই সংগঠনটি ৭০-এর গোড়ায় যখন ভিন্ন[২] নামে আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামী আদর্শ বুকে করে নিয়েছিল। এরপর সংগঠনের অগ্রগতি যতই নির্দিষ্ট হয়, ততই মূল কর্মকাণ্ডগুলির সঙ্গে রবীন্দ্র-অনুধ্যান সবসময়ই চলেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সিনেট হলে অবস্থিত অতুল বসুর আঁকা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব প্রতি-কৃতিটি ছাত্র পরিষদের ছেলেরা নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়ে দেয়[৩] আর অন্যদিকে ১৯৭২-এ শহীদ মিনার ময়দানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সংগঠনের উদ্যোগীদের যে সভা হয়, তাতে বিশাল মঞ্চের পিছনে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছিল 'মানুষের অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ'।[৪] আমাদের মনে পড়ে সেই সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ ১৯৩০-এর মনুমেন্ট ময়দানের[৫] ঐতিহ্যকে মনে রেখে রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সভায় গণনাট্য সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটক অভিনয় করেন এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রকাশিত পুস্তিকা আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করে।

এই-যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে নতুন করে ভাবনা এবং রবীন্দ্রচর্চার গুরুত্ব সংগঠন কাঁধে করে নিল, তার প্রথম কারণটি আগেই বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সম্প্রতিকালের মানুষ বিস্মিত-ভাবে বিশ্বাস করছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক সংগ্রামী মানসিকতা যত বেশি তথ্য

সমৃদ্ধভাবে তুলে ধরা যাবে, ততই প্রতিষ্ঠানিক মহল পিছু হটবে এবং প্রগতিশীল শিবির সমৃদ্ধ হবে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, জাতিগত দেশগত ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত সমস্ত ভেদাভেদ দূর হয়ে গিয়ে সমগ্র মানবজাতি এক সৌন্দর্যের বন্ধনে একদিন ঐক্য-লাভ করবে। এই জন্যই তিনি বিশ্বকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তদানীন্তন 'নব্যবঙ্গ আন্দোলন' (আশ্বিন ১২৯৬) ও তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি কতদূর সচেতন ছিলেন! বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অসাড়তা ও আত্মাভিমান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ ছিল তীব্র ও শ্লেষাত্মক। চার বছর পরে লেখা 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে সাঁওতাল বিপ্লবের সময় ইংরাজ শাসকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সাঁওতালদের ওপর কেমনভাবে গুলিগোলা বর্ষণ করেছিল তার প্রকৃত পরিচয় সেখানে দেয়া আছে। 'অপমানের প্রতিকার' ও 'সুবিচারের অধিকার' নামে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি প্রবন্ধ লেখেন সেগুলিতে তিনি ইংরাজের ঔদ্ধত্য, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদনীতি ইত্যাদি নিপুণভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন। এই দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরার কারণ হল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান। কিন্তু শুধু এইভাবেই প্রবন্ধের পাতায় কবি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে বসে বিদেশী আন্দোলনগুলির সংবাদ কিভাবে রাখতেন তা জানতে হলে আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে তাঁর রচনাদি পাঠ করতে হয়। আইরিশ বিপ্লবীরা রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল তা এবং সে দেশের বারবার শস্যহানি, দুর্ভিক্ষের হানা, ঔপনিবেশিক শোষণ, ক্ষুধার্ত চাষীর মৃত্যু ও বহুলোকের দেশত্যাগ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের প্লাঙ্কেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সে দেশের সমবায় আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন, বলেছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবীরা রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে তাঁদের আন্দোলনের শক্তি গ্রহণ করেছিলেন। কবি ১৯২১ সালের গোড়ায় যখন আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেছেন, তখন জাহাজ থেকে এণ্ড্রুজকে লিখেছেন: **Just see what hideous crimes are being committed by British 'patriotism' in Ireland. It is a python which refuses to disgorge this living creature which struggles to live its separate life.**[৬]

এর পাশাপাশি উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় যে ঐতিহাসিক ব্যুয়র যুদ্ধ ঘটেছিল তার প্রসঙ্গ আমাদের মনে আছে। সেই যুদ্ধে ব্যুয়রদের হাতে যখন ব্রিটিশসেনা প্রচণ্ড মার খায় তখন গান্ধীজী আশ্চর্যজনকভাবে ব্যুয়রদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা তাঁর duty বা কর্তব্যকর্ম বলে ধরে নিয়েছিলেন। বার্নার্ডশ'-এর মত ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়গান গেয়েছিলেন আর ভারতবর্ষের দেশীয় রাজামহারাজারা যে অর্থ, অশ্ব সৈন্য দিয়ে সেদিন ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল সে কথা তো সকলেই জানে। রবীন্দ্র-পরিবারের গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই সঙ্গে চলে যান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি থেকে ব্রিটিশের বিরোধিতা করলেন। তিনি লিখেছেন : কোথা হইতে বণিকের কামান প্রাচীন চীনের কণ্ঠে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে আর আফ্রিকার নিভৃত অরণ্য সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে। কিছুকাল পরে চীনে শক্তিমদমত্ত ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় শক্তিগুলির অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ব্যুয়রদের কথা উল্লেখ করেছেন। তদানীন্তন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পরিচয় 'নৈবেদ্যে'র একাধিক সনেটেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যার একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে : শক্তিদম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন / দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবীজ তার / শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।[৭]

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯০৮ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, শ্রীঅরবিন্দ, বাঘাযতীন প্রমুখের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াপত্তন সমগ্র বাংলার গণজীবনে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চার করে। বলাবাহুল্য এই আন্দোলনগুলির চরিত্র ও জনজীবনে তার প্রতিক্রিয়া যেমন কবি লক্ষ্য করেছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে কবির দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার ধরা পড়েছে। এল তিরিশের দশক। হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর গুলি চালনা রবীন্দ্রনাথকে এমন বিচলিত করে যে ব্রিটিশ কারাগারে সমালোচনা করে বন্দীমুক্তির প্রশ্নে নিজ অভিমত সরাসরি জানিয়ে দিতে কবির কোন দ্বিধা হল না। সেদিন বাংলাদেশে যে গণ-বিক্ষোভের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

সুতরাং স্বাধীনতাপূর্ব কালে বৃহত্তর বাংলার গণআন্দোলনে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করেছিল।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই যে গণতান্ত্রিক শক্তি যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে পুরোপুরি শান্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তার পিছনে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবুস, রোঁলা প্রমুখের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ প্রভৃতি সংগঠনের অংশীদারী হয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংহত করেন। আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে শান্তির সপক্ষে এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত করতে যে আবেদনপত্র প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর করতে দ্বিধা করেন নি। ঠিক এই প্রশ্নে কবিকে আমরা এমন কি শরৎচন্দ্রের চেয়েও অগ্রসরমান ব্যক্তিত্বে দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু জীবনের শেষ জন্মদিনে সভ্যতার সংকট বিষয়ে যে ভবিষ্যৎ বাণী কবি করেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে পারতেন। Freedom at Midnight-এ দেশ বিভাগ হলে কোটি কোটি উদ্বাস্তু স্রোতে পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের অর্থনীতি ভেঙে পড়ল। শিয়ালদহ, হাওড়া রেলস্টেশনে নতুন-ইহুদী জীবন সংগ্রামে বাঁচবার জন্য হয় দেহবিক্রয় করল, নতুবা হকার হল, অনেকেই অনাহারে মারা গেল। বাফাল ওয়ালের গায়ে অসংখ্য অবৈধ শিশু শুরু করল কান্না। এই সময় পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে এক বিরাট শক্তি দিল। বুর্জোয়া জমিদার কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের দিকে কখনো প্রসন্নভাবে চোখ ফেরান নি। যদি প্রচার মাধ্যমগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গান আবৃত্তি প্রচারিত হয়ে গণতান্ত্রিক মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে এই ভয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তিনি উপেক্ষিত হতেন। এল ১৯৫৯ সাল। পশ্চিমবাংলার বুকে বুভুক্ষা খাদ্য আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ হল। আশি জনের অধিক আন্দোলনকারী শহীদ হল। সেই সময় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতা ওল্টালে নজরুল সুকান্তের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও বিভিন্ন অত্যাচারকেন্দ্রিক আলোকচিত্রের ওপরে বা নীচে ব্যবহৃত হয়েছিল। 'বিচারের বাণী নীরবে

নিভৃতে কাঁদে। অথবা যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো / তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো', কিংবা 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস / শান্তির ললিতবাণী শোনাইছে ব্যর্থ পরিহাস / বিদায় নেবার আগে তাই / ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'৮—ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি সেদিন বাঙালীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঝড় তুলেছিল।

১৯৬২-তে সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে সংগঠিত হয় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। ডালেস-এর পররাষ্ট্রনীতির ক্রীড়নক হিসেবে ভারত সরকার সেদিন শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনকে ধামা চাপা দেবার জন্যে সেই চক্রান্তে জড়িয়ে যায়। অনেক বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবী, শিল্পী 'দেশ' পত্রিকার পাতায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র নামে রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়ান। ভারত রক্ষা আইনে ধৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি কি করতেন? চীন দেশের ওপর ব্রিটিশ ও জাপানীর অত্যাচার কিংবা সোভিয়েতের মাটিতে জারের শোষণ তাঁর কলমে নির্মম হয়ে ধরা পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছায়াতলে কেমন সুন্দর ও শান্তিময় জীবন যাপন করা যায়, তা 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন। সেই রবীন্দ্রনাথ আরো (দু দশক) বাঁচলে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ যে সাম্রাজ্যবাদীদেরই চক্রান্ত তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। তাই ৬০-এর দশকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে যত বেশি সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চান এবং ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবাংলার বুকে যে খাদ্য আন্দোলন বুর্জোয়া জমিদারদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়, সেই আন্দোলনেও ছিল রবীন্দ্রবাণী ও রবীন্দ্রসংগীতের প্রত্যক্ষ প্রেরণা।

ভারতবর্ষের শাসকসম্প্রদায় এটা বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে ভাববাদী-দের হাত থেকে রবীন্দ্রচর্চার অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রগতিশীলরা এমন পর্যায়ে পৌঁছুচ্ছে যে আগামীদিনের প্রতিটি গণআন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করা হবে। সেইজন্যই সুপরিকল্পিতভাবে ৭০-এর দশকের কিছু আগে থেকেই উগ্রপন্থীদের প্রকারান্তরে নানা সাহায্য দেয়া হল। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙা হল এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব করা হল। সেদিন যে-সব হঠকারী বন্ধুরা এই চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য

পরবর্তীকালে এই ভুল স্বীকার করেছিল। এই প্রবন্ধকারের নিজস্ব একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় এখানে দেওয়া যাক। তাঁর জনৈক ছাত্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'বিচিত্রা' গ্রন্থটি পড়বার জন্যে নিয়ে যায় এবং পরে সে তথাকথিত উগ্রপন্থী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। প্রবন্ধকার ধরেই নিয়েছিলেন যে ছাত্রটি তার কর্মকাণ্ড শুরু করেছে ঐ গ্রন্থটি পুড়িয়েই এবং সেটি আর ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উগ্রপন্থী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার পর সেই ছাত্রটি বইখানি ফেরৎ দেয় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ তার চিন্তার জগৎকে অধিকার করেছিলেন। এই ৭০-এর দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী'; ১৯৭২-সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবাংলায় যে জাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত যেমন উপেক্ষিত হল, তেমনি নেমে এল আরও বেশী অত্যাচার। শুরু হল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র। এই মুহূর্তে কাজ হয়ে দাঁড়াল জাতীয় ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ভূমিকাটি তুলে ধরা। ঐ বছর ২০ মে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল মঞ্চের পিছনে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছিল 'মানুষের অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ।' এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যে পুস্তিকাটি করা হয় তার হাজার হাজার কপি বাংলার জনগণ কেনে এবং অত্যাচারের মুখে তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। প্রায় এক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের বন্দীমুক্তির দাবি সম্পর্কিত ভূমিকাকে তুলে ধরার জন্য সারা পশ্চিমবাংলায় নানা আলোচনা সংগঠিত হয়। ১৯৭৩-এ ১১ জুন রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠান-এ সভাপতিত্ব করেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সরোজ মোহন মিত্র ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়। ঐ সভায় বীরভূম জেলার সিউড়িতে অবস্থিত রবীন্দ্রভবনটি সরকারী নির্দেশে সি. আর. পি.র আবাসস্থলে পরিণত হওয়ায় প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'ধূসর মাটি' পত্রিকার সম্পাদককে যে চিঠি পঠান, তা পঠিত হয়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: সিউড়িতে কবির নামে নির্মিত 'রবীন্দ্রভবন' এখন নাকি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের আস্তানা হয়েছে। জানিনা এরা জাঠ কিনা। রবীন্দ্রভবনকে কি আর কোন সৎ কর্মে লাগানো যেত না? সিদ্ধার্থশঙ্কর কি ভুলে গেছেন বাসন্তী

দেবীর[১০] কাছে 'বাংলার মাটি' গানের স্বরলিপি ছিল—চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কবির তখন গভীর বন্ধুত্ব। সেই রবীন্দ্রনাথের নামে ভবনগুলির ব্যবহার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি কি যাবে না[১১]? চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্করের রক্তের সম্পর্ক থাকলেও মানসগঠনে যে উভয়ের আসমান-জমিন ফারাক, তা বোঝা প্রভাত কুমারের মত সরল মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থা জারীর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-চর্চা সুদূর গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা ক্লান্ত হননি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নজরুল ও সুকান্ত চর্চা, যাদের মধ্যে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অর্পিত হয়েছিল। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় ১৯৭৫-এর জুনের শেষে। পশ্চিমবাংলায় যে অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছিল তা এবারে সারা ভারতে আইনত সিদ্ধ হল। এল মিসা, ডি. আই. আর-এর পাশাপাশি প্রি-সেন্সার এর ব্যবস্থা, যার দুঃসহ পরিচয় সম্মিলনী দপ্তরে দিনের পর দিন আসতে থাকে। অসংখ্য পত্র পত্রিকা বন্ধ হতে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথের অনেক উক্তি, গান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই সময় গণতান্ত্রিক অধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যত সভা হয়, তার সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথকে জনমানসে মেলে ধরবার জন্যে বিবৃতি, আলোচনা সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময় বিবৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ১৯৩৭ সালের প্রচারিত সতর্কবাণীকে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয় যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : Liberty is a privilege which an individual has to defend daily for himself, for even the most democratic Government tends to be oppresive if is tyranny emped be indifference or Cowardice of its subjeet.[১২]

এখন আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে জরুরী অবস্থায় কেন জোর করে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

১৯৭৭-এ আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। এবার কাজ রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদীদের গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে আনা এবং জনগণের সামনে আনা। যে রবীন্দ্রনাথের পোট্রেট পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যার লেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যাকে প্রকৃতি ও ঈশ্বরের

কবি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল, তাকে মানুষের কবি হিসেবে স্থাপিত করা। কবি লিখে গিয়েছিলেন : মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/আমি তোমাদেরই লোক/আর কিছু নয়/এই হোক শেষ পরিচয়।[১৩] তাই রবীন্দ্রভবনগুলির সম্প্রসারণ ও সংস্কার, তাই রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন, সে জন্যেই মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দান, গ্রামীণ জীবনে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা—ইত্যাদি বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম কাজ। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং পেইন্টার্স ফ্রন্টের উদ্যোগে নিরলস রবীন্দ্র চর্চা চলেছে। যদি পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিরন্তর শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে রবীন্দ্র-অনুধ্যান ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। পশ্চিমবঙ্গে সচেতন সংস্কৃতিকর্মীরা সুনিশ্চিত ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন এবং সেই কাজটি সততার সঙ্গে করে চলেছেন।

টীকা টিপ্পনী

১. রবীন্দ্র গবেষক ডঃ নেপাল মজুমদারের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ৬ খণ্ডে বিন্যস্ত একটি বিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থাবলীর জন্য নেপাল মজুমদারকে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

২. ১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলের সভায় জন্ম হয় 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী'র। পরবর্তীকালে এর নাম বদল করে রাখা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।'

৩. যুগান্তর ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১ ; গণশক্তি ২ মার্চ ১৯৭২।

৪. শহীদ মিনার ময়দানে ১৯৭২ সালের ২০ মে ঐ সাংস্কৃতিক সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ১৯৩০ সালে এই মনুমেন্ট ময়দানের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ হিজলি জেলে বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নি কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন, অভিশাপ দিয়েছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে।

৬. ১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রাকালে জাহাজ থেকে এণ্ডরুজকে লেখা কবির চিঠির অংশ বিশেষ।

৭. নৈবেদ্য, রবীন্দ্ররচনাবলী।

৮. প্রান্তিক, ১৮নং কবিতা।

৯ তৎকালীন কং-ই পরিচালিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী।

১০. সিদ্ধার্থশংকর রায়ের দিদিমা।

১১. এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৩০মে 'ধূসরমাটির' সম্পাদক অরুণ চৌধুরীর কাছে। চিঠিটি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন অতীত ও বর্তমান সংকলন'-এর দলিল অংশে (১১ নং / স-তেইশ পৃঃ) ছাপা হয়েছে এই চিঠিটির প্রথম অংশে ছিল : 'ধূসর মাটি' সম্পাদক মহাশয় সমীপে—শুনে ছিলাম যে জাঠরা যখন জায়গা দখল করে, নতুন দেওয়ানী খাসে তারা তাদের আস্তাবল বানিয়ে ছিল, আর দেওয়ানী আমে রান্নার জায়গা। বহুকাল রান্নার ধোঁয়া কালির ছায়া দেওয়ানী আমের প্রাচীরগাত্রে ছিল। রবীন্দ্রনাথের নামে 'ভবন' হয়েছে অনেক শহরেই। কিন্তু তার ব্যবহার কি হচ্ছে তা নিয়ে দেশবাসীর কোন উদ্বেগ নেই।

১২. Messag› to India civil Liberty Conference held on 17 1 0. 1937 in London.

১৩. পরিচয়, সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

১

'..... সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানত। আমার পরিচয় তখন কেবলমাত্র আমার আত্মীয় স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন (জোড়াসাঁকোতে—লেখক)। বালক আমি, সসংকোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হতে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন'—(রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার এই প্রথম সাক্ষাৎ সংযোগ। ত্রিপুরার সিংহাসনে তখন বীরচন্দ্র মাণিক্য। রাজার বয়স ৪৩। কবির বয়স তখন ২০। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় কাব্য ১৮৮১ সালে বেরোয়। তার একবছর পরে বীরচন্দ্রের প্রাধানা মহিষী ভানুমতীর মৃত্যুতে মহারাজ খুবই শোকাহত হন। এই সময় ভগ্নহৃদয় কাব্য পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হন যে রাধারমণ ঘোষকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন কবিকে অভিনন্দিত করার জন্য। উচ্ছ্বসিত আবেগে তিনি বলেছিলেন: 'এ বালক কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠনিধি রূপে একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'।

যদিও তার আগে এমনি আর এক দূত এসেছিল বিদ্যাসাগরের কাছে মহারাজের বার্তা নিয়ে। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই ভাষাকে 'রাজভাষা' হিসেবে গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজপরিবার কৃতজ্ঞ—এই ছিল সে বার্তার মূলকথা। যে দূত এই বার্তা নিয়ে এসেছিল তাঁর পোষাকে আঁটা ধাতুর স্মারক চিহ্নে বাংলা ভাষায় খোদাই চিহ্ন দেখে বিদ্যাসাগর মশাই সোৎসাহে বলে উঠেছিলেন: 'আমার বাংলাভাষা রাজভাষার সম্মান পেয়েছে যে.. ...'।

ত্রিপুরার রাজারা আর সব রাজাদের মতই রাজা ছিল। আর্থিক সঙ্গতি অন্যদের তুলনায় ছিল না বটে কিন্তু প্রজার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধটি ছিল আবহমানকালের নিয়মে বাঁধা। সেই নিয়মে জমিদার মহাজন সাকরেদ পাইক পল্টনদের জুলুমবাজি, শোষণ, অত্যাচার কোনকিছুর থামতি ছিল না। এই রাজাদের আদেশেই একমাত্র একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া অন্যকোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মানুষের কাছে লেখাপড়া করা ছিল বে-আইনি।

তবুও পাঁকে যেমন পদ্ম ফোটে রাজাদের মধ্যে অদ্ভুত এক বিপরীত চরিত্র ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন একাধারে কবি, বৈষ্ণব কাব্যরসিক, সঙ্গীত ও ললিতকলায় পারঙ্গম এবং কলাসৃষ্টির উৎসাহদাতা। তৎকালীন ঐতিহাসিক কর্ণেল মহিম ঠাকুর বীরচন্দ্রকে 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' উপাধি দিয়ে রাজপরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যখন যৌবন বয়েস, তখন ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে ছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সীও বটে। এই রাধাকিশোরের আমন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরায় আসেন। তারপরে প্রৌঢ় বয়সে বীরেন্দ্র কিশোরের রাজত্বে এবং বার্দ্ধক্যে বীরবিক্রম কিশোরের আমন্ত্রনে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার ত্রিপুরায় এসেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল রাধাকিশোরের সঙ্গে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় আগরতলা শহরে প্রথম সাহিত্য সভার প্রচলন। তেমনি এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বসেছেন একটি আসনে। রাধাকিশোর পাশেরটিতে না বসে দর্শকদের আসনে গিয়ে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুরোধ করা সত্ত্বেও রাধাকিশোর অনড়। সবিনয়ে বললেন : 'সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্তবৃন্দ মাত্র, উচ্চমঞ্চ আমার স্থান নয়'।

রবীন্দ্রনাথের আসা যাওয়া, সাহিত্য সভার সূত্র ধরে আগরতলায় এসময় বেশকিছু সাহিত্যপত্র জন্ম নেয়। যেমন—পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ-এর সাপ্তাহিক 'অরুণ', সুরেন্দ্রমোহন দেববর্মা-র 'বঙ্গভাষা' এবং মহেন্দ্র দেববর্মা-র 'ধূমকেতু'। এইসব পত্রিকায় যেমন রবীন্দ্রচর্চার প্রসার হচ্ছিলো তেমনি রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার রাজপরিবার শুধু নয়, সেখানকার প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য,

সহজ সরল উপজাতি মানুষের সুর নৃত্য ছন্দে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অনুভবে নতুন রূপ পেল ত্রিপুরা—'সুন্দরী ত্রিপুরা'। 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ কবি উৎসর্গ করলেন বন্ধু রাধাকিশোর মানিক্যকে।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য-র আমলে তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'। ত্রিপুরার দরবারী সাহিত্য অল্পবিস্তর নেমে এলো সাধারণ শিক্ষিত মানুষের গণ্ডীতে। সবকিছুর মূলে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল এত বেশী যে কিশোর সাহিত্য সমাজ তার মুখপত্রের নাম দিল 'রবি' (১৩৩১, আষাঢ়)। রবীন্দ্রনাথ এতে লিখতেন। এই ত্রিপুরার মাটি থেকেই তিনি পেয়েছিলেন 'রাজর্ষি' উপন্যাসের উপদান (পরে নাটক 'বিসর্জন')।

বাংলার মাটিতে ত্রিপুরার মানুষের আনাগোনা বেশী করে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর। শান্তিনিকেতনকে, বিশ্বভারতীকে ত্রিপুরার রাজারা যেমন অর্থ সাহায্য করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন, তেমনি শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার সাহিত্য শিল্প পিপাসু ছাত্রদের আসা যাওয়া ছিল ভালই। তেমনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন আজও সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন। আর একজনের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যিনি ছিলেন ত্রিপুরা ও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যের অন্যতম বড সেতু—নাম নীলেশ্বর মুখার্জী। মণিপুরী সম্প্রদায়ের কুলীন ব্রাহ্মণ। খোল ও মৃদঙ্গ বাদক, গায়ক, এবং নৃত্যশিল্পী নীলেশ্বর বাবুকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন রাধাকিশোর মানিক্যের রাজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্যের আসরে। পরে অনিল চন্দকে পাঠিয়ে কবি তাঁকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নীলেশ্বর বাবুর অকৃত্রিম অবদান আজও স্মরণীয়। শান্তিনিকেতনে প্রথম 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যাভিনয়ে নীলেশ্বরবাবু তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও দক্ষতা দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন কবি ভাবনার অন্তর অনুভূতি।

কবির আশিমত জন্মদিন বিপুল উৎসাহে ত্রিপুরার রাজপরিবারে এবং বিভিন্ন সংস্থায় পালিত হয়েছিল। রাজদরবারের বিশেষ অধিবেশনে কবিকে সম্মানিত করা হয়েছিল 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়ে। কবি গিরিজানাথ চক্রবর্তী তাঁর 'বীণা' কাব্যগ্রন্থ কবির নামে উৎসর্গ করে তাঁর হাতে তুলে দেন : 'তুমিই দিয়াছ বীণা/এ তারি ঝংকার/তোমার চরণে দেব/রাখিনু আবার।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-চর্চা বাডতে থাকে। ১৯৪৮ সালে

দেববর্মার সম্পাদনায় 'অভ্যুদয়' পত্রিকার 'রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা', বীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'ত্রিপুরা' পত্রিকার 'রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা'র রবীন্দ্র বিষয়ে নানা প্রবন্ধ আলোচনা, স্মৃতিকথা ত্রিপুরার রবীন্দ্রচর্চা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দৈনিক পত্র-পত্রিকাতেও তার প্রভাব কম পড়েনি।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠান ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়ে দেয়। স্থানীয় লেখকদের লেখায় এবং শতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে প্রকাশ পায় গুরুত্বপূর্ণ স্মারকগ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।' অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য এই স্মারকগ্রন্থে আছে যা রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যাপ্তিকে আরও বিস্তৃত করেছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার ওপর বৃটিশ সরকার নানাভাবে যে চাপ সৃষ্টি করতো এবং রাজপরিবারকে বাধ্য হতে হোত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন তার তথ্যও এই স্মারকগ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে—যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চা বিস্তৃত করতে সবচেয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক সোমেন বসু একক প্রচেষ্টায় 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করে ভাবীকালের জন্য মূল্যবান স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। নানা দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সিরাজুদ্দিন আহমেদ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, শিশির সিংহ, রমেন্দ্র দেববর্মা, কার্তিক লাহিড়ী, সলিল দেববর্মা, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, সচ্চিদানন্দ ধর, নীলমাধব সেন, অনিল দাশগুপ্ত, দীনেশ চৌধুরী, মহিম দেববর্মা ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন বসু, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। শতবর্ষের নতুন আলোয় রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে এগিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজ মুখপত্রের উদ্যোক্তারা। নিয়মিত চর্চা এবং রবীন্দ্র সৃষ্টিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন অনেক সংস্থা, যেমন—সাহিত্য বাসর, লোকশিল্পী সংসদ, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, শিল্পীসংসদ, রূপম, রঙ্গম, সঙ্গীত ভারতী, ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ, লেখকশিল্পী সংসদ প্রভৃতি।

এর পাশাপাশি আর একটা বড কাজও হয়েছে। ত্রিপুরায় সেই সময়ে (১৯৭১-র আগে) বৃহৎ আদি জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতি ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এই মহাজাগতিক বাণীকে রূপ

দেবার জন্য যেমন বেশ কিছু আগে থেকেই ত্রিপুরার উপজাতির লোকগাথা ও লোকসঙ্গীতের অনুবাদ বাংলায় হয়েছিল, তেমনি বাংলার লোকগাথা ও সঙ্গীতের কিছু কিছু অনুবাদ ত্রিপুরী ভাষাতেও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ত্রিপুরী ভাষা-অনুবাদে প্রথম উদ্যোগ নেন অজিতবন্ধু দেববর্মা। তাঁর অনুবাদ করা বেশকিছু রবীন্দ্রসংগীত পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। তিনিই অনুবাদ করেছিলেন উপন্যাস 'রাজর্ষি', নাটক 'বিসর্জন' ও 'মুকুট'। প্রধান সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ মহেন্দ্র দেববর্মা যে-সব রবীন্দ্রসংগীত অনুবাদ করেছেন তা এতই প্রাণপূর্ণ এবং সুললিত যে শুনলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানে সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে বিশ্বসংস্কৃতির সমন্বয় ধারা।

২

একথা ঠিক, রাজদরবার হোক কিংবা বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষ, পত্র পত্রিকা, সংস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরার রবীন্দ্রচর্চার যে প্রয়াস চলছিল তার গুরুত্ব আছে যেমন, তেমনি একথা নিঃসংকোচে বলা যায় তার ব্যাপ্তি ছিল সমাজের এক ক্ষুদ্র শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও উচ্চ অংশের মানুষের মধ্যে। রাজ শাসনের শেষে কংগ্রেস সরকারের আমলে এমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি যাতে ব্যাপক মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চা ছড়িয়ে দেয়া যায়। বরং সত্তর দশকের সূচনা থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার মত ত্রিপুরাতেও তৎকালীন শাসকদলের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যাভিচার গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অগ্রগতির পথ রোধ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

১৯৭৮-এ ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভ করে। বস্তুত এই সময় থেকেই সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যকে শুধু রক্ষা করা নয় তাকে জনজীবনের ঘনিষ্ঠতম প্রদেশে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করে। রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্তকে প্রধান হাতিয়ার করে, উপজাতি ও বাঙালী লোকায়ত সংস্কৃতির বিপুল সম্পদকে অবলম্বন করে ত্রিপুরার বুকে শুরু হোল নতুন এক সাংস্কৃতিক অভিযান, যার মূল লক্ষ্য সমাজের নীচুতলায় বাস-করা শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের আবহমানকালের লালিত পালিত বিচিত্র সংস্কৃতি। তাঁরা আহ্বান দিলেন—নিচু

থেকে ওপরে তোল, রুটি ও রুচির লড়াইকে জোরদার করো, ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দাও সহজ সরল ভঙ্গীতে একেবারে নিচুতলার মানুষের মধ্যে, বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতির অঙ্গনে সবাই বিকশিত হয়ে ঐক্যের ফুল ফোটাও।

বামফ্রন্ট সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় সহযোগী ১৯৭৯ সালে জন্ম নেয়া 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ' এবং তারপরে জন্ম নেওয়া 'লোক-শিল্পী সংঘ'। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘে সমবেত বিভিন্ন মতের মানুষ একটা লক্ষ্যে অবিচল—গণতন্ত্র, বিশ্বশান্তি, জাতীয় সংহতি। রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে সমকালের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং বিভেদ বিচ্ছিন্নতা সন্ত্রাস অর্থনৈতিক শোষণ এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পার-মানবিক রণহুংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রবীন্দ্র চিন্তা, আদর্শ ও সৃষ্টিকে প্রয়োগ করার মহৎ কাজ তারা করে চলেছেন। লোকশিল্পী সংঘে যে বিশ হাজার শিল্পী আজ জড়ো হয়েছেন তাঁরা জাতি-উপজাতিসংস্কৃতির সেতু হিসেবে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্র নজরুল সুকান্তকে। ত্রিপুরার মাটিতে ৮০ সালের দাঙ্গা, তারপরে উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হিংস্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংহতির জয়পতাকা তুলে ধরতে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের এইসব যথার্থ উত্তরাধিকারীরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছেন—যা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম বড় স্তম্ভ।

শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, উপজাতি কগবরক ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা গত কয়েক বছরে পাহাড়ী গাঁওসভাতেও ছড়িয়ে গিয়েছে। ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মবর্ষকে সামনে রেখে বই মেলায় ক্রেতাদের কাছে সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর আহ্বান দিয়েছিল—'ঘরে ঘরে সঞ্চয়িতা'। পশ্চিমবাংলার বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ বাড়তি ছাড় দিয়ে, বাড়তি বই ছেপে সাহায্য করেছিলেন। সারা রাজ্য জুড়ে যে ৪৫০টি লোকরঞ্জন শাখা আছে সরকারের সেই প্রত্যেক শাখাতে দেয়া হোল 'সঞ্চয়িতা', 'সঞ্চিতা' ও 'সুকান্ত সমগ্র'।

দক্ষিণের সাব্রুম জেলায় এমনি একটা আসরে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। হ্যাজাক আলোতে ঐ এক আসরে ১২টি কাছাকাছি লোকরঞ্জন শাখার সমবেত বন্ধুদের কাছে ত্রিপুরার সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার প্রত্যেক শাখার সম্পাদকদের হাতে তুলে দিলেন ৩টি করে বই। প্রথম যে মানুষটি (একটি শাখার সম্পাদক) উঠে এলেন তাঁর পরনে ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া একটা গেঞ্জী।

কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'আপনি পড়তে পারেন?' মাথা নেড়ে মানুষটা বললেন: 'না'। আমি বলি: 'তাহলে'? উত্তরে কোন সঙ্কোচ না রেখে মুচকি হেসে বললেন: 'যারা জানে তারা পড়বে, সবাই শুনবো।'

তেমনি আর একদিন রোদভাঙা সকালে তেলিয়ামুড়া যাবার পথে তৃষা-বাড়িতে দেখলাম আর এক আশ্চর্য দৃশ্য। উপজাতি প্রধান-গ্রাম। বড় সড়কের ধারে। সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চেয়ারে হেলান দেয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি। উপজাতি ছেলেমেয়েরা মালা পরালো, ধূপ জেলে দিল, ফুল ছড়ালো। আশপাশ থেকে বাঙালী ছেলেমেয়েরা এসে হাতে হাতে কাজ করছে। অনুষ্ঠানের প্রধান হেমন্ত জমাতিয়া একদিন ছিল উগ্রপন্থী। পরে ভুল ভাঙে। বিনোদ জমাতিয়ার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে সরকারের কাছে। অংশ নেয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, বামফ্রন্টের পাশে। ভীষণ সুন্দর গান গায়, যা পশ্চিমবাংলার বুকে আগে অনেকবার শুনেছি ওর গলায়। ওর বন্ধু অনন্ত জমাতিয়া, তারও এক ইতিহাস, সে গাইলো কগবরক ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। কি সুন্দর মিঠে আর ভরাট গলা, তেমনি সুন্দর অনুবাদ। তারপরেই আর একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণ' কবিতা নিজে অনুবাদ করে নিজেই আবৃত্তি করলো। একজন বাঁশীতে শোনালো 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'। দূরে পুকুরপাড়ে, গাছের গুঁড়ির কাছে সামিয়ানার নীচে জাতি-উপজাতি, নারীপুরুষ, যুবক যুবতী, কিশোর শিশুরা তন্ময় হয়ে শুনলো সেই অনুষ্ঠান।

কিছুদিন আগে কলকাতায় ঢাকুরিয়া সুপার মার্কেট চত্বরে ত্রিপুরা সরকারের এম্পোরিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল কেবলমাত্র কগবরক ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি এবং উপজাতি ছেলে মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্র নৃত্য আলেখ্য। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম শুধু শহর নয়, গাঁ-শহর জুড়ে ত্রিপুরার বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ব্যাপক জনগণের মধ্যে, জাতি-উপজাতি সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার দুরূহ কাজটা সার্থকভাবে করে যাচ্ছে। আমাদের দেশ এবং বিশ্বব্যাপী সভ্যতার আর এক সংকটময় মুহূর্তে এমনি আন্তরিক প্রচেষ্টার ক্রমব্যাপ্তির মধ্যে সত্য হোক রবীন্দ্রনাথের সেই জলন্ত নির্দেশ—'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।'

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/২

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ কাঠামোয় নানান সংকট দীর্ঘ দিন ধরে ব্যাধির মত সংক্রামিত হয়ে আসছে। এর কুপ্রভাবের ফল এতদ্‌-অঞ্চলের মানুষ পূর্বেও ভোগ করেছে, এখনও তার উত্তরাধিকার বহন করে চলছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তল্পীবাহক এদেশীয় শোষকশ্রেণী এই সব সংকটের জন্ম দিয়ে তাকে লালন করেছে শোষণ যন্ত্রের কৌশল হিসেবে। এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের বেড়াজাল ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে আছে: সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার জিগির, ধর্মনিরপেক্ষতা নামের ধর্মীয় সংকট, জাত-পাতের প্রশ্ন, অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক কুসংস্কার, পণপ্রথার মত বর্বর ব্যাধি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতার মত কুটকৌশল, নারী সমাজের প্রতি মধ্যযুগীয় আচরণ প্রদর্শন এবং সর্বোপরি করালগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধাতঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ তার জীবৎকালে এসব সংকটের বিরোধিতা করেছেন, মূলোৎপাটনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এসবের বিরুদ্ধে আজকের প্রাগ্রসর মানুষের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের এক সদর্থক ঐতিহ্য কতখানি প্রাসঙ্গিক, এই পর্যায়ের রচনায় তারই রূপকল্প স্থাপিত হয়েছে।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

ভেদ, বিভেদ, ধর্মান্ধতা ও রবীন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম দেন 'এ নেশন্ ইন্ দি মেকিং।' একটা জাতি গড়ে উঠছে, তারই বর্ণনা। অবশ্য তাঁর বর্ণিত ঘটনাসমূহ সেই গড়ে ওঠার একটি দিক মাত্র। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এদেশের মানুষ তখন নানান রকমে এগোতে শুরু করেছেন জাতি গঠনের পরিণতির দিকে। ভারতব্যাপী রেলপথ ভারতের বিভিন্ন অংশের চেতনার মিলনের সেতু হয়েছে। উপর্যুপরি কৃষক বিক্ষোভ সংঘবদ্ধ একটি ধারায় পরিণত হয়নি বটে, কিন্তু গণ-চেতনায় তার ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছে। কার্ল মার্কস আশা করেছিলেন রেলওয়ে পত্তনের সংগে সংগে তার মেরামতির কাজ ইত্যাদির জন্য কারখানা গড়ে উঠবে। আর তার নিদর্শনে যন্ত্র ব্যবহারকারী অন্য শিল্প গড়ে উঠবে। কাপড়কল চটকল প্রভৃতি তখন শুরু হয়ে গেছে। জমিহারা লুন্ঠিত, শোষিত কৃষক শরৎচন্দ্রের গফুরের মতো জীবিকার সন্ধানে এই সব কারখানায় নীত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই শহরে এসে পণ্য-বিনিময়ের সমাজে কোন একটা অংশে কঠোর মেহনতের উপায়ের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর কিংবা দেওবন্দের মৌলানা সৈয়দ হুসেন আহম্মদ মাদানির পিতামহীর চরকায় তৈরি সুতো কেটে সংসার চালানোর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বিলাতের কাপড়ের কলের তৈরি সুতো এবং কাপড় ভারতের বাজার দখল করেছে। এদেশে শিল্প গজিয়ে ওঠার বিরুদ্ধে নানানরূপ বাধা সৃষ্টি করেছে। যখন আমেরিকা বা জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে আমদানির বিরুদ্ধে মোটা শুল্কের দেয়াল খাড়া করা হচ্ছে, তখন ভারতে ইংরেজ করছে তার বিপরীত। দেশের সামান্য সব কারখানায় তৈরি কাপড়-চোপড়ের ওপর শুল্ক প্রয়োগ করছে। প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনসমূহের কার্যবিবরণীতে এইরূপ আভ্যন্তরীণ শুল্কের উচ্ছেদের দাবি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে। কলকারখানা, শিল্পে, খনিতে

ও বন্দরে বিক্ষোভ জমে উঠছে। কোথাও কোথাও কখনো কখনো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হলেও আচম্বিত ধর্মঘট ঘটছে। ইংরেজ সরকারের বিরূপতা সত্বেও তাদের একান্ত প্রয়োজনে সীমিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে সাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠায় দেখা দিতে শুরু করেছে। এই ভাবে নানান দিকে জাতির নতুন জীবনধারা নানান বাধা বিপত্তি ও বেদনায় ব্যাহত, ব্যথিত হয়েও এগিয়ে চলেছে।

বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি যে কোন কর্মোদ্যম ও সমাবেশ ভারতবর্ষের এ এক চিরসমস্যা। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কারখানার শ্রমিক পর্যন্ত ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধ কোনমতে বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা সত্বেও ধীরে ধীরে এইরূপ বিধিনিষেধের অনেক কিছুতেই ছেদ পড়ছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমরা দেখেছি ইয়ং বেঙ্গলের তরুণেরা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে এই বিধিনিষেধের বেড়াকে ভাঙতে চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্য দণ্ডও পেয়েছেন। এঙ্গেলস বলেছেন: 'The East fell to the West/Because of segregation of man from man' অর্থাৎ 'পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের পতন হয়েছে, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার কারণে।' ওঠা বসা খাওয়া দাওয়ার এই ব্যবধান জাতি গঠনের পথে কঠোর বাধা। বর্ণাশ্রম প্রতিপালনে উচ্চতর বর্ণ হিসাবে যাঁরা বিবেচিত তাঁরা জল-চল কিংবা জল-অচল বর্ণদের সঙ্গে মেলামেশার বাধা দূর করবার আন্দোলন করলে তাকে বললেন অস্পৃশ্যতা বর্জন, যা গান্ধীজী এবং অন্যান্য বুর্জোয়া নেতারা চিরকাল বলে এসেছেন। এ-ভাবে বললে প্রকৃত দাবিটা বেরিয়ে আসে না। অস্পৃশ্যতা কারও গায়ে লেখা নেই, তা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সবাই তো বিচ্ছিন্ন। বাইরের জগতের চাপ তাদের বিচ্ছিন্নতাকে কাটাতে যতটা বাধ্য করেছে ততটুকুই তারা মেনে নিচ্ছে। অগ্রগতি এতই ব্যাহত। সমাজের বা নিজেদের ধ্যান-ধারনায় ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ থাকে। এই মর্যাদা-জ্ঞান অলীক। আসলে বিচ্ছিন্নতাই প্রধান চরিত্র। বাইরের নবাগত কোন শক্তি যখন দেশ লুণ্ঠন করতে বা দখল করতে চায় তখন এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের সুযোগ দেয়। আক্রমণকারীদের কাছে ব্রাহ্মণের মর্যাদার কোন মূল্য নেই, যদি তারা ঐ ব্রাহ্মণত্বকে নিজের কাজে না লাগায়। ব্রাহ্মণ তেমনি অসহায়, যেমন অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা। বরং

ব্রাহ্মণই সবচেয়ে বেশী বিচ্ছিন্ন। কারণ কোন উৎপাদনের কাজে ব্রাহ্মণ জড়িত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজের সঙ্গে ভালরকম সংস্রবে আসার পর ভারতীয় চিন্তাবিদ বুঝেছিলেন তাঁদের জীবনদর্শনে পরিবর্তন করতে হবে। তাই রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখিত তাঁর সুপরিচিত চিঠিতে স্মরণ করলেন বেকনকে, যিনি ব্রিটেনের বস্তুবাদের আদি গুরু। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর পরিষ্কার লিখলেন আমাদের দর্শন 'False Philosophy' ভুয়ো বা ঝুটো দর্শন। কয়েক দশক পরে যা ঘটল তা তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ইউরোপের idealist Philosophy যেমন বার্কলের লেখা পড়ালে ভারতবাসীর কুসংস্কার বাড়বে এবং নিজেদের ভুয়ো দর্শনের বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে ঘটল এই প্রতিক্রিয়া। নিজেদের হীনমন্যতা ঢাকতে হিন্দু বা মুসলমান সবেরই মধ্যে এল প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনুরাগ। এই অনুরাগ ক্রমোত্তর নিবিড় হল। প্রথমে এর হোতা হলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গুরুরা। তারপর হিন্দু চিন্তাবিদদের বিভিন্ন ধারায় এই ঝোঁক পুষ্টিলাভ করতে লাগল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাঁদের পরিচয় এই কালের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বক্তব্য দেখলে তাঁদের আশ্চর্যই লাগে। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে পর পর দিয়ে দিচ্ছি :

১. ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।[১]

২. পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদলাভ করিতে প্রস্তুত হও।... বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ'।[২]

৩. আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।[৩]

৪. ...তবে আহার স্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক।[৪]

৫. আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ

তাহার উপর 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনবাবুকে যে পত্রখানি লিখিতেছেন, তাহা স্ত্রীর মৃত্যুর দিনদশ পরে লেখা (১৯ অগ্রহায়ণ, স্মৃতি, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)। 'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদানুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়'।[৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ রবীন্দ্রনাথের উক্তি হতে সংকলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করবো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য। 'নববর্ষের দিনে (১৩০৯) আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম নব-বর্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দান করেন তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, কবির মন কী পরিমাণ প্রাচীন ভারত ঘেঁষা ও হিন্দু ভাবাপন্ন'।[৬]

অতীতের গৌরব নিয়ে আস্ফালন দ্বারা হীনমন্যতাকে ঢাকার চেষ্টা পশ্চিমী মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। স্যর সৈয়দ আহম্মদ মুঘল শাসন ব্যবস্থার গুণকীর্তন করে এক বই লিখলেন। আধুনিক যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কবি মীর্জা গালিবকে তিনি তাঁর ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। গালিব অস্বীকার করেন। বলেন, বৃটেনের পার্লামেণ্টারি শাসন ব্যবস্থার বর্ণনায় তিনি (স্যর সৈয়দ আহম্মদ) যদি বই লেখেন কবি সানন্দে তার ভূমিকা লিখে দেবেন। পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি তখন তিনি আকৃষ্ট।

আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এতে নয় যে, জীবনে তাঁর বিপথে কখনো পা পড়েনি। তাঁর মহত্ব এতেই যে—যে শ্রেণীতে তাঁর জন্ম এবং যে পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছেন তাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমাজে যখন এসেছেন তার ঢেউয়ে মিলে তিনি ক্রমপ্রসারিত প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ রোধের প্রস্তাবের পর যে শোভাযাত্রা পূর্বে ফেডারেশন হল্ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে বাগবাজার পর্যন্ত গেলে তা যাঁরা লীড করেছিলেন তিনি তার অন্যতম। 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল / পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান' এই গান গেয়ে পথে পথে সমস্ত জমায়েত মানুষের মনকে মথিত

করে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডি ভেঙ্গে গেল, বাঙালীর গণ্ডিতে পরিণত হল। বরিশালে হবে কাংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল হবেন তার সভাপতি। সম্মেলনের পর হবে সাহিত্য সম্মেলন, যার সভাপতি হবার কথা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ইতিমধ্যে বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এমারশন্ সাহেবের লাঠি পড়ল সমবেত সবারই পিঠে। সভাপতি ও নেতারাও মার খেলেন। প্রাদেশিক সম্মেলন এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় সাহিত্য সম্মেলন আর সম্ভবই নয়। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি, জনপ্রিয় কবি লাঞ্ছিত হয়ে ফিরলেন কলকাতা। এই এক ধাক্কায় অনেকখানি অভিমান ভেঙ্গেচুরে পড়ে গেল। স্মরণ করিয়ে দেয় কলকাতার রাস্তায় ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে মিলে 'রাখীবন্ধনের' উল্লাস। এ উল্লাসও অনেকখানি অভিমান গলিয়ে দিয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহে কবি ভাইপো অবনী ঠাকুর প্রমুখকে নিয়ে কবি গেলেন হাওড়ায় শালিমার রেল ইয়ার্ডে।

সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর কলম চলতে লাগল। ১৯০৭-১৯০৯ লেখা 'গোরা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে রচনা করলেন উদার শুভ্র 'আনন্দময়ীর' মূর্তি। গোরার শেষ পরিচ্ছেদে ঘোষণা করলেন ভারতবাসীর নতুন আদর্শ। গোরা পরেশ বাবুকে বলছেন: আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজে স্থান পাননি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।[৭]

গোরার নিম্নের বক্তব্যগুলি যেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজের সম্বন্ধে উক্তি: আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি—আমি কেবল শহরের সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না—কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের

পাশে গিয়ে বসতে পারি নি—এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি—কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজন্যে আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি—এই শূন্যতার উপরে নানা প্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষরূপে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি। কেননা ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি—আমি তাকে যে অংশটিতে দেখতে পেতুম সে অংশের কোথাও যে আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু।[৮]

এর থেকে অগ্রসর হয়ে মহামানবের মধ্যে স্থান গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথের বিলম্ব হল না। তাই উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে, নমি নর দেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।[৯]

মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের কবিদের কথা। যেমন দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সাদির কথা: 'বনি আদম্ আ'জায়ে এক দিগরস্ত...' অর্থাৎ মানব সন্তান একে অন্যের অঙ্গ। একজনের গায়ে আঘাত লাগলে, অন্যজন যদি ব্যথা না পায় তাহলে সে মানুষই নয়। এই মানব প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ একদিন বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ-বন্ধে প্রকাশ পেয়েছিল। ইংরেজ আসার পর দীনতার বন্ধনকে ঢাকা দেবার জন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডির আত্মগরিমার মিথ্যা আস্ফালন শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবার সেই বন্ধনকে ছিন্ন করে মধ্যযুগের মানুষে মানুষে ভালবাসার বাণীকে আবার তুলে নিলেন। অন্ধ ভক্তির বদলে যৌক্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত মানব প্রেমের আবেদন এবং ভারতের গণ্ডিবিহীন জাতীয়তার উদ্দীপনা ক্রমোত্তর বেশী হতে আরও বেশী তাঁর লেখা ও বক্তব্যে স্থান পেতে লাগল।

জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় আচারনিগ্রহ যত বাধা দিতে লাগল, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ভেদ-বিভেদের দ্বারা তত বিঘ্নিত হতে লাগল, কবি তত আত্মসংকোচনকে দূরে সরিয়ে মহামিলনের হস্ত প্রসারিত করতে লাগলেন। কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ সর্বত্র এই সুর ব্যাপ্ত হল।

কবির নিজের লেখা এত সুস্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, বরং মন্তব্যে উপলব্ধির তাৎক্ষণিকতায় কিছু মন্দীভূত হয়। পাঠককে কেবল ওপরে উদ্ধৃত

এঙ্গেলস্-এর মন্তব্য 'The east fell to the west because of segregation of man from man' মনে রাখতে বলবো। নীচে কতকগুলি উদ্ধৃতি পর পর রেখে গেলাম। প্রথমেই অবশ্য সমগ্র 'লোকহিত' প্রবন্ধটির ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব :

১ ॥ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সংগে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সংগে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।[১০]

২ ॥ আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম এ কেন তখন জবাব পেলেম—যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে, অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক।[১১]

৩ ॥ তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, ভাই, তোমাকেও আমার সংগে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে, তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, 'আমরা পৃথক।'[১২]

৪ ॥ এক মানুষের সংগে আর এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সংগে আর এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা।[১৩]

৫ ॥ হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।[১৪]

৬॥ বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সংগে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সংগে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।[১৫]

৭॥ ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার এক মাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্র সমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপনি বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।[১৬]

৮॥ আমাদের ভদ্র সমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এ-জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।[১৭]

৯॥ চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বালককে বলিব 'যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও'—সে হয় না,[১৮]

১০॥ ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল, আচারে, মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ।[১৯]

১১॥ কিন্তু এক প্রদেশের সংগে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়-বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য।[২০]

১২॥ কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এনড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণ পল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া সমাজভুক্ত এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সংগ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এনড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশ নিষেধ।[২১]

বলা বাহুল্য কবিকে প্রধানত হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করে বলতে হয়েছে। সেই কারণে হিন্দু সমাজের আচার আচরণের ক্রুটির ওপর জোর দিতে হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মমতের প্রাবল্য

আর এক দরজাকে বন্ধ করে রেখেছে কবি সেকথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। আজকে আমরা দেখছি এ পথ যে শুধু মিলনের দরজা বন্ধ করছে তা নয়, মুক্ত বুদ্ধির পথ রোধ করে মুসলমানদের সর্বপ্রকার অগ্রগতি রুদ্ধ করে রেখেছে। আজ শাহ্‌বানুর তালাকের মামলা, সুপ্রীম কোর্টের রায়, মোল্লা মৌলবীদের দলবদ্ধ প্রতিবাদের চিৎকার মুসলমান সমাজের এই দুর্ভাগ্যকে আরও সুস্পষ্ট করেছে।

অতঃপর পাঠককে যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শীর্ষ পর্যায়ে '১৯১০ সালের জুলাই মাসের লেখা 'হে মোর চিত্ত/পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে।/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে[২১] বহুবার পঠিত এই কবিতাটির আগা গোড়া আর একবার পড়তে বলব।

নিজ দেশের সমাজের সমালোচনা করতে গিয়ে একথা স্মরণ করাতে ভোলেননি যে, আমাদের এইসব দুর্বলতার ও ত্রুটির সুযোগ নিচ্ছে আমাদের শত্রু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, দেশের মধ্যে ভেদ-বিভেদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, রক্তারক্তি এ-সবের দিকে সংকেত করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাসন-যন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তাহলে কখনোই ভারত ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।[২৩]

মানুষের ওপর তিনি যে আস্থা রেখেছিলেন যুদ্ধান্তে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। জাতি উপজাতি সমূহের মধ্যে ভেদ-বিভেদ দূর করে প্রীতির রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় এর রীতি তিনি দেখে এসেছেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। 'এই রকম গভর্ণমেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানের নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।'[২৮]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন একটি সোস্যালিষ্ট দেশ এবং সেখানকার কাজকর্ম। আজ আমাদের সৌভাগ্য আমরা দেখছি পৃথিবীতে অনেকগুলি সোস্যালিষ্ট দেশ। তাদের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ধনে, জ্ঞানে শক্তি সমৃদ্ধিতে পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে এবং সমস্ত নিপীড়িত ও সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত দেশ সমূহের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যে কলকাঠি নেড়ে আমাদের শোচনীয় ভেদ-বিভেদকে কাজে লাগাতে তিনি দেখেছিলেন,

আমরা আজ তা দেখছি আমেরিকার গোপন চক্রান্ত এবং প্রকাশ্যে বীভৎশ হত্যা লীলায় নিকারাগুয়ায় এবং লিবিয়ায় নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপে। আজ আদের দেশে পাঞ্জাব থেকে ত্রিপুরা ও আসাম পর্যন্ত যে ভেদ-বিভেদের কলুষক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি তার উৎসও আমেরিকা। ভারতের সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে।

ফ্যাসিজম-এর পতন রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। মানুষের প্রতি দৃঢ় আস্থা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল-এর পতন অনিবার্য। তিনি বলেছিলেন: এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে।[১৫]

আমরা দেখেছি সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ৪৫ বৎসর আগে জীবন শেষের প্রাক্ মুহূর্তে তিনি মহা-মানবের যে জয়গান করে গেছেন, আমরাও তাতে যোগদান করবো: ঐ মহা-মানব আসে, / দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/ ..../ সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, / নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,/ এল মহাজনমের লগ্ন। / .... /......... . .../ উদয় শিখরে জাগে মাভৈ: মাভৈঃ রব / নবজীবনের আশ্বাসে।/ 'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়' / মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ'র 'ভেদ, বিভেদ ধর্মান্ধতা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মাসিক পত্রিকা নন্দন-এর বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় (১৩৯৩) প্রকাশিত হয়েছিল [মে এবং জুন ১৯৮৬ / ভল্যুম ১-২ / পৃঃ ৮-১৭]। উদ্ধৃতি-সূত্রগুলি মূল প্রবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত হয়েছে। নন্দন পরিচালক মণ্ডলীর অনুমতি সাপেক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো [সম্পাদক]।

উদ্ধৃতি-সূত্র:

১. রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।
২. ঐ।
৩. ঐ। পৃঃ ৩৫।

৪. ঐ। পৃঃ ৪২।

৫. ঐ। পৃঃ ৪৭।

৬. ঐ। পৃঃ ৩৭।

৭. গোরা, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৭১।

৮. গোরা, রবীন্দ্রনাথ।

৯. ভারততীর্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. লোকহিত।

১১. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

১২. ঐ।

১৩. লোকহিত।

১৪. ঐ।

১৫. ঐ।

১৬. ঐ।

১৭. ঐ।

১৮. ঐ।

১৯. হিন্দু-মুসলমান।

২০. কনগ্রেস।

২১. হিন্দু-মুসলমান।

২২. ভারততীর্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৩. সভ্যতার সংকট।

২৪. সভ্যতার সংকট।

২৫. সভ্যতার সংকট।

হুমায়ূন আজাদ

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

১

এই উপমহাদেশের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, শত শত বছরের সহ অবস্থান ও এদেশের দুটি প্রধান অধিবাসী, হিন্দু এবং মুসলমানকে মিলিত করতে পারেনি। তারা কাছাকাছি বসবাস করেছে, অভিন্ন আলো বাতাস খাদ্য সংগ্রহ করেছে প্রাণধারণের গাঢ় প্রয়োজনে, তবু পরস্পরের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনি। বিভিন্ন বিরোধী বাতাস এসে তাদের পৃথক, দুর্বল করে গেছে। রবীন্দ্রনাথের বহু কথিত ভারততত্ত্বের সারবাণী হলো, বৈচিত্র্য এবং অনৈক্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন। এই তত্ত্ব লাভ করেছেন তিনি ভারতের ইতিহাস পাঠ করে এবং স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতোই তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের চিরবৈরিতা তাঁর এই তত্ত্বকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

২

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল চিন্তা করেছেন। এই চিন্তা অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক, সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দিক গুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন না হবার কারণসমূহ তীক্ষ্ণ চোখে অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সৎ মন্তব্য ছিলো। তাঁর মতাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় নেয়া যাক।

১৮৯৩ সালে লক্ষ্য করলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমবর্ধমান। এই বিরোধের মূলে দেখলেন সরকারকে, সরকারের নিস্পৃহ নীতি বিরোধ বাড়িয়ে তুলছে। এটি উভয় সম্প্রদায়ের অতিসচেতন বিরোধের উন্মেষকাল। তিনি দায়ী করলেন সরকারকে: ভারতবর্ষে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।[১]

'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১, ১৮৯৪) প্রবন্ধে বিরোধের চাষ যে সরকারই করে যাচ্ছেন, এ-কথা স্পষ্ট বললেন। সরকারী 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতিকে দায়ী করলেন :

> অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট এবং হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।[২] তাঁর মনে হলো, সরকার যেন অনেকটা মুসলমানের পক্ষাবলম্বী।[৩]

'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০) প্রবন্ধে লক্ষ্য করলেন, সরকার কংগ্রেসকে আঘাত করছেন না, তবে চেষ্টা করছেন যাতে মুসলমান কংগ্রেসে যোগ না দেয়।[৪] উভয়ের ঐক্যই সরকারের আতঙ্ক। রাজনীতি এবং ঐক্যক্ষেত্রে মুসলমানের অধিকার আছে বলে তাঁর মনে হলো :

> আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিক্যাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে. মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কনগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।[৫]

এ পর্যন্ত তিনি বিরোধের জন্য দায়ী করেছেন সরকারকে। ১৯০৭ সালে তাঁর মতবদল ঘটলো। বিরোধের কারণ সরকার নয়, আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪) প্রবন্ধে বুঝালেন, ইংরেজ যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তবে ইংরেজের ওপর রাগ করে ফল হবে না। ইংরেজ শত্রু, সে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করবে। তাই তিনি মূল কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দিলেন :

> মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নহে। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব, শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু

যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।[৬]

তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো পাপের মূলবিন্দুতে। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান, তিনি একে নৈতিক দিক দিয়ে দেখে বললেন 'পাপ', আর এই পাপ অনেক দিনের। এখন বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়েছে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের যথার্থ সম্পর্কটি তুলে ধরলেন :

আর মিথ্যা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।[৭]

এই বিরুদ্ধতার জন্যেই তারা শত শত বছর ধরে অশান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করেছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। এই সম্পর্কবিপর্যয়ের জন্যে তিনি দায়ী করলেন হিন্দুকে এবং নিজে সাক্ষ্য দিলেন :

আমরা জানি, বাংলা দেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।[৮]

হিন্দু এসব কাজের দোষক্ষালনার্থে দোহাই দেয় শাস্ত্রের। তিনি দৃঢ়মত পোষণ করলেন যে, এমন শাস্ত্র নিয়ে কোনোদিন স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে না।[৯] পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর 'সভাপতির অভিভাষণ'-এ (১৩১৪, ১৯০৭) তিনি উভয়ের বিরোধের কারণগুলি বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখলেন এবং সমাধান দানের চেষ্টা করলেন। দেখালেন হিন্দু-মুসলমানের অন্য নানাবিধ পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অসাম্যজাত পার্থক্য। হিন্দু লেখাপড়া শিখেছে আগে থেকেই, সরকারী চাকুরি পেয়েছে, ফলত পার্থক্য জন্মেছে। তিনি মনে করলেন, এই পার্থক্য দূরীভূত না হলে মনের মিল হবে না।[১০] তিনি এই অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পার্থক্যের আশু বিলোপ কামনা করলেন :

মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা

ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।[১১]

ভারতবর্ষের সমস্যা বিপুল। এতো ভাষা জাতি আচার অন্যত্র কোথাও নেই, অথচ তিনি এদের নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের দরকার বোধ করেন। এই মহাজাতি গঠনে হিন্দু-মুসলমানের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনো মিলনলক্ষণই এদের মধ্যে দেখলেন না, বরং বঙ্গভঙ্গের সময়ে দেখলেন :

হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।[১২]

মুসলমান বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে যোগ দেয়নি, তার জন্যে তিনি সরকারকে নয়, দায়ী করলেন নিজেদের। নিজেদের অন্তর্গত পাপরাশির অশুভ ক্রিয়ার কথা পুনরায় বললেন। তাঁর মনে হলো, সরকার যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগিয়েই থাকে, তবে সে বরং একটি বাস্তব সত্য সম্পর্কে দেশ-বাসীকে সজাগ করে উপকার করেছে।[১৩] 'সদুপায়' (১৩১৫, ১৯০৮) প্রবন্ধে লক্ষ্য করেন, পূর্ববঙ্গ মুসলমানগরিষ্ঠ দেশ, আর তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। ভাষা, সাহিত্য এবং অন্য কতিপয় ক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে তাদের বন্ধনও রয়েছে। তিনি বোধ করলেন, বঙ্গভঙ্গ এই বন্ধনকে শিথিল করবে। এর কারণ উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য :

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই ; দুই পক্ষে এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।[১৪]

এ-মিলন যান্ত্রিক, স্বাভাবিক নয়। বঙ্গভঙ্গ এই মিলনকেও উচ্ছেদ করবে। এই বিচ্ছেদ এড়ানোর জন্যে তিনি নিজেদের মিলন-প্রচেষ্টা দরকার বলে বোধ করলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ আশ্রয় নিলেন বয়কটের, বিলাতি লবণ ও বস্ত্র বহিষ্কারকেই তাঁরা সমস্যা সমাধানের উপায় জ্ঞান করলেন। হিন্দুরা মুসলমানদেরও আন্দোলনে অংশ নেবার আহ্বান জানালো। তাঁর মতে, এই আহ্বান গরজের, হৃদয়ের নয়, তাই মুসলমান সাড়া দেয়নি। তিনি মুসলমান-দের সাড়া না দেবার কারণ এবং আন্দোলকদের ত্রুটি তুলে ধরলেন :

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন খামখা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমন তরো ঘটে না।[১৫]

এই প্রবন্ধেও তিনি স্বীকার করেন, মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু কদাচ ভালো ব্যবহার করেনি, এবং সামাজিক ব্যবহারে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেব পশুর অধিক ঘৃণা করে।[১৬] 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১১) প্রবন্ধেও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। দেখালেন, তাদের আহ্বান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে। দেশে যখন রাজনৈতিক ঐক্য লাভের প্রয়োজন দেখা দিলো, তখনই হিন্দু আহ্বান করলো মুসলমানকে।[১৭] এ ডাক প্রয়োজনের, ভালোবাসার নয়, তাই আহ্বান সাড়া পায়নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যবর্তী একটি 'সত্য পার্থক্য' স্বীকার করে হিন্দুর অহ্বানের অন্তসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করলেন :

> হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন অহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজে উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পেছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।[১৮]

তিনি দেখতে চাইলেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যানুভূতি কোন্ সময় থেকে তীব্রতা লাভ করলো। দেখলেন, হিন্দু যখন 'হিন্দুত্ব' নিয়ে গৌরব গান

শুরু করলো, মুসলমানের মুসলমানিত্বও তখনি মাথাচাড়া দিলো। এর ফলাফল :

এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।[১৯]

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দিত করলেন এবং এই প্রয়াসের মধ্যেই উভয়ের মিলনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেন।[২০] ১৯০৭ সালে তিনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি কামনা করেছেন, ১৯১১ সালে 'পদমানের রাস্তা'য় তাদের দ্রুতগতি কামনা করলেন।[২১] এ-সময়ে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে। এর মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করলেন, তাকে 'সত্য ও স্থায়ী' পদার্থ ভাবলেন না, এর মধ্যে যা সত্য পদার্থ আবিষ্কার করলেন তা মুসলমানের আত্মোপলব্ধি :

ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।[২২]

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান যোগ দেয়নি রাজনৈতিক কারণে। তিনি এই রাজনৈতিক কারণ স্বীকার করেও অনৈক্যের সামাজিক কারণ লক্ষ্য করে এসেছেন। যাদের সামাজিক ঐক্য নেই, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি দুঃসাধ্য। কেবল আবেদন যথেষ্ট নয়। পূর্বের মতো, 'লোকহিত' (১৩২১, ১৯১৪) প্রবন্ধে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেন :

একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই ; যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত বুকে টানিবার নাট্য-ভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।[২৩]

তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক সহৃদয় সম্পর্ক। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, স্বদেশী প্রচারক ও মুসলমান সহকর্মীর সঙ্গে এক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জল খায় না।[২৪]

তাঁর মতে, অফিস, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে মুসলমান পশ্চাৎপদ, সেখানে ঠেলাঠেলি গায়ে লাগে, কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।[২৫] এ সমস্ত কারণে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এজন্য তিনি দোষী করলেন নিজেদের, হিন্দুদের।[২৬] ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট বিলাতের পার্লামেন্টের সামনে ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতের ভাবী শাসনের আভাস দেন। তিনি বলেন, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার দেয়া হবে by successive stages.[২৭] সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১৭) বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষে মুসলমানদের ওপরে জুলুম করে। ২৮ সেপ্টেম্বরে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়, ২ অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ অক্টোবরে গয়া জেলার তিনটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায়।[২৮] এই দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'ছোট ও বড়ো' (১৩২৪, ১৯১৭) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূলে দেখলেন দুটি বস্তু —ধর্ম ও সরকার। মত দিলেন যে, এ দেশের ধর্ম আচার সর্বস্ব অসহনশীল, নিজের আচার অপরের ওপর আরোপ করতে যেয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। হিন্দুকে দোষী করলেন :

> নিজে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া কোনো নাম দেওয়া যায় না।[২৯]

ধর্ম যতোদিন আচার সর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিল হওয়া তাঁর কাছে অসম্ভব বোধ হলো, মিলনের উপায় হিসেবে নির্দেশ করলেন 'দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল'কে।[৩০] দেশবাসীর যৌথ দায়িত্বহীনতাও মিলনের প্রতিবন্ধক আর বলে তাঁর বোধ হলো।[৩১]

১৯১৭ থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের জন্য একটি বস্তুকেই প্রধাণত দায়ী করতে থাকলেন, সেটি ধর্ম। এদের বিভেদের মূলে ধর্মের প্রভাব কতোখানি, কোন ধর্ম এর জন্যে কতোটা দায়ী, ধর্মের ছোবল এড়িয়ে তারা কোনোদিন মিলিত হতে পারবে কিনা—১৯১৭ থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এ-বিষয়ে বারংবার চিন্তা করেছেন। ১৩২৯ সালে (১৯২২) কালিদাস নাগের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হলো, 'কালান্তর' গ্রন্থে পত্রটি 'হিন্দু-মুসলমান' নামে মুদ্রিত। প্রবন্ধে দু'টি ধর্মের স্বপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে দেখলেন,

এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা অত্যল্প। এই বিশ্লেষণে খ্রীষ্টধর্মকে এনে দেখালেন, পৃথিবীতে দু'টি সম্প্রদায় বিদ্যমান, যাদের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের বিরোধ অত্যুগ্র। এই ধর্মদ্বয়—'খ্রীস্টান আর মুসলমান-ধর্ম'। এরা স্বধর্ম পালন করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতেও এরা উদ্যত। তাই এদের সঙ্গে মেলার উপায় ঐ ধর্মাবলম্বন। হিন্দু ধর্মও তেমনি, তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সকর্মক নয়, অনেকটা অসহযোগিতামূলক। এই ধর্মের বড়ো ত্রুটি এর আচারসর্বস্বতা।[৩২] তাই, তাঁর মতে 'মুসলমান ধর্ম' গ্রহণ করে মুসলমানের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায়না। কেননা, আহারে বিহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু ধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমান হিন্দুকে মসজিদ বা অন্যত্র যতটা টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারেনি। তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেওয়া হয় জাজিমের এক প্রান্ত তুলে।[৩৩] তিনি এদের মিলন সম্পর্কে যেন অনেকটা হতাশ :

> ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ; ধর্ম মতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে।[৩৪]

বললেন, 'হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ', এর প্রকৃতি নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান।[৩৫] রবীন্দ্রনাথের মতোই কাজী আব্দুল ওদুদ মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেছেন :

> আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি সে চিরদিন শ্রদ্ধাবান, কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গোঁড়া। বিধর্মীর ভাষা, আচার, এসব সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরে।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মিলন, তাঁর সমকালে, অসম্ভব বোধ হয়েছে। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার বোধ করলেন 'মনের পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন,' 'সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি'র এবং ইউরোপের মতো উভয়ের

মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন।[৩৭] এ সকলের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলেন শিক্ষার, সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকার বোধ করলেন কালান্তরের:

হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।[৩৮]

এদের মিলন সম্পর্কে ১৩২৯ সালের মত পুনরুত্থাপিত করলেন ১৩৩০-এ (১৯২৩)। 'সমস্যা' (১৩৩০) প্রবন্ধে দেখালেন, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উভয় সম্পদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব। এর প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, ঐ মিলনের পরেও উভয়ের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। এই বিরোধের জন্যে রাজনীতিবিদরা দোষী করেন সরকারকে, আর তিনি করেন আত্মমধ্যস্থ 'পাপ' কে।[৩৯] ধর্মই দায়ী:

ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া।[৪০]

তিনি দেখলেন, উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মরজ্জুতে বাঁধা মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক যোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই।[৪১] এই ধর্ম যতখানি আচারচালিত, ততখানি শাস্ত্রনির্ভর নয়। উভয়ের বিরোধিতার চিত্র উন্মোচন করলেন:

আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।[৪২]

লক্ষ্য করলেন, তাদের মিল হয় একমাত্র 'তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে'। দেখালেন, এ মিলন অসত্য, ঐ জন্যেই বঙ্গভঙ্গের সময়ে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মেলেনি, কেননা বঙ্গভঙ্গে তাদের দুঃখ ছিলো না। কিন্তু 'অসহযোগ-আন্দোলনে' সে হিন্দুর সঙ্গে মিলেছে, কেননা রুম সাম্রাজ্যের দুঃখ মুসলমানের কাছে বাস্তব। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বলেই এ মিলন অস্থায়ী।[৪৩] কিন্তু এদের মিলন তার নানা কারণে কাম্য। বললেন:

ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। এই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা

পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়লক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।[৪৪]

১৩৩২ সালে (১৯২৫) 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধেও উভয়ের মিলনের বাধা হিসেবে দেখলেন উভয়ের চিরাগত মানসিক সংস্কারকে।[৪৫] এই সংস্কারবশতঃই তারা স্বরাজলাভের লোভের মধ্যেও ভুলতে পারে না যে, তারা পরস্পরের কাছে কাফের বা ম্লেচ্ছ। খিলাফত আন্দোলনও তাদের মানসিক কুসংস্কার নিষ্কাশিত করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের উন্নতির জন্যে তিনি উভয়ের মিলনকে জরুরী ভেবেছেন :

> ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করবো।[৪৬]

মত দিলেন, সামাজিক ভেদ পেরিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য অসম্ভব।[৪৭] এই মিলন-সূত্র আবিষ্কারার্থে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন। 'বৃহত্তর ভারত' (১৩৩৪, ১৯২৭) প্রবন্ধে দেখালেন, মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুর ধর্মবিরোধের সময়ে জন্ম নেন সাধুসন্তগণ। তাঁরা 'আত্মীয়তার সত্যে'র দ্বারা উভয়কে বাঁধতে চেয়েছেন। এই সাধকদের অনেকেই মুসলমান। তাঁদের বন্ধন-পদ্ধতি :

> তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিক্যাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব।[৪৮]

'হিন্দু-মুসলমান' (১৩৩৮, ১৯৩১) প্রবন্ধে ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। ধর্মই মিলনের বাধা—এ-বিশ্বাসে তিনি দৃঢ়। ভারতের মহাজাতি গঠনে ধর্মের বাধাটা তাঁর কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বোধ হলো। তাই 'বিকৃত' এই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষও প্রচার করলেন। রুশবিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব, স্পেনের বিপ্লব, মেক্সিকোর বিদ্রোহের ইতিহাসের কারণ নিয়ে দেখালেন, ঐ সমস্ত ভূখণ্ডে নবজীবনের আহ্বানে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।[৪৯] তাঁর বিদ্রোহ অবশ্য আদি প্রবর্তকদের মিলনকামী ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, ঐ বিকৃত ধর্মের স্বরূপ :

> তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত

করেছে, সংকীর্ণ করেছে ; সেই ধর্ম নিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয় বুদ্ধি দিয়েও নয়, ... [৫০]

তিনি সমকালে দেশান্তরে ধর্মবিদ্বেষ দেখছেন, কিন্তু,

আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান ।[৫১]

সামাজিক কক্ষ রেখে রাজনৈতিক রাজপথের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা পৃথক নির্বাচন দাবি করেছে। তিনি তাদের দাবি মেনে নিলেন ।[৫২] তাঁর বিশ্বাস, এতে মিল হবে। তবে ধর্মের সমস্যাটি রয়ে যাবে। এক দলের মসজিদের সামনে ঢাক বাজানোর উৎসাহ এবং অপর দলের কোরবানির সংখ্যাবৃদ্ধির আনন্দটা, তাঁর মতে, পরস্পর নিঃসম্পর্কিত শহরেই বেশী। মিলনের জন্য কামনা করলেন পরস্পরের মধ্যে আলাপ ও কাছাকাছি আগমন।[৫৩] কিন্তু এদের মিলন ঘটেনি। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই এরা পৃথক হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ১৩১২ সালে (১৯০৫) তিনি গভীর আবেগে বলেছিলেন :

কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে ; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছি।[৫৪]

এতোখানি প্রগাড় আবেগ যে ব্যর্থ হলো তার অমোঘ বীজ নিহিত ছিলো এদেশবাসীর ইতিহাসের মধ্যেই। সে-বিষয়ে রবীন্দ্রবাণীই উদ্ধার করা যায় :

আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে, এ-ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না।[৫৫]

৩

আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি একটি জটিল প্রশ্ন। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গডে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-

মুসলমান সমস্যা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ-দৃষ্টি মূলত সামাজিক, গৌণত রাজনৈতিক। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি এই সমস্যার কারণগুলো দেখেছেন, রাজনৈতিক কোণ থেকে যে দেখেননি এমন নয়, তবে রাজনৈতিক প্রশ্নটি তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেনি। তিনি চেয়েছিলেন, উভয়ের সামাজিক সৌহার্দ্য, পরস্পরের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ। যে-সম্পর্ক যান্ত্রিক, তাকে তিনি কদাচ মূল্য দেননি। হিন্দু-মুসলমানের বেলাতেও তাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ তুচ্ছকারী একটি জৈবিক সম্পর্ক তাঁর কাম্য ছিলো। উভয়ের সম্পর্কতিক্ততার যে-কটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলো মোটামুটিভাবে:

ক. সরকারী ভেদনীতি,

খ. অর্থ নৈতিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য বৈষম্য,

গ. ধর্মের উগ্রতা ও আচারসর্বস্বতা,

ঘ. রাজনৈতিক আন্দোলন।

হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক বিপর্যয় প্রদর্শক, উনবিংশ শতকের রচিত তাঁর প্রবন্ধ পেয়েছি আমরা তিনটি—'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১)। উনবিংশ শতকে তিনি বিরোধের মূলে দেখেছেন সরকারকে। সরকারই বিভেদ বাড়িয়ে তুলেছে। সরকারের নীতি 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'। তিনি এমনও বলেছেন যে, সরকার যেন মুসলমানদের অনেকটা সহায়তা করেছে, হিন্দুদের দমন করতে চাচ্ছে। সরকারী নীতিটি তিনি যথার্থ ধরেছেন। ১৮৭০ থেকে সরকার মুসলমানের আনুকূল্য শুরু করেন। অবশ্য এই আনুকূল্য কথাবার্তা, বক্তৃতাতেই বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ থাকতো। এই পক্ষপাত বঙ্গভঙ্গের পরে চরম আকার পরিগ্রহ করে ব্যামফিল্ড ফুলারের উৎকট মন্তব্যে, 'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর দুই স্ত্রীর মতো: এর মধ্যে মুসলমান প্রিয়তর'।[৫৩]

রবীন্দ্রনাথে উনবিংশ শতকে বিরোধের মূলে দেখেছেন বিদেশী সরকারকে। ১৯০৭ সালে তিনি বিরোধের কারণসমূহ দেখতে চাইলেন আরো নিপুণভাবে, গভীর দৃষ্টিতে এসব বিরোধোর বীজ আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। দেখলেন 'পাপে'র বসবাস নিজেদের মধ্যে, তাই সরকারকে দোষী করে লাভ নেই, ধিক্কার দিলেন নিজেদের অন্তর্গত পাপকে। স্বীকার করেছেন, এরা

কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিরুদ্ধ। উভয়ের বিরোধের কারণ স্বরূপ অর্থ নৈতিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য অসাম্য দেখিয়েছেন। সামাজিক সৌহার্দ্য যে সংস্থাপিত হয়নি, এর জন্য বারংবার তিনি হিন্দুকেই দায়ী করেছেন। মিলনের জন্য সমস্ত অসাম্য বিদূরণের তীব্র বাসনা তিনি পোষণ করেছেন। এখানে দেখা যাবে মিলনার্থে তাঁর মধ্যে মানবিক উৎকণ্ঠা প্রবল। তাই বারংবার বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্দুর আহ্বানের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। হিন্দুর ত্রুটি প্রদর্শনে তিনি অস্বাভাবিক নির্মম, মুসলমানের ত্রুটি বিশেষ তিনি দেখাননি। ১৯১১ সালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্রতা লাভের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন। 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেদিন হিন্দুত্বের গৌরব গাথা শুরু করলো, মুসলমান ও সেদিন মুসলমানিত্বের গর্ববোধ করতে লাগলো। মুসলমানের আত্মোন্নতি চেষ্টাকে তিনি মিলনের সিঁড়ি জ্ঞান করেছেন :

> মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।[৫৭]

১৯১১ সালে তিনি মুসলমানের আত্মশক্তি সাধনাকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৪২ সালের ১১ এপ্রিলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :

> পঁচিশ বছর ধরে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার পর এবং এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, মুসলমানেরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দু'টি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্যকরা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে। ...মুসলিম লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারত বিভক্ত করে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।[৫৮]

জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে একার্থবোধ মনে করেন।[৫৯] আমরা ভিন্ন মত পোষন করি কেননা, মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কল্পনা তিনি করেননি। তিনি চেয়েছিলেন একই মঙ্গলমূলক রাষ্ট্রে সুখে, শান্তিতে, গাঢ় বন্ধনে উভয়ের বসবাস। ১৯৩৫ সালে ২৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান যদি না মেলে তবে 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জলভরা'।[৬০] ১৯১৪

সালে দেখালেন, সামাজিক মিলন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক মিলন অসম্ভব। ১৯১৭ সালে বিরোধের জন্য মূলতঃ দায়ী করলেন ধর্মকে। ধর্ম উভয়ের মধ্যবর্তী মিলনবিরোধী রূঢ় দেওয়াল, এবোধ দৃঢ় হলো ১৯১৭ তে এবং পরবর্তী সমগ্র জীবন বিরোধের জন্য ধর্মকে নিন্দা করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর কাম্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে তাঁর অমিল। গান্ধীজী বুঝেছিলেন, মানুষ যদি ধর্মনিষ্ঠ হয় তবে মিলন সম্ভব হবে। তিনি ভুল বুঝেছিলেন এবং জনসাধারণ তাঁকে আরো ভুল বুঝেছিলো। এজন্যে ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ততার জন্যে সমালোচক তাঁকে দায়ী করেছেন।[৬১]

ধর্মকে যে তিনি এতোবেশী দায়ী করলেন, তার কারণ বোঝা দরকার। কারণ বুঝতে পারলেই বুঝবো উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর কি প্রত্যাশা ছিলো। রাষ্ট্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিমুখ, কল্যান ও প্রেমধর্মী সমাজমুখী। যে সমাজে রয়েছে গতি-স্থিতি, যার অধিবাসীরা সামাজিক বন্ধনে যুক্ত, পরস্পরের স্বার্থ-বন্ধনে নয়, হৃদয়েবন্ধনে আবদ্ধ, সে-সমাজ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সমাজ। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিলো তাঁর কামনা। কিন্তু ধর্ম তা হতে দেয়নি। এ-কারণেই ধর্মকে নিন্দিত, দায়ী করলেন সর্বাধিক, কেননা তা সামাজিক মিলনের পরিপন্থী। যে-মিলন সামাজিক এবং হৃদয়ধর্মবশতঃ নয়, তাতে তিনি আস্থাহীন, তিনি বুঝেছিলেন, সমাজে যদি উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়, তবে সাধিত হবে রাষ্ট্রেও। সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের কাম্য এবং সামাজিক দেয়ানেয়াকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে যুগপরিবর্তনের হাতে ছেড়ে দেন ১৯২২-এ। তিনি বোধ করেছেন, বিংশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভুগছি, তাই আধুনিক যুগের আলো চেয়েছেন।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেননি। তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীদের মতো।

ডঃ হুমায়ুন আজাদের এই লেখাটি পাকিস্তান আমলে প্রকাশের অনুমতি পাওয়া যায় নি। একারনে এটি বাংলা একাডেমী পত্রিকার .৩৭৭ সালের

শীত সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এটি তাই একাডেমী পত্রিকার ষষ্ঠ দশ বর্ষ শীত সংখ্যায় [১৩৭৮] পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটি পরে লেখকের 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা (১৯৭৩)' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।
[সম্পাদক]

টীকা-টিপ্পনী

১. ইংরেজ ও ভারতবাসী ; 'রাজাপ্রজা,' রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭ ; ৩৯২।
২. সুবিচারের অধিকার : ঐ। ৪৮১-১৯।
৩. ঐ। ঐ। ৪২০।
৪. ইংরেজের আতংক : পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র রচনাবলী (১০) ১৩৫৭, ৫৩৮।
৫. ঐ। ঐ। ৫৩৮।
৬. ব্যাধি ও প্রতিকার : ঐ। ৬২৭।
৭. : পরিশিষ্ট রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ৬২৮।
৮. ঐ। ঐ। ৬২৮।
৯. ঐ। ঐ। ৬২৮।
১০. সভাপতির অভিভাষণ : সমূহ, রবীন্দ্র রচনাবলী (১০) ১৩৫৭ ; ৫০১।
১১. ঐ। ঐ। ৫০১।
১২. সমস্যা : রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭ ; ৪৮০।
১৩. সমস্যা : রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭ ; ৪৮১।
১৪. সদুপায় : সমূহ : রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭ ; ৫২৩।
১৫. ঐ। ঐ ; ৫২৬।
১৬. ঐ। ঐ ; ৫২৮।
১৭. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় : পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ১৩৬১, ৪৭৪।
১৮. ঐ। ঐ। ৪৭৪।
১৯. ঐ। ঐ। ৪৭৫।
২০. ঐ। ঐ। ৪৭৫।
২১. ঐ। ঐ। ৪৭৬।
২২. ঐ। ঐ। ৪৭৬

২৩. লোকহিত : কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪), ১৩৫৪ ; ২৬১—'৬২ ।

২৫. ঐ ঐ ২৬২ ।

২৪. ঐ ঐ ২৬২ ।

২৬. ঐ ঐ ২৬২ ।

২৭. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (১ম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮, বিশ্বভারতী, পৃ : ৪৯৯ ।

২৮. ঐ ঐ পাদটীকা ; ৫০৩ ।

২৯. ছোট ও বড়ো : কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪), ৩৭৫ ।

৩০. ঐ ঐ ২৭৪ ।

৩১. ঐ ঐ ২৭৫ ।

৩২. হিন্দু-মুসলমান : কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪), ৩৭৫ ।

৩৩. ঐ ঐ ৩৭৬ ।

৩৪. ঐ ঐ ৩৭৬ ।

৩৫. ঐ ঐ ৩৭৬ ।

৩৬. বাংলার জাগরণ : ১৩৬৩ ; ১১৭ ।

৩৭. হিন্দু-মুসলমান : কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪) ; ৩৭৬ ।

৩৮. ঐ ঐ ৩৭৭ ।

৩৯. সমস্যা ঐ ৩৪৬ ।

৪০. ঐ ঐ ৩৪৮ ।

৪১, ঐ ঐ ৩৫৩ ।

৪২. ঐ ঐ ৩৫৪ ।

৪৩. ঐ ঐ ৩৫৪ ।

৪৪. ঐ ঐ ৩৫৬ ।

৪৫. স্বরাজ সাধন : কালান্তর, সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৪) ; ৪১৭ ।

৪৬. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (১৩৩৩) : কালান্তর, সংযোজন, ঐ ; ৪৩৩ ।

৪৭. ঐ ঐ ৪৩৪ ।

৪৮. বৃহত্তর ভারত : ঐ ৩৭২ ।

৪৯. হিন্দু-মুসলমান কালান্তর, সংযোজন, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪) ৪৪৫-৪৬ ।

৫০. হিন্দু-মুসলমান কালান্তর— ৪৪৬ ।

৫১.   ৪৪৬।

৫২.   ঐ   ঐ   ৪৪৮।

৫৩.   ঐ   ঐ   ৪৫০।

৫৪   অবস্থা ও ব্যবস্থা : আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, (৩), ৬১৯।

৫৫.   ঐ   ঐ   ৬১৯।

৫৬.   ড. আনিসুজ্জামান মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, অক্টোবর ১৯৬৪; ৯৬-৯৭।

৫৭.   হিন্দু বিদ্যালয় : পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ১৩৭১; ৪৭৮।

৫৮.   উদ্ধৃতি ও অনুবাদ : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক; সমকাল, বৈশাখ ১৩৬৮; ৬৫৯।

৫৯.   ঐ   ঐ;   ৬৫৯।

৬০.   প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (৪র্থ খণ্ড), ১৩৬৩; ৭।

৬১.   কাজী আবদুল ওদুদ : শাশ্বত বঙ্গ, ১৩৫৮, ১৯৬।

*স্বরোচিষ সরকার

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

১

ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা এমন এক সামাজিক সংস্কার যার ফলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা আপমব নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের অপবিত্র ভেবে স্পর্শের অযোগ্য জ্ঞান করে এবং তাদের কাছ থেকে সমস্ত প্রকার সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে চলে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের একই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সমাজের এই ঘৃণাপূর্ণ আচরণ যে পেশানির্ভর বা শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্নে নয়, আপামর মুসলমান সমাজের প্রতি তাদের এই মনোভাব তার প্রমাণ। চিরন্তরা যে মানবঘৃণা[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গোষ্ঠীর সংগে গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের সংগে সম্প্রদায়ের, জাতির সংগে জাতির, এমন কি অতি সাম্প্রতিককালে কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের সম্পর্কের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় অস্পৃশ্যতা তারই একটি ভারতীয় দৃষ্টান্ত।

নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা 'অস্পৃশ্য' নামে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে একটি ঘৃণিত সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত—এ তথ্য রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিলো না। হিন্দু সমাজ বহির্ভূত থেকে সে ঘৃণা মুসলমানদের ভাগ্যেও জুটেছে, তাও তিনি দেখেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অমানবিক, ভ্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি কিভাবে ঘটেছিল এবং এই মানবতা বিরোধী সংস্কারকে সমাজ থেকে উচ্ছেদের প্রয়োজনে তার ভূমিকা ছিলো কোন ধরনের, তা নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনার অবকাশ আছে।

২

ছেলেবেলা থেকে যে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ছিল, সেখানে তিনি দেখেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ জীবনযাত্রার জন্যে সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেও সমাজের সেবা করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত তথাকথিত ভদ্রলোকদের কাছে এরা

ছোটলোক বলে গণ্য হবে এবং সেই সূত্রে নিম্নবর্ণের হলে অস্পৃশ্য বলেও বিবেচিত। সমাজের এই অমানবিক শ্রেণীবিন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেন নি। তবে রাশিয়া ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই শ্রেণীসচেতনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সক্রিয় হলে এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব, এমন ধারণা তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ করার পরেই জন্মে। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে তিনি দেখতে পান, সে দেশের সকল মানুষই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের ফলে সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন: যা দেখেছি আশ্চর্য ঠেকেছে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়, একেবারে মূল প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।[২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দশকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবী মানুষ তথা নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং তার অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাবও অনেক প্রবল হয়েছিলো, এর পিছনে এই ভ্রমণের যে ব্যাপক প্রভাব ছিলো, তা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই শুরু হয়।

তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সর্বশ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। ১৯২৯ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত মুহম্মদ আলী জিন্নার চৌদ্দ দফা[৩] দাবির ওপর অনেকটা ভিত্তি করে রচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার খসড়া বিল প্রকাশ করেন (১৭ আগস্ট ১৯৩২)।[৪] ঐ বিলে মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র বা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেয়া হয়।[৫] হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীগুলোকে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে তাদের জন্যেও কিছু আসন নির্ধারিত হয়েছিল।[৬] হিন্দু সমাজের এই বিভক্তিকরণে তৎকালীন কংগ্রেস নেতাগণ শংকিত হন। একে তো হিন্দু মুসলমান ভেদনীতি ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তার ওপরে বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত হিন্দুদের দুটি স্বতন্ত্র নির্বাচক শ্রেণী গঠনের প্রস্তাব, হিন্দু সমাজের

মধ্যে একটা প্রতিপক্ষ শক্তি খাড়া করে কংগ্রেসকে দুর্বল করার এক মারাত্মক কূটকৌশল বলে তাঁরা মনে করেন।[৭] আমরণ অনশন পণ করে মহাত্মা গান্ধী এ নীতির প্রতিবাদ জানান (১৮ সেপ্টেম্বর)। গান্ধীজী অনশন শুরু করলে কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত হিন্দুদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি রফা হয়, ইতিহাসে তা 'পুনাচুক্তি' নামে খ্যাত। এই রফায় স্থির হয় যে অনুন্নত সমাজের জন্যে জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংরক্ষিত, থাকবে এবং যুক্ত নির্বাচন অর্থাৎ বর্ণহিন্দু ও তপশিলভূক্ত হিন্দুদের যুক্ত ভোটের মাধ্যমে 'সাধারণ' ও 'তপশীলী' সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

আপাতত একটা রফা হলেও মহাত্মা গান্ধী বুঝতে পারলেন, অস্পৃশ্যতাই মূলত হিন্দু সমাজকে এভাবে বিভক্ত করেছে। তাই অনশন ভঙ্গকালীন আবেদনে তিনি ঘোষণা করেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ থাকবে, দেশের সমস্ত শক্তি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে।[৮] সারা দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ অভিযান সংগঠন ও পরিচালনা করার জন্যে এ সময়ে তাই নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি (All India Anti untouchability league) গঠিত হয়।[৯] রবীন্দ্রনাথের ওপরেও এ আন্দোলনের প্রভাব পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিলো। বস্তুত, এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনকে অস্পৃশ্যতা বিরোধিতায় অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের অংশ স্বরূপ 'অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ' আন্দোলণে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনও তাই খুব জোরালোভাবে প্রশংসা পায়। কেরালায় কোলাপান নামক গান্ধীজীর এক অনুগামী, অস্পৃশ্যদের গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে আমরণ অনশন পণ করেন।[১০] রবীন্দ্রনাথ এ সংবাদ পেয়ে কোচিন মহারাজ জামোরিণকে লেখা দীর্ঘ পত্রে (২ ডিসেম্বর ১৯৩২) হিন্দুমাত্রেরই দেবমন্দিরে প্রবেশের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে নিতে অনুরোধ জানান।[১১] এ সময়ে লেখা 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি', 'মুক্তি, '.প্রেমের সোনা', স্নান সমাপন', প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতায় যে অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা উক্ত আন্দোলনেরই পরিপূরক।

৩

অস্পৃশ্যতাবিরোধিতায় যারা ভারতময় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে প্রয়াসী হন, তাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথও

তাঁর লেখায় এবং ভাষণে অস্পৃশ্যতা সৃষ্ট দুর্গতির শোচনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে বারে বারে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন। গান্ধীজির সংঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক মিলের কথা উল্লেখ করে সুধীর চন্দ্র কর লিখেছেন :

> ভারতের যুগ প্রবর্তক এই মহামানবের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেছিল সমাজের সংঙ্গে সমাজ-অবহেলিত নিম্নতম কোটি কোটি লোকের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা ঘুচাবার একটি ঐকান্তিক লক্ষ্যে। সেদিন যে বেদনায় এ দুজনে মিলেছিলেন তা শুধু অন্নপাণ প্রচলনেই প্রশমিত হবার মতো নয়, অস্পৃশ্যের মধ্যে মানুষের দুর্গতি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, সর্বদিক দিয়েই তার বিলীনত তাদের কাম ছিল।[১২]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব গঠনে গান্ধীজীর প্রভাব ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়।

এমন কোনো নামকরণকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি, যে নাম পূর্ব নিধারিত অস্পৃশ্য সমাজকেই নির্দেশিত করবে। আধুনিক ভারতের দিকে তাকালেও রবীন্দ্র চিন্তার বৈশিষ্ট্যের কারণ বুঝে ওঠা কঠিন নয়। গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' আখ্যায় ভূষিত করেন। তাঁর এ নামকরণের পিছনে হয়তো মহৎ উদ্দেশ্যই নিহিত ছিলো। কিন্তু 'হরিজন' বলতে শুধু যে আজ তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' সমাজকেই নির্দেশিত করে তা নয়, সেই সঙ্গে যে অনুকম্পার ভাবটি জড়িত থাকে, তা অপমানিত করে বিশ্বমানবতাকে। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান্ধীজী প্রবর্তিত 'হরিজন' শব্দটির প্রয়োগ তাই সঠিক বা সমীচীন মনে হয়নি।[১৩] এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দটিও তাঁর মনঃপূত ছিলো না।[১৪] এই জন্যে শান্তিনিকেতনে 'অস্পৃশ্যতা নিরোধ কমিটি' গঠিত না হয়ে, একই উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তার নাম করেছিলো 'সংস্কার-সমিতি'। অস্পৃশ্যদের নাম হয়েছিলো 'দুর্গত।'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধিতা প্রথম সাংগঠনিক রূপ নেয় ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বর 'সংস্কার-সমিতি' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।[১৫] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় গঠিত উক্ত 'সংস্কার-সমিতি'র তৎকালীন নেতা ছিলেন সুধীর চন্দ্র কর। সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। সুজিত কুমার বলেন, প্রথম পর্যায়ের 'সংস্কার সমিতি' গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। অস্পৃশ্যতাবিরোধিতা তখন এর প্রধান উদ্দেশ্য না হলেও সমস্ত প্রকার

কুসংস্কারকে সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ সমিতির উদ্ভব হয়। তাঁর মতে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সংস্কার-সমিতি' উত্তরায়ণের 'উদয়ন' গৃহে ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৬] সুজিত কুমার নিজেকে উক্ত সমিতির প্রথম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ বলে নিজেকে দাবি করেন।[১৭] প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমোক্ত মতকেই অধিকতর গ্রহনযোগ্য মনে করেছেন।[১৮] ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বরে 'সংস্কার সমিতির' প্রথম সর্বজনীন নিবেদনে রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার বীভৎস রূপকে তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হতে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। এমন কি, সে 'সর্বজনীন আবেদন' বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় শহরে-গ্রামে ডাকযোগে বিতরণও করা হয়েছিলো [১৯] সংস্কার সমিতির এই সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোদ্ধৃত উদ্দেশ্যগুলো বিবৃত হয়:

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণ মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয় তীর্থক্ষেত্র, সভা-সমিতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা থাকিবে না (১ ডিসেম্বর ১৯৩২)।[২০]

রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধিতা এবং অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধানকল্পে আরো একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির নিম্নোদ্ধৃত ইচ্ছার মধ্যে উদার নৈতিক সে বিশিষ্টতাটুকু ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিলো:

> বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই ভাবীকর্মী ও কেন্দ্র পরিচালক তৈরী করা।[২১]

পুনাচুক্তির পর থেকে অস্পৃশ্যতাবিরোধী এই আন্দোলন অধিক সক্রিয় হয়ে উঠলেও পুনাচুক্তির পূর্বেই শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কাজ শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ পেয়ে (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২) শান্তিনিকেতনে ঐ দিন অনশন দিবস ঘোষণা করা হায়েছিল।, প্রার্থনা সভায়

রবীন্দ্রনাথ উক্ত দিবস উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক দীর্ঘ ভষণ দেন।[২২] কেবল আশ্রমবাসীদের নিকটে বলেই গুরুদেব নিবৃত্ত হলেন না, যাদের কাছে বললে সমাজের আরও গভীর যাথার্থ প্রয়োজনের জায়গায় কথাগুলি সহজে পৌঁছে গিয়ে পৌঁছবে আর যেখানে পৌঁছনোই তখন বেশি জরুরি, সেই গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর বক্তব্য তিনি অবিলম্বে সাক্ষাৎভাবে জাগাবেন বলে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। সেই দিনই দলে দলে চারিদিকে লোক গেল।[২৩]

এ দিন অরন্ধনহেতু যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয় তা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও দুর্গতজনদের উন্নয়নের জন্যে সংগৃহীত হয়েছিলো। পরের দিনের সভায় একই উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা মহাত্মাজির পুণ্যব্রত (২৩ সেপ্টেম্বর) নামে মহাত্মা গান্ধী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ঐ সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন :

সভার প্রারম্ভে হরিজন[২৪] সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রতিনিধি মিলে সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করেন। সভায় শেষে হরিজনদের পরিবেশিত সরবত আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলে পান করেন। রাত্রে আশ্রমের সাধারণ ভোজনাগারে হরিজন-পক্কন খিচুড়ি অন্ন দিয়ে এক ভোজ হয়।[২৫] সেখানেও অনেকে অন্ন গ্রহণ করেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক রবীন্দ্রনাথ এই দিন সভা ডেকেছিলেন নিজে থেকেই ; কর্মীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভা ডেকে জলগ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন এরূপ কখনো ঘটেনি। যদিও পান ও ভোজনের কার্যধারা থেকে সেরূপ মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই মনে করে নিলে বাস্তবেও যা ঘটেছিল তার পারম্পর্য ঠিক অনুসরণ করা হয় না।[২৬]

পরবর্তীকালে 'সংস্কার সমিতি'র নেতা এবং 'সংস্কার ভবনে'র প্রতিষ্ঠাতা সুধীর চন্দ্র কর এই সময় থেকে স্থায়ীভাবে কিছু করার জন্যে সংকল্প করেন।[২৭]

পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে শান্তিনিকেতনের কর্মীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল :

এতকালে হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অন্য হইতে তাদের সহিত পানাহার সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।[২৮]

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে সাতচল্লিশ জনের মতো স্বাক্ষর করেছিলেন।[২৯] অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সমকালীন শান্তিনিকেতনের কর্মীদের

ভূমিকা তার সাক্ষ্য দেয় : সমিতির ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মী ও অধ্যাপকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিবেশী পল্লীসমূহে সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য করতে লাগলেন। ভুবনডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া সর্বলেহনা, ইত্যাদি আটটি গ্রামে বৈঠক বসত ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হত, ধর্মসভায় পাঠ ও কীর্তনের সঙ্গে প্রসঙ্গত সামাজিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধে আলোচনাও হত। আর করা হতো মাঝেমাঝে সর্বজনীন ভোজের আয়োজন। ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ভুবনডাঙ্গা গ্রামের এরূপ একটি সর্বজনীন ভোজের অনুশীলন হয়। গ্রামের অধিবাসীরাই ছিলেন এর উদ্যোগী। প্রাসাদ-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাঁধের ঢালু পাড়িতে হাড়ি ডোম বাগদি মেথর, মুচি সকলে এক পংক্তিতে বসতে গিয়েও মাঝে মাঝে পরস্পরের থেকে একটু আধটু ফাঁক রয়েছে দেখা গেল। তখন শান্তিনিকেতনের কর্মীরা এবং নিমন্ত্রিত বর্ণহিন্দুগণের অনেকে বসে পড়ে নিঃশব্দে সে ফাঁকগুলি পূরণ করে দিলেন। অতঃপর জাতি পাঁতির ভেদ সব একাকার হয়ে গেল।[৩০] কিছুদিন পরে শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) বিকেল' বেলায় শ্রীনিকেতন মেলা প্রাঙ্গণে অস্পৃশ্যতা-বর্জনের দাবিতে এক বিরাট জনসভা হয়। উক্ত সভায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেখান—অস্পৃশ্যতা কখনো হিন্দুসমাজসম্মত নয়।[৩১] এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন, তার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন :

আমার লজ্জাবোধ হয় যে, মানুষ মানুষে ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র বচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি, আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে ?……

আজ সময় হসেছে মিলবার। ভগবানের আকাশের দিকে চেয়ে পরস্পর পরস্পরকে বুকে তুলে নিতে হবে। পুরানো শাস্ত্রে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দিন চলে গেছে। জগন্নাথদেব আজ তোমাদের সহায় তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রণাম জানিয়ে সকলকে এক করে নাও (আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)।[৩২]

স্বরোচিষ সরকারের এই প্রবন্ধটি প্রথম ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র বিষয়ক সংকলন 'সীমার মাঝে অসীম' গ্রন্থে এই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয়েছে, (পৃ: ৩১০—৩৯০)। এই অসাধারণ লেখাটি থেকে একটি বিশেষ পর্যায় এখানে সংকলিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য, চিঠিপত্র কিংবা গানে অস্পৃশ্যতাবিরোধী মানসিকতার ছায়া সম্পত ঘটলেও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতি সমমর্মিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি ইতিহাস। সেকারণেই ভারতের বর্তমান অস্পৃশ্যতা এবং অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ওই অধ্যায়ের কার্যাবলী বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক [সম্পাদক]।

সূত্র নির্দেশ

১. ১৮৯৯ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই 'মানবঘৃণা' শব্দটিকে ব্যবহার করেন।

২. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০তম খণ্ড [বিশ্বভারতী, ১৯৫৫] পৃ: ২৯৩।

৩. মহম্মদ আলি জিন্নার চৌদ্দ দফার দাবির মধ্যে পঞ্চম দফাটি ছিলো নিম্নরূপ : সাম্প্রদায়িক দলগুলি পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, কিন্তু যে কোন দল যে কোন সময়ে যৌথ নির্বাচনের অনুকূলে যাহাতে, প্রয়োজন মত পৃথক নির্বাচন পরিহার করিতে পারে, তাহার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। দ্রষ্টব্য : ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ/নেপাল মজুমদার; তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৪-৪৫।

৪. ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩২৯।

৫. ঐ' পৃ: ৩২৯।

৬. ঐ, পৃ: ৩২৯।

৭. রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পৃ: ৪৪৭।

৮. ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, ৩ খণ্ড, পৃ : ৩৩০।

৯. রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পৃ : ৪৭৭।

১০. ঐ । পৃ : ৪৪৭।

১১. ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, ৩ খণ্ড ; পৃ : ৩৩০।

১২. কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ ; পৃ : ৬১।

১৩. ঐ। পৃ : ৬০।

১৪. কুটিরবাসী রবীন্দ্রনাথ, পৃ : ১৩০।

১৫, রবীন্দ্র জীবনী, ৩ পৃ : ৪৫১।

১৬. পাদটীকা, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি', নবজাতক (কলিকাতা : তৃতীয় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৩), পৃ: ১৬০।

১৭. ঐ। পৃ: ১৫৯। কিন্তু তিনি অধিকদিন শান্তিনিকেতনে থাকতে পারেন নি। আর্যসমাজের আহবানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অস্পৃশ্যতা-বর্জন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তবে ১৯৩২ সালের অক্টোবরে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলে, কালীমোহন ঘোষ ও সুধীরচন্দ্র কর তখন সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলে তিনি স্বীকার করেছেন। দ্রষ্টব্য, [illegible] পৃ : ১৫৯।

১৮. রবীন্দ্র জীবনী, ৩, পৃ : ৪৫২।

১৯. কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৬৭।

২০. রবীন্দ্র জীবনী, ৩ পৃ : ৪৫১।

২১. ঐ। পৃ : ৪৫১।

২২. ভারতে জাতীয়তা ইত্যাদি, ৩, পৃ : ৩৩৪।

২৩ কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, পৃ : ৬১—৬২।

২৪. রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যদের 'দুর্গত' বলতে চাইলেও তাঁর অনুসারীগণ গান্ধীজী প্রবর্তিত 'হরিজন' শব্দটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। সুধীরচন্দ্রের এই প্রয়োগ তারই প্রমান।

২৫. সুজিতকুমারের মতানুযায়ী উক্ত হরিজন হলো মেথর জাতীয়। দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি' পূর্বোক্ত, পৃ : ১৫৬।

২৬. কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬২।

২৭. ঐ। পৃঃ ৬৩।

২৮. 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি', পৃঃ ১৫৭।

২৯. ঐ। পৃঃ ১৫৮, পাদটীকা।

৩০. কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৬৫।

৩১. ভারতে জাতীয়তা ইত্যাদি ৩, পৃঃ ৩৮৩।

৩২. উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৮৩-৮৫।

জিয়াদ আলী

বিচ্ছিন্নতা বিরোধীতা, জাতীয়সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ

ভারতের সীমান্তবর্তী কিছু কিছু রাজ্যে ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত বিকাশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু অশুভ উন্মাদনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারতীয় ভূগোলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ছাপ সুস্পষ্ট। ফলে সমানুপাতিক বিকাশের দাবিতে সুস্থ গণতান্ত্রিক কৌশলের বদলে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী অগণতান্ত্রিক উন্মাদনা প্রসূত আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। স্বভাবতই জাতীয় সংহতি সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কেরও সূচনা করছে। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে-দূরদর্শিতা লক্ষ্য করা যায় তা, সাম্প্রতিক কালের পটভূমিতে সবিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যা চিন্তা করেছিলেন ভারতীয় জীবনে তার কী ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়ক আলোচনার সময়ে প্রথমেই পরিস্কার হয়ে যাওয়া দরকার আমাদের দেশে জাতীয় সংহতির যে ধারণা চালু রয়েছে তার চেহারা-চরিত্রের স্বরূপটা কী।

জাতীয় সংহতি বলতে কেউ বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারটাই ধরে নিচ্ছেন। আবার অন্যরা জাতীয় সংহতি বলতে ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যেকার পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিভেদ দূর করে তাদের সম্প্রীতির ভাব বজায় রাখাকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। আবার জাতীয় সংহতি বলতে বেশির ভাগ মানুষ ধর্মীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনকেই একমাত্র সূত্র বলে বড়ো করে দেখতে অভ্যস্ত। তা-ও আবার দুটো বিশেষ ধর্মের সংহতি রক্ষার কথাই তাদের কাছে প্রাধান্য পায়—হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম। ভারতবর্ষ যেন শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের দেশ, বাকি সব ফেলনা। তাহলে সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানের ফলে পাল আমলের বৌদ্ধদের ওপর নিপীড়নের ইতিবৃত্ত ভুলে যেতে হয়।

ইদানিং এমন ধারণাও কেউ কেউ পোষণ করেন যে, কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক

দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করে আসছে কয়েক দশক ধরে, রাজ্যে সেই দলের বদলে কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে নাকি জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে পারে।

এখন প্রথমেই যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা ভারতের বর্তমান ভৌগোলিক অবয়ব রক্ষার ধারণা পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, ভারতের যে ভৌগোলিক সত্তাটার জন্য আমরা চেঁচামেচি করছি তার মূল ভিতটা কি গণতান্ত্রিক রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, না, কি এই ভৌগোলিক সত্তাটির ধারণা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রথিত। একটু গোড়ায় থামলেই বা ক্ষতি কি? নর্মদা ছাড়া পুরাণে কোন্ কোন্ নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যার তীরভাগগুলোকে ভারতীয় ভূখণ্ড বলা হতো? কৃষ্ণা কাবেরীর উল্লেখ তো বৈদিকগ্রন্থে এসেছে অনেক পরে, সরস্বতী ও দৃশদবর্তী নদীর অনেক মধ্যবর্তী যে অংশ আর্যাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল? আর্য, আরব, মোগল ও ইংরেজদের আগমন এদেশে সম্ভব হলো কিসের ভিত্তিতে? বিভেদের সুযোগ নিয়েই তো? বিচ্ছিন্নতার জন্যই প্রাচ্য প্রতীচ্যের কাছে হার মেনেছিল—এঙ্গেলস তো তাই বলেছিলেন। তখন ভারতের Geographical integrity কোথায় ছিল?

মোগলরা তো নেপালও আক্রমণ করেছিল। সে আক্রমণে মোগলরা জিতে গেলে আমরা কি নেপালও দাবি করে বসতাম ভারতের ভূখণ্ড হিসেবে! ব্রিটিশরা তো ১৮২৮ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এ কারণেই যে তখন আফগানিস্তান একজন রুশ দূতকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৮৬৮ সালেও ব্রিটিশরা আক্রমণ করে আফগানিস্তানকে, কেন না আফগানিস্তান সেবার ব্রিটিশ দূতকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা এ যুদ্ধে জিততে পারলে কি হতো? জিততে না পেরে আফগানিস্তানকে রুশপ্রভাবের খপ্পর থেকে সরিয়ে রাখবার জন্য প্রতি বছর ২০ লক্ষ টাকা সাবসিডি দেবার চুক্তিতে বাফার স্টেট হিসাবে ব্যবহার করে। ব্রিটিশদের ভৌগোলিক ধারণার উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা আফগানিস্তানকে কোন্ চোখে দেখবো?

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাতে ইউরোপের ক্ষতি হয়েছিল? না, লাভ হয়েছিল?

জারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পর, লেনিন প্রান্তীয় রাজ্যগুলির সমস্যার কথা ভেবে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন—যারা মনে করবেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, তারা আলাদা থাকুন। এভাবেই লেনিন পোল্যাণ্ড, লিথুয়াপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ইউক্রেন, ট্রান্সককেশিয়ার মতো ভূখণ্ডের সমস্যা সহজেই সমাধানের পথ খুলে দেন। লেনিন বলপ্রয়োগ করেননি। বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। যার তত্ত্বত নাম Selfed n's of Nation। আর আমরা? হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়ে ও কাশ্মীরে সৈন্য দিয়ে দখল নিলাম, এই দখল কি সেখানকার মানুষের বিকাশের স্বার্থেও নাকি ভূগোলের সীমানা বাড়ানো, কোনটা? নেহেরুর কৌশলগত ভুলের জন্য কাশ্মীরের একাংশ হাতছাড়া হয়ে বাইরে রয়ে গেল। সে অংশ বিচ্ছিন্ন হলো বলে তখন ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য কী ক্ষুন্ন হয়েছিল? তেমন তো মনে হয় না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কস ছিলেন রাশিয়ান পোল্যাণ্ড পৃথক হয়ে যাবার পক্ষে। তখন যুক্তি ছিল একটা উর্দ্ধতর সংস্কৃতিকে একটা নিম্নতর সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। যেহেতু নিম্নতর সংস্কৃতি উর্দ্ধতর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে। ৫০ বছর পর, উনিশ শতকের শেষ দিকে পোলিস মার্কসবাদীরা পোল্যাণ্ড পৃথক হবার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। মার্কসের সিদ্ধান্তও ঠিক ছিল আর পোলিস মার্কসবাদীদের সিদ্ধান্তও ঠিক ছিল। দুটোই ঠিক কী করে হয়? স্তালিন বলছেন হ্যাঁ, হয়। কারণ মার্কসের সময় থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এমন গভীর পরিবর্তন এসেছিল যাতে অর্থগত ও সংস্কৃতির দিক থেকে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অনেক কাছে এসে গিয়েছিল। প্রশ্নটা হলো ব্যবহারিক বাস্তবতার শুষ্ক তত্ত্ব বা পাণ্ডিত্যের নয়। ঘরে বাইরে এমন অবস্থা হয়তো আবার আসতে পারে যখন পোল্যাণ্ড পৃথক হবার প্রশ্ন বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে। হয়েওছে তাই। তার জন্য কি সেখানে সংহতির সংকট দেখা দিয়েছে?

ঐতিহাসিক অবস্থা ও তার বাস্তবতার বিচারটাই বড়ো কথা। তা না করে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে চেঁচালেই হবে? এখনকার পাঞ্জাব সমস্যার সঙ্গে মেলে আসামের বা ত্রিপুরার নাগা মিজোদের সমস্যা? সে বোধবুদ্ধি থাকলে ক্ষমতার লোভে দেশভাগ হতো?

ব্রিটিশদের একতরফা দোষ দিয়ে লাভ কি? স্বয়ং নেহেরু, সর্দার প্যাটেলরা

কি বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি শুরু করেননি? জিন্না তো এসেছেন অনেক পরে। আর জিন্না শেষোবধি প্রোপোর্শনাল জয়েন্ট ইলেকটোরেট মেনে নিয়েছিলেন। সেদিন কেবিনেট মিশনের ওজর মেনে নিয়েও বোম্বাইতে সাংবাদিক বৈঠকে যে তা অস্বীকার করলেন কে? স্বয়ং নেহেরুতো। (বোম্বে ১০ জুলাই ১৯৪৬)। প্রান্তীয় বা সীমান্ত জনগনের রায় নিয়েছিলেন পণ্ডিতজী? সে রিপোর্ট কেউ পাননি। এর নাম গণতন্ত্র? এভাবেই রক্ষিত ভারতীয় ভূগোলের ধারণা আমাদের ভেতরে চলে এসেছে যার ঐক্যের ভিত কোনোকালেই ছিলনা পাকাপোক্ত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের যে সূত্র, সে সূত্র স্রেফ ধর্মীয়। জাতীয় সংহতি আর ধর্মীয় সংহতি এক বস্তু নয়। দুটো পৃথক সমস্যা, একসঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার কথা বাদ দিয়ে এবার আসা যাক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষার যে ধারণা কেউ কেউ পোষণ করছেন সেই কথায়। সেখানেও গোলমাল কম নেই। জাতি কাকে বলে? হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়কে কি হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি বলে আখ্যাত করলে ঠিক বলা হবে? জাতি যে সব উপাদানে নিয়ে গঠিত হয় সেখানে ধর্ম আসে কোথা থেকে? ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের কি জাতি হিসেবে ধরা যায়? নাকি তা ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র? এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পৌছানো দরকার। হিন্দুর দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব হয় কি করে? এসব ভুল ধারণা চলে আসছে এখনো। বাঙালী মানেই হিন্দু? মুসলমানরা, খ্রীষ্টানরা, বৌদ্ধরা বাঙালী নয়? নাস্তিকেরা? দুর্গাপূজা এদেরও জাতীয় উৎসব? হিন্দু বা মুসলমানরা বা বৌদ্ধরা ও খ্রীষ্টানরা হলো ধর্মীয় সম্প্রদায়। কোনো মতেই জাতি নয়। কেন না জাতি হলো ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত এমন একটা স্থায়ী সম্প্রদায় যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, মানসিক গড়ন এক এবং এই মানসিক গডন একটা সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। এখানে ধর্মের ব্যাপার নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটাকে আলাদা করে ধরলে, শুধু তা দিয়ে জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাবে না। অবশ্য এক ভাষাতে কথা বললেই এক জাতি হবে না, যেমন আমেরিকান ও ইংরেজদের ক্ষেত্রে বলা যায়। আবার বিভিন্ন জাতি হলেই ভাষাটাও যে বিভিন্ন হবে এমনটাও ঠিক নয়।

Tribe হল জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বর্গ এ্যথনোগ্রাফিক্যাল Category আর জাতি হল A Historical Category belonging to a definite epoch. এই নির্দিষ্ট যুগ হল উদীয়মান ধনবাদের যুগ। সামন্ততন্ত্র অপসারণ করে ধনবাদের অভ্যুত্থানের যে ধারা, স্রোতেই গঠিত হয় জাতিও জাতীয়বাদের ধারণা। ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়রা জাতিতে পরিণত হল তখনই যখন ধনবাদ সফলভাবে অগ্রসর হয় সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের ওপর জয়লাভ করে। এটা সব সময় এক পদ্ধতিতে হয় না। এ ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে পার্থক্য ছিল পূর্ব ইউরোপের। সে সময় সমস্ত অস্ট্রিয়ান জাতিগুলিকে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মিলিত করার ভার নিয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যেকার অগ্রসর জাতি হিসাবে বিবেচিত জার্মানরাই। হাঙ্গেরীতে সে কাজ সঠিক ভাবেই করে ম্যাগিয়াররা, আর রাশিয়াতে সে-ভার নেয় গ্রেট রাশিয়ান জাতি। কিন্তু ভারতে? ভারতের জাতিগুলিকে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত করার ভার কে নিয়েছিল? ভারতের মধ্যকার কোনো অগ্রগণ্য জাতি সে দায়িত্ব পালন করেছিল? সব সময় বিদেশীর হাতে তামাক খাওয়া কি মানায়? একটা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষকের জাত ইংরেজরা ভারতে জাতি গঠন ও জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পুষ্ট করল। তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

ভারতের উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্রিটিশের সংঘাত শুরু হয় বাজার নিয়ে ও ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে। উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়ারা চায় নিজেদের ঘরের বাজার নিজেদের দখলে রাখতে। তাই তাদের নেতৃত্বেই আন্দোলনটা শুরু হয়। তারা স্বদেশীভাইদের ডাক দেয় মাতৃভূমি, মাতৃভূমি বলে। কৃষককে বলে জমির দাবির কথাও। জাতির বিস্তীর্ণ অংশ সর্বহারা ও কৃষক সমাজও দমনের মুখে সে আন্দোলনে যোগ দেয়। কারা কতটা পরিমাণ আন্দোলনে যোগ দিল তার ওপর নির্ভর ক'রে জাতীয় আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে। সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়া জাতীয়তার পতাকার নিচে জুটবে কিনা তা নির্ভর করে শ্রেণীগত অসঙ্গতি বা Class contradiction কতোখানি তীব্র হয়েছে তার ওপর। আর সর্বহারা শ্রেণীর চেতনা ও সংগঠন শক্তির ওপর। বুর্জোয়ারা জাতীয় সংহতির স্লোগান দেয় শোষনের স্বার্থে আর সর্বহারা সে স্লোগান দেয় জাতীয় শোষন থেকে মুক্ত হবার স্বার্থে, বুর্জোয়ারা মানসিক

দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের বিকশিত করে তোলার ইচ্ছায়। সে যে-জাতেরই মজুর হোক না কেন।

ইংরেজ জাতির শোষণ, দমনমূলক অবস্থার অভিঘাতেই ভারতের সেই জাতিগুলি যখন জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে চাইল তখন সেখানে ব্যাগড়া বাধিয়ে বসল ধর্মীয় চিন্তার ধারা। যে ধর্মীয় রক্ষণ-শীলতা ও বর্ণাশ্রম প্রথা ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকে একদিকে সুফী, মোতাজেলাইট দর্শনের প্রবক্তাদের দ্বারাও অন্যদিকে সহজিয়া আউল বাউল ও দেহতত্ত্ববাদী ধারনা এবং চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, অন্ততঃ ধর্মীয় সংহতির আকাঙ্খা তীব্র হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনে, (১৯০৮ সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার অন্তত না-হিন্দু না-মুসলমান এমন একটি জনসংখ্যা গড়ে উঠেছিল।) উনিশ শতকের মাঝামাঝি হিন্দু রিভাইভালিজম বা পুনরভ্যুত্থানবাদী ধর্মীয় ধারনা তা বিনষ্ট করে দিল। শুধু তাই নয়, হিন্দুমেলা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির মধ্যে পুষ্ট বিশেষ এক ধর্মীয় চিন্তাকে জুড়ে দেওয়া হল রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদীরাও একই আফিম খেয়েছিল। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ১৯০৮—এর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং এদেশের খিলাফত ওয়ালারা জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তুরস্কের মুসলমান আটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় তারা অধীর হয়ে উঠল। আর সে-কাজেমদৎ দিল গান্ধীর হিন্দু ধর্মীয় চিন্তার দর্শন। বিদেশী ব্রিটিশ জাতির দমন ও শোষণের ফলে ভারতের উপজাতিগুলি যে জাতীয় আন্দোলনের মোর্চায় নামছিল তা গতিপথ হারালো ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ঠিক এইভাবে জাতীয় সংহতির সমস্যাকে উপলব্ধি করে ভারতীয় মণীষীরা কে কি বলেছেন? জাতিগত শোষণ অব্যাহত থাকলে জাতীয় সংহতি রক্ষিত হবে? এ প্রশ্ন এ ভাবে কেউ তুলেছেন কি এ দেশে? জাতিগত শোষনের অবসান না হলে জাতিগত সম্প্রতি রক্ষা করা যায়? এ প্রশ্নই বা ক'জন মনীষী রেখেছেন? জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার অর্থাৎ জাতিগত বিকাশের স্বার্থে একটা জাতির, এমন কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার না থাকলে যে জাতীয় সংহতি সুরক্ষিত হবেনা একথা কি এমন ভাবে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন? সকলেই তো

ধর্মীয় সংহতি রক্ষার আদর্শবাদী কথা বলেছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাবের দিক থেকে মোটা দাগে, আপ্তবাক্যের মত; ইতিহাসগত বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে নয়। রামমোহনের ভারততত্ত্বের মূলেও ছিল বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী সমাজদেহ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। বঙ্কিমত হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই ভারতীয়জাতীয়তাবাদ বলে চালাতে চেয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত দু' একজন গোড়ার দিকে ধর্মকে বাদ দিয়ে সংহতির চিন্তা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তা সুস্পষ্ট জোরালো মতামত হিসাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কি? শেষে ভূদেবওত হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের কট্টর প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। এখানেই আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের একক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হবে। সে-ক্ষেত্রে সত্যিই রবীন্দ্রনাথের কোন জুড়ি নেই বললেই চলে। নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক অবয়বটাকে অন্তত ধরার ও বোঝার চেষ্টা করেছেন বলেই যে—দ্বারকানাথ ঠাকুর সেকালে লণ্ডনে ক্যাসেল হোটেলে রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে নৈশভোজ করার তথাকথিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তার ঐতিহ্যগত প্রভাব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতিকে শোষণ করার কৌশলটি ধরতে পেরেছিলেন। একই অনুসঙ্গে জাত জাতীয়তা-বাদের উগ্রতা ও সংকীর্ণতা—উভয় দিক সম্পর্কেই সচকিত হতেও পেরেছিলেন। দেবেন ঠাকুরের ছেলে পরে হিন্দুমেলার বদলে ব্রাহ্মমেলা না করে নববর্ষ ও পৌষ উৎসব প্রচলন করেন। প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতিকে শোষণের কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার দৈন্যতার দিকটাকেও সেই ১৯০৪-৫ এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্বারকানাথের নাতি রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্বে, এদেশে ধনবাদের বিস্তারের যুগে তার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেন ঠিকই। তার পক্ষে তখন সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তা না হলে হয়ত তার পক্ষে অতি বিপ্লবী ও হঠকারী হয়ে যেত ব্যাপারটা। আবার ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সংকোচনের যুগে তিনি ঠিকই ধরেছেন তার চরিত্রটিকে। উগ্র জাতীয়তাবাদ যে ফ্যাসিবাদের জন্মকে ত্বরান্বিত করে, রবীন্দ্রনাথের কালেই রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পেরেছিলেন। বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বও যা তখন ধরতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কি কম পাওয়া?

'I have saidit over and again that the aggressive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations, of the West, is a menace of the whole world.'[১] — রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিবৃতি দেন তখন ভারতে গান্ধীজীরা কোন্ অন্ধকারে ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার অন্বেষনে ব্যস্ত ছিলেন ও শ্রেণীসমঝোতার পথ হাতড়াচ্ছিলেন তাও আমাদের জানা। এই হলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ জেনেভায় চীনের ছাত্র-যুবকদের সামনে যে বক্তৃতা দেন তা কি কম সচেতনতার পরিচায়ক?

পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদই যে আন্তর্জাতিকতাবাদের জয়লাভের পথে প্রধানতম অন্তরায় এবং সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার লাভই যে সে লক্ষ্যে পৌছানোর যথার্থ পথ তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। তাই তিনি যে ঐক্যতত্ত্বের কথা বলেন, তাকে যেভাবেই ভুল ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন: ঐক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। একাকারে হওয়া, এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্‌পিরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি। গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘ বন্ধনের সমস্ত অনিশ্চয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে।[২]

রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবেই না ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। সত্যিই ত। তুর্কি আত্তীকরণকারীরা বলকান জাতিগুলিকে শত শত বৎসর ধরে ছিন্নভিন্ন করেও বলকানদের ধ্বংস করতে পেরেছিল? জার আমলের রুশীয়কারীরা ও জার্মান প্রুশিয়ানরা একশ বছরের বেশি সময় ধরে পোল জাতিকে গুঁড়িয়ে

দিতে চেয়েছিল, তারাও তা পারেনি। পারসিক ও তুর্কিআর্ত্তীকরণকারীরা আর্মেনীয় ও জর্জীয় জাতিগুলিকে কয়েক শতাব্দী উৎখাত করতে চেষ্টা করেছিল, গণহত্যাও চালিয়েছিল। অবশেষে পারসিক তুর্কিরাই আত্মসমর্পন করেছিল।

দেওরসের মত ভারতে এখন যারা সমস্ত ধর্ম ও জাতিকে হিন্দু ধর্মের মোড়কে ভারতীয় করণের কথা ভাবছেন তারা যে কত বেকুব তা তারা নিজেরাই জানেন না।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার পাশাপাশি স্মরণ করা যেতে পারে ভাষা সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে স্তালিনের সেই উক্তি। স্তালিন বলেছেন: সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের পরবর্তী স্তরে, যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংহত হয়ে যাবে এবং সমাজতন্ত্র জনগণের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে এবং যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসমূহ জনগণের জীবনের সর্বজনীন ভাষার সুবিধা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবে, তখন জাতিগত পার্থক্য ও ভাষাগত পার্থক্যের ক্রম অবলুপ্তি শুরু হবে এবং সমস্ত জাতিগুলির একটি সর্বজনীন ভাষা তার স্থান নেবে।

আর আমাদের দেশে? নেহেরু, ইন্দিরার দল ভাবছেন Language Imperialism চালিয়ে জোর করে একটা বিশেষ ভাষাকে অন্য জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে হিন্দী ভাষায় হেজিমোন একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। তাও কোথায়, না, যেখানে পুঁজিবাদের কাঠামোয় এখনও আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। তামিল, তেলেগুরা যদি এই প্রশ্নে উচ্চকিত হয় তাহলে দক্ষিণের মানুষকি ভুল করবে? নাকি তাও বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁকের নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে?

জাতি সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাবের সার সংকলন করতে গিয়ে লেনিন লেখেন, বিভিন্ন জাতির আলাদা হবার অধিকার যদি সর্বহারারা মেনে নেয়, তবেই বিভিন্ন জাতির মজুরদের পূর্ণ একাত্মবোধ সৃষ্টি হতে পারে। তবেই জাতিগুলি আসল গণতান্ত্রিক ধারায় পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কি এর বাইরে ছিল? না, সেই গণতান্ত্রিক ধারার প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে জাতীয় সংহতির চিন্তা করা যায় কি? গণতন্ত্র সুসংহতভাবে রূপায়িত না হলে, জাতিগুলির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা না করা গেলে জাতীয় সংহতির সংকট মোচন করা যাবে?

ভারতের যে সব রাজনীতিবিদ ভেবেছিলেন স্বাধীনতার পর ভারতের জাতি সমস্যার প্রশ্নগুলো বা National Questions পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে সাবসাইড করে গেছে, তারা দয়া করে মগজটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিন ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরীখে পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা, নাগামিজো বা কর্ণাটক, তামিল-নাড়ু ইত্যাদি রাজ্যের কথা ভাবুন। সকলের প্রকৃতি এক নয়। পাঞ্জাব স্বাধীনতার আগেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চাইতে কৃষিতে অগ্রসর ছিল। বৃটিশ আমলে কমিশন রিপোর্টেও তাই দেখা যায়। পাঞ্জাবে নেহরুর আমলে সবুজ বিপ্লবের স্লোগান দেওয়ার ফলে ধনী কৃষকের হাতে যে পুঁজি বৃহদাকার রূপ পেয়ে গেছে সেই কৃষি পুঁজিকে শিল্প পুঁজিতে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র তা তারা স্বাধীন ভাবে খুঁজে বেড়াবেই,—যখন তাদের দিল্লীতে নির্মিত ক্যাম্পাকোলার কারখানা উগ্র হিন্দু সম্প্রসারণবাদীদের হাতে বার বার বিধ্বস্ত হয়। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চেতনার অনুপস্থিতি থাকলে সে আন্দোলন ধর্মীয় মোড়কের রূপ নিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে গিয়ে তো পড়বেই। পাঞ্জাবে ত তাই ঘটছে।

আসাম বা ত্রিপুরার ব্যাপারটা আবার অন্যরকম। ধর্ম নয়, ধর্মীয় মোড়কও নয় ভাষা ও জাতিগত বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে মূলধন করে সেখানে উস্কানীমূলক আন্দোলনের শুরু। সেখানেও গণতান্ত্রিক চেতনার অনুপস্থিতিতে তা বিদেশী রাজনীতির ক্রীড়নক নেতৃত্বে পর্যবসিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীরাই উস্কানি দিক, আর যেই নাচাক, প্রভোকেশনের বাস্তব ভিত্তি যে রয়ে গেছে তা কি অস্বীকার করা যাবে? সব চাইতে বড় কথা সেখানকার শ্রমজীবী শ্রেণী কি ভাবছেন? এরাই তো সর্বহারার আন্তর্জাতিক চেতনায় সংকীর্ণ বা উগ্র জাতীয়তাবাদের জঞ্জালকে ধুয়ে ধুয়ে সাফ করার একমাত্র গ্যারান্টি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি। অথচ আমাদের এক দেশ নয়।······

রবীন্দ্রনাথ কী নিখুঁতভাবেই না ভারতীয় জীবনের এই ট্রাজেডিটা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আবার লিখছেন: যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি, তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা, গুটিকয়েক-

আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ? · ···

কবির সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছিলেন :···আমার দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী এই—ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হতে দিওনা, তাহাকে কার্যে পরিণত করো। 'বন্দেমাতরম' যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 'বন্দেমাতরম' এর স্থানে 'বন্দেভ্রাতরম' বলো[৩] রাজনৈতিক নেতৃত্বই যখন বন্দেমাতরমের ভ্রান্তিতে বুঁদ হয়ে থাকেন তখন লেখক রবীন্দ্রনাথ কী গভীর প্রতীতিবোধেই না সেই সত্যকেই উদঘাটন করেন। আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবনতার বিপদ বা জাতীয় সংহতির সংকট মোচনেও তাই তার প্রভাব ভারতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। তাকে ছাড়া আমরা ভারতীয়রা কি বাঁচতে পারি? তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের রক্তে আমাদের সংস্কার। সেই রক্ত আর সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথের মতই পরিশুদ্ধ ও মোহমুক্ত করে তোলা চাই-ই চাই।

জিয়াদ আলীর এই লেখাটির মূল শিরোনাম ছিল 'জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার নন্দন মিনিয়েচার হলে, সেখানে এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। পরে এটি পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হয় রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর প্রকাশিত 'যুবমানস' এর বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় (৯ মে প্রকাশিত, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৮-৫০)। এবং পরে এটি 'উত্তরবঙ্গের প্রগতি' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় পুর্ণমুদ্রিত হয় [পৃঃ ১৩-২১]। লেখাটির গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় পুনরায় মুদ্রণ করা হয়। বর্তমান সংকলনে সংযোজন করার সময় এর মুখবন্ধ ছাড়াও লেখাটি আর একবার পরিমার্জনা করা হয়। এবং এই পরিমার্জনার দিকে তাকিয়েই লেখাটির শিরোনাম বদল করে 'বিচ্ছিন্নতা বিরোধিতা, জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ' রাখা হয়েছে [সম্পাদক]।

পাদটীকা

১. ১৯২৬ সালের ৫ আগস্ট ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি।

২. কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী।

৩. রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্নে কবির জবাব।

দিলীপ মজুমদার

প্রাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী। এ বিরোধিতা কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের পক্ষাবলম্বন থেকে উৎসারিত হয় নি। এ বিরোধিতা তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গেই সংযুক্ত। বন্ধনমুক্তির দর্শনই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তাও বন্ধন বিশেষ। ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে, সীমাবদ্ধ জাতিসত্তার মধ্যে তা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখে। যেখানেই বন্ধন, বিকৃতিও সেখানে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মানবতার এই বিকৃতি, এই আত্মকেন্দ্রিক কূপমণ্ডুকতা কদাচ সমর্থনীয় হতে পারে না।

দোতলার বারান্দা এবং ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বন্দী বালকটি যখন মুক্ত হল তখন তার বিশ্বকে গ্রাস করার বিপুল ক্ষুধা, তার ক্ষুদ্র হৃদয়টির মধ্যে তখন জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে বিপুলা বসুধায় তুচ্ছ বা বৃহৎ সমস্ত কিছুর প্রতি সুগভীর আত্মীয় মমতা। প্রথম প্রেমের আবেগতপ্ত ভাষণে-সম্বোধনে মন্দ্রিত হয় তাঁর বসুন্ধরা : 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের'। এবং 'ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে দেশে দেশান্তরে'। এই যে স্বজাতি হইয়া থাকার ইচ্ছে—এটা গজদন্তমিনারবাসী কবির উৎকট কল্পনার ফসল মাত্র নয়, তাঁর প্রসারিত জীবনের নানা ঘটনা, নানা লোক-ব্যবহার তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রসারিত মনের প্রেম, এই প্রেমই তাঁকে ধর্মনৈতিক ও সামাজিক সংকীর্ণতা থেকে উৎক্ষিপ্ত করে দিতে পেরেছিল। তা না হলে, ঠাকুরবাড়ির সন্তান হয়ে, প্রতাপান্বিত পিতার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে ব্রাহ্মধর্মেও আস্থা রাখতে পারলেন না কেন! কারণ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত ব্রাহ্মধর্মও তাঁর কাছে তখন সংকোচনশীল ধর্মতন্ত্র মাত্র। বিভেদমুক্ত মানবমিলনের যে গূঢ় প্রেরণায় বাস্তববাদী রামমোহন পরিকল্পনা করেছিলেন নবধর্মমতের, রবীন্দ্রনাথের যৌবন বিকাশের পর্বে তা স্বসৃষ্ট আচার—প্রথা—বিভেদপন্থাজাত কূপমণ্ডুকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। বাস্তবিক, ধার্মিকতার কোন

আড়ম্বর কদাচ শ্রদ্ধা করতে পারেন নি তিনি ; শ্রদ্ধা করিয়া যারা বুদ্ধির, আলো জ্বালে এবং মানুষের ভালো মানে—সেই নাস্তিকদেরও বরং তিনি শ্রদ্ধা করতে রাজি ছিলেন। তাঁর ধর্মবোধের মূলে ছিল মানুষ, মানবিক মঙ্গল ; মানব বিবিক্ত ধর্ম তাঁর কাছে অপাংক্তেয়। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণাসঞ্জাত পথে, হিন্দুধর্মের-পুনর্জাগরণের ঢক্কানিনাদিত আন্দোলনে এইজন্যই তিনি তটস্থ পথিক। এবং এইজন্যই সব ধর্মের ধর্মান্ধদের আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

ধর্মের মত তীব্র বর্ণচেতনাও বিভেদ পন্থার উৎস। যে ইংরেজকে রবীন্দ্রনাথ জীবনবিকাশের প্রথম পর্বে ইউরোপীয় নবজাগরণের বাণীবাহক হিসেবে শ্রদ্ধা করেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় যখন তার শ্বেতাঙ্গ-সুলভ বর্ণান্ধতা ও বর্ণ-গর্ব পরিস্ফুট হল তখন তাকে প্রকাশ্যে ঘৃণায় অভিষিক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। কেবল বিদেশী ইংরেজ নয়, স্বদেশী ভারতবাসীর তীব্র বর্ণচেতনাও তাঁর ক্ষোভ-বেদনা-রোষের কারণ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর তাঁর নির্মোহ আলোকপাত আজও সমান প্রাসঙ্গিক। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানরা যে সক্রিয় হয় নি, এর কারণানুসন্ধান করে তিনিই বলেছিলেন যে সামাজিক ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দুরা তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, আত্মীয়তার স্বর্ণসূত্রে মিলিত করেনি তাদের। বর্ণগর্বে শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে 'হিন্দু' কবির এই অভিশাপ হজম করতে হয়েছে—'চিতাভস্মে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' অন্ত্যজ মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও ঘৃণায় আহত কবি 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ঘোষণা করেছেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা'।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' পরিকল্পনার মূলে আছে ধর্ম ও বর্ণের, উচ্চ ও নীচের বিভেদমুক্ত মহামানবের সাগরতীর রচনা। এই সাগরতীরে শক-হূণ-পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হবে, তারা 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' এই মহামানবের নির্যাসই ভারতভাগ্যবিধাতা, আদপেই কোন পঞ্চম জর্জ বা ষষ্ঠ জর্জ নন। এই ভারতবিধাতার সম্প্রীতির জলধিতরঙ্গে উচ্ছ্বাসিত—উদ্বোধিত হবে পাঞ্জাব-সিন্ধু-উৎকল-বঙ্গ মারাঠা।

যে জাতীয়তাবাদ স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত সৃষ্টি করে 'ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়' সেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের একটা ধারাবাহিকতা আছে।

ইউরোপে নবজাগরণসম্ভূত সার্বভৌমিকতার সঙ্গে বৈপ্লবিক অধিকারসমূহের সমন্বয়ই জাতীয়তাবাদের উৎস। পোপের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, দেশপ্রেমের নামে জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এবং রাজাকে সেই সার্বভৌম শক্তির অধীশ্বর বলে মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতার বাণীবাহক ফরাসী বিপ্লব জাতীয়তাবাদী আদর্শকে উদ্দীপিত করে দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিচ্ছুরিত হয় গণবিপ্লবের বহ্নিশিখায়। জাতীয়তাবাদের মধ্যে মুক্তিপিপাসু জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ কেবল স্বার্থপ্রসূত আত্মকণ্ডুয়ন নয়, তখনকার জাতীয়তাবাদ অন্যের অধিকারকে মর্যাদা দেবার ক্ষেত্রেও উদার ছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হিসেবে তখন জাতীয়তাবাদ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একচেটিয়া ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা বাদও বিকৃতির পদে শুরু করল পদচারনা। বাজার দখল, মূলধন বিনিয়োগ, কাঁচামাল সংগ্রহ হয়ে উঠল তার ধ্যান জ্ঞান এবং এসবের জন্যই এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বুকে 'দস্যু পায়ের কাঁটা মারা জুতোর' চিহ্ন; শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং সমরসম্ভার ও সমরকৌশলের চমকপ্রদ উন্নতি আহ্বান করে আনল যুদ্ধজাত বিভীষিকাকে।

রণোন্মদনামুখর, আত্মরতির তমসাবৃত, 'শ্মশানের প্রান্তরে' এই জাতিয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন খোদ জাপান ও আমেরিকায়। সময়টা ১৯১৭। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মত বিশ্বখ্যাতি তাঁর করতলগত। আপাত নিরপেক্ষতার অবগুণ্ঠনে যে সময়টা আত্মতৃপ্তির চর্বণে কাটতে পারত, সেই সময়ে, রবীন্দ্রনাথ, সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জেনেও জাতীয়তাবাদের বিকৃতির বিরুদ্ধে ধ্বনিত করলেন তাঁর বিবেকী কণ্ঠস্বর। তার পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি লক্ষ্য করল: পাশ্চাত্য জাতীয়তার কেন্দ্রে আছে বিরোধ ও বিজয়, সে আপনার অভ্যন্তরস্থ ঈর্ষা-হিংসা-লোভে শুধু জর্জরিত নয় তাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার বিষাক্ত আনন্দে উদ্বেল, অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রিয়সুখ তার নেই, সামাজিক বন্ধনের মধ্যে সে এনেদিয়েছে শৈথিল্য, নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে এনেছে বিরোধ, যান্ত্রিক সমষ্টিগত ঐক্যের যূপকাষ্ঠে নির্মমভাবে বলি দিয়েছে ব্যক্তিকে।

আর, এই জাতীয়তাবাদী বিকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যুদ্ধ। 'লড়াইয়ের মূল' তাই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী 'পণ্ডিতদের মগজের মধ্যে।'

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও যখন সংকীর্ণ, অন্ধ পথে পদচারণা করেছে কবি তখন বার বার সতর্ক করেছেন। তখনকার জাতীয় নেতারা কবির উক্তিকে ভাবাবেগপ্রসূত বলে মৃদু হাস্যে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন' কিন্তু বস্ত্রবর্জনের অগ্নিদাহের-বিদেশী শিক্ষাকে সমূলে নির্মূল করার আপাত রোমাঞ্চকর অভিযানের অংশীদার হন নি রবীন্দ্রনাথ। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো একলা চল রে।'

আজ, রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীর সন্ধিলগ্নে সেই একক পথিকের, রোমাঁ রোলাঁ কথিত এশিয়ার সেই নির্জনতম মানুষের আন্তর্জাতিকতার অনুধ্যান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ, আজ দেশজোড়া বিভেদপন্থা তাঁর 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'র বাণীটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতার সংহারমূর্তি, প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প আজ ভারতব্যাপী বিস্তারিত।

এই বিভেদপন্থা অবশ্যই ধিক্কারযোগ্য। তথাপি আত্মসমালোচনার বেদনাদায়ক পথ পরিক্রমাও এ মুহূর্তের আশু কর্তব্য।

স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও বিভেদপন্থায় কেন এই ব্যাপকতা! এ কি কেবল 'বিদেশী মদত' বা বিকৃতবুদ্ধি গুটিকয় উগ্রমস্তিকের উদ্ভাবন কৌশল! আবেগ দিয়ে দেখলে আপাতভাবে ব্যাপারটা তাই বটে। কিন্তু নির্মোহ বুদ্ধি আমাদের নিয়ে যায় উৎসের দিকে। সেখানে পাওয়া যায় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণের জটিল যোগফল।

ইংরেজ শাসনকালে ভারতে রাষ্ট্রীক ঐক্য একটা মোটামুটি চেহারা নিয়েছিল কিছু অলি গলি ও বাঁকচুর সত্ত্বেও। সে যুগটা ছিল এক বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে-সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের যুগ। সেই ঘটনাপরমপরায় উদ্ভূত, আবেগাচ্ছন্ন, তাৎক্ষণিক ঐক্যবোধকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতিতে জাতিতে মানসিক সংযোগের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকে সার্থক ও সফল করা গিয়েছে কি? একথা কি আজ আমরা বলতে পারি যে ভারতের এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষকে অন্তরঙ্গভাবে চেনেন? এক সম্প্রদায় কি হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছেন?

এর এক চটজলদি উত্তর রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা দিতে পারেন। কেন, সাহিত্য একাদেমী-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তঃ প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও জনজীবনকে ত তুলে ধরা হয়। হয় ঠিক কথা, কিন্তু সে যোগ বুদ্ধিগত, হৃদয়গত নয়। বন্ধুত্ব বা সম্প্রীতি একান্তভাবে বুদ্ধিনির্ভর—কোন্ মূঢ় বলবে সে কথা?—'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা / না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা।' রবীন্দ্রনাথের কথা।

রবীন্দ্রনাথ—একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সব উত্তাল দিনে অনুদ্বেজিতচিত্তে বারংবার বলবার চেষ্টা করেছিলেন 'দেশমাতা'র পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ধারনালাভের কথা। তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ,' 'লোকহিত' 'স্বরাজসাধন' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে দেশকে চিনে নিবার নিস্ফল অথচ ক্লান্তিহীন উচ্চারণ দেখতে পাই। সে চেনা পুঁথির মাধ্যমে পরোক্ষ চেনা নয়, তত্ত্বের মাধ্যমে বুদ্ধি দিয়ে চেনা নয়, রাজনীতির মাধ্যমে পক্ষপাতদুষ্ট চেনা নয়, সে চেনা 'কৃষাণের মজুরের জীবনের শরিক' হয়ে চেনা। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র জাতি-সম্প্রদায় পারস্পরিক-ভাবে আজও অপরিচয়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, অনাত্মীয়তার দ্বারা বিভক্ত।

কে অস্বীকার করবে আজ যে বিভেদপন্থী আন্দোলনগুলির গভীর উৎসে আছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। ভারতবর্ষীয় প্রদেশাঞ্চলগুলির অসম বিকাশ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষপাতকেই প্রকারান্তরে প্রমাণ করে নাকি? এবং এই পক্ষপাতের ফলে কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি ক্ষোভ জেগে ওঠে—সেই ক্ষোভ যদি তাকে নিরন্তর পীড়িত করে তাহলে সে কি রাষ্ট্রব্যাপারে আপন সংযুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নহীন আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে? এরও তো একটা বিচার হওয়া প্রয়োজন যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সুবিধাভোগীদের মধ্যে কারা আছে—কোন্ কোন্ অঞ্চল—কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ?

মনে রাখতে হবে ইউরোপের মত ভারত এক জাতির দেশ নয়; সুতরাং রাষ্ট্রীক ঐক্যের বিধিবদ্ধ পথে এ দেশে প্রকৃত জাতীয় সংহতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র ও বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে আমাদের-আন্তরিকভাবে প্রতিটি জাতিসত্তার চরিত্র-আবেগ ক্ষোভকে অনুধাবন করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হয়েছে এরা। ভারতবর্ষীয় পরিপ্রেক্ষিতের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান সন্ধান করেন নি, বরং বিপরীতদিকে

বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাগুলি (যেমন দেশভাগ, দাঙ্গা, ভাষাভিত্তিক অঞ্চলবিভাগ) চেতনে-অবচেতনে গতিবেগ লাভ করেছিল।

আজ ঘরে আগুন লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে আজ কূপ খননের ('লোকহিত' প্রবন্ধ) চেষ্টা বৃথা। তবু যদি পূর্ববর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সরল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শিরোধার্য করে অগ্রসর হওয়া যায়, যদি সমস্যাটার শুধু মাত্র রাজনৈতিক সমাধানের পথে না গিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে কিছু সুফল পাওয়া যাবে।

চন্দন চারণ

ধর্মীয় সংকট এবং ধর্মপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

'ধর্ম' জাতি, রাষ্ট্র বা আন্তরাষ্ট্রে সংকট বা কোন সমস্যার সৃষ্টি করছে, এমন কথা যদি বলি ত এর বিরুদ্ধে প্রথমেই কথা উঠবে, 'স্পর্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য'। আসমুদ্র হিমাচল গোটা ভারতবর্ষে সোরগোল উঠবে, হই-চই কাণ্ড বাঁধবে, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি আত্মীয় স্বজনেরা পর্যন্ত বলবে, সর্বনেশে ব্যাপার! ভারতবর্ষে জন্মে ধর্ম মানেনা, নাস্তিক! 'বাপঠাকুরদা চোদ্দ পুরুষ ধরে ছেলেপুলে নিয়ে সুখে শান্তিতে আছি—আর এ বলে কি না ঈশ্বর নেই, ধর্মই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আসলে যত সমস্যার মূলে এই রাজনীতি।' এ কথা আজ ভারতে প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। এই সব সহজ সরল ধর্মপ্রাণদের কথা তো' আংশিক সত্য নিশ্চয়ই। কারণ বিশ্বের সমস্ত কিছুই আজ রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। ধর্মেরও নিজের কিছুই করার নেই। সেও আজ রক্ষণশীল রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা দখলের ও কায়েম রাখার হাতিয়ার মাত্র, সে কথায় পরে আসছি।

আমি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে অগণিত সহজ সরল ভারতবাসীর বিরাগ ভাজন হতে চাই না। তবে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলি যে যুক্তিনিষ্ঠ খোলা মন নিয়ে ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি—তাতে অন্তত কোন সুধীজনের কোন আপত্তির কারণ থাকবে না নিশ্চয়ই। কারণ ধর্ম আছেকি নেই তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই—তা আমার আলোচ্য বিষয়ও নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বড়ই ধর্মপ্রাণ তার মানুষজনেরা। এ দেশে যে ডাক্তার টেস্টটিউবের মধ্যে ভ্রূণের জন্ম দেয় সেও ল্যাবরেটারীতে বসে আগেই একবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জোড়হাত কপালে ঠেকায়। যে বিজ্ঞানী ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে আনবিক অস্ত্রে কোটি কোটি মানুষকে ধ্বংস করতে পারে সে-ও ঐ বোতাম টেপার আগে একবার ঈশ্বরের

উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়। অতি বড় দার্শনিক, পণ্ডিত, সমাজ সেবিরাও মনে করে যে তারা কিছুই করে না বা ভাবে না। যা কিছু করবার মালিক ত 'তিনিই'। এই 'তিনি' অর্থাৎ ঈশ্বর। মানুষের ত নিজের কিছুই করার নেই যদি সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা না হয়।

শুধু ভারতবর্ষ কেন? পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মীয় অনুশাসনেই সবচেয়ে বেশী দিন তাদের শাসন তথা শোষণ কায়েম করেছে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ তা হল অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত পৃথিবীর প্রতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষের অসীম ভীতি। এই বিংশ শতাব্দীতেও সভ্যতাগর্বী এক শ্রেণীর রাষ্ট্রনায়ক, তথাকথিত পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাশালীরা মানুষের এই ভীতি ও অজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যাচ্ছে। সেই রাজা-রাজড়াদের কালে থেকেই নিজেদের শাসন শোষণকে অটুট রাখতে পুরোহিত, যাজক তথা ধর্মীয় প্রধানদের ব্যবহার করে আসছে! এই ধর্মীয় প্রধানেরাই সেই সময় সমাজের ও মানুষের আচার আচরণের বিধি নিয়ম তৈরী করত। রাজারা এই সব ধর্মীয় প্রধানদের দিয়ে তাদের প্রয়োজন মত শাস্ত্র ও নীতি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়ে নিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেহেতু ভীতি থেকেই ধর্ম বা ঈশ্বরের উৎপত্তি সেহেতু সমাজের সমস্ত আচার-আচরণ ও বিধি নিয়মের সঙ্গেই ঈশ্বরকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা কোরনা তবে অমুক দেবতার কোপে পড়বে, ওটা কোরনা তবে তমুক দেবতার কোপে পড়বে। আর যদি নিতান্ত করে ফেল তবে পুরোহিত নির্দিষ্ট বিশেষ অন্যায় বা পাপ স্খালনের জন্য বিশেষ দেবদেবীর পূজা করতে হবে পুরোহিত দক্ষিণা ও নৈবেদ্য সহকারে। তাহলে আর কোন কিছুতে পাপ লাগে না যদি নৈবেদ্য আর দক্ষিণা পুরোহিত রচিত শাস্ত্রানুসারে হয়। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মেলে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ও মঙ্গল কাব্যগুলিতে।

আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই হল ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং বলিদান ইত্যাদি। আমরা যদি মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি তবে দেখি, এই সমাজের মোটামুটি দুটি স্তর হল—শ্রেণী পূর্ব বা আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং অন্যটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। এই আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে সব আদিম বন্য মানুষের কথা জানি তাদের কোন ঈশ্বর ছিল না—ছিল না কোন প্রার্থনা অনুষ্ঠান বা বলিদান প্রথাও।

অথচ সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পত্তির উপর কায়েমী প্রভুত্ব স্থাপনের ফলে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রূপ নিল, ঠিক তখন থেকেই ধীরে ধীরে নানা স্তর ও পর্যায়ের মধ্যদিয়ে সমাজ ও মানবজীবনে ধর্ম তার স্ব-পারিষদে বেশ জাঁকিয়ে বসল। এবং রাজা ও পুরোহিতেরা তাদের স্ব-স্ব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে একত্রে মিলিতভাবে সাধারণের উপর নানা প্রক্রিয়ায় শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকল।

এই অত্যাচারের মাত্রা এতই চরমে উঠেছিল যে ১৩৮১ সালে সারা ইউরোপে এই ধর্মীয় অত্যাচার এবং পুরোহিতদের দেয় ট্যাক্স ও মাথা পিছু দেয় করের বিরুদ্ধে 'গরীব ভ্রাতৃসংঘ' নামে গঠিত কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা ও পুরোহিতেরা মিলিত ভাবেই নির্বিচারে বিদ্রোহীদের হত্যা করে এই বলে: তোমরা সব দাস এবং দাসই চিরকাল থাকবে। তখন এই আন্দোলন কারীদের মনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল, 'খ্রীস্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর আমাদের সবাইকে গড়েছেন তবু আমাদের উপর এমন পশুর মত ব্যবহার করা হয় কেন?'

জন হাস নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও তারা ধর্মচ্যুত করে এবং বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। হাস এর অপরাধ সে, 'ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত জিনিসই সাধারণের সম্পত্তি হওয়া উচিত,' 'এই মতবাদের অনুসারী ও নেতা। এই হল ধর্মের সাদা পোশাকের ভেতরের আসল কদাকার চেহারা।

সে যাই হোক, এখন একটা বিষয় পরিষ্কার যে মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ঈশ্বর বা ধর্মের অস্তিত্ব ছিলনা। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে, ঈশ্বর বা ধর্ম এলো কি ভাবে? অধ্যাপক জর্জ টমসন এক বক্তৃতায় এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন:

> শ্রেণী সংগ্রাম যাদের প্রধান পদানত ও নিপীড়িতে পরিণত করেছে, এই পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দে জন্মগত অধিকার যাদের লুণ্ঠন করা হয়েছে যাদের আর্ত ও ভারাক্রান্ত জীবনে সব আকাঙ্খা এই বাস্তব দুনিয়া থেকে সরিয়ে এক কাল্পনিক পরজগতে হারানো অধিকার ফিরে পাবার ব্যর্থ আশার দিকে ঘোরানো হয়েছে। জন্মগত অধিকারকে মৃত্যুপরবর্তী অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে মানুষের

দুর্বলতা যেমন রূপাশিক হয়েছে ইন্দ্রজালে, তেমনি সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে মানুষের দুর্বলতা রূপ পেয়েছে ধর্মে।[১]

টমসন বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বললেন :

> "মেহনতী শ্রেণী তাদের পর পদানত জীবনের আসল কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় ধর্ম বিশ্বাসের।

"ঈশ্বরের অনুকরনেই মানুষ সৃষ্ট হয়েছে' ঈা ঈশ্বরই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট এবং ত্রাতা বা নিয়ন্ত্রাতা, পুরোহিত যাজকদের এই কথা যদি মেনেও নিই তবে তো নিশিতে ভাবেই সৃষ্টির আদিকালেও মানুষের সংগে ঈশ্বরের যোগ থাকার কথা। কিন্তু ইতিহাস তো তা বলেনা। পুরোহিতরা যতই বলুক 'ঈশ্বরের অনুকরনেই মানুষ সৃষ্ট হয়েছে' আসলে কিন্তু ধর্মের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, মানুষ তার নিজের কল্পনা থেকেই প্রয়োজনে অনুযায়ী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। এর প্রমাণ ঋকবেদে ঈশ্বরের কোন কায়া বা মূর্তিকে স্বীকার করা হয়নি, কেবল একটি শক্তি হিসেবেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছে। ক্রমে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য-তেই আমরা যত ঠাকুর দেবতার ছড়াছড়ি দেখতে পাই।

এই সব ঠাকুর দেবতা বা ঈশ্বর কিভাবে সৃষ্টি হয় তার উজ্জ্বল নিদর্শন ৭০ এর দশকে সৃষ্ট 'সন্তোষী মা' এই মার পূজা প্রচলনের কিছুকাল আগেই দেখা যেত কিছু হ্যাণ্ডবিল হাটে বাজারে বিলি হচ্ছে। যাতে লেখা আছে, 'সন্তোষী মা' নামে এক দেবীর সাক্ষাৎ পান এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ঐ মা নির্দেশিত পূজাদানে অসম্মত হলে পরদিন প্রাতে দেখেন তার সন্তানমৃত। এছাড়াও আরও কত লোকের কত ক্ষতির বিবরণ এবং পূজাদানে কত বিপুল প্রাপ্তির বর্ণনা। সর্বশেষ লেখা, এই হ্যাণ্ডবিল পাওয়ার পর কয়েক হাজার কপি প্রকাশ করতে হবে নতুবা যৎপরনাস্তি ক্ষতির সম্ভবনা। আমার মনে হয় না যে পূজা না দিয়ে কারুরই কোন ক্ষতি হয়েছে—অথবা পূজা দিয়ে কোনকিছু লাভ হয়েছে এ-কথাতো কেউই হলফ করে নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না। কারণ এটা সর্ববাদী সম্মত যে এটা একশ্রেণীর পুরোহীত সমাজেরেই বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ঐ দেবীর প্রথম সাক্ষাৎ কিন্তু ব্রাহ্মনই পায়, অন্য কোনো জাতির লোক নয়। আসলে 'যে পরিমানে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ

করছে সেই পরিমানেই ধর্ম লোপ পাচ্ছে', ফলে স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচাতে এই নতুন দেব দেবীর সৃষ্টি করা আজ পুরোহিত সমাজের কাছে অত্যন্ত জরুরী। কারণ পুরোনো দেব-দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশঃই কমছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা এই জন্যই যে দেব-দেবী বা ঈশ্বর বা ধর্ম কি ভাবে মানবকল্পিত মনে সৃষ্ট হচ্ছে তারই একটা প্রমাণ স্বরূপ।

প্রচলিত কুসংস্কার যে আমাদের সমাজ ও মানবজীবনকে কিভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে নিষ্পেশিত করে একটা বিষম সামাজিক সংকট সৃষ্টি করছে তার প্রমাণ পেতে আমাদের কোনও পুঁথির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই হিল্লী-দিল্লীঘুরে বেড়াবার কারণ ধর্ম আমাদের অস্থিমজ্জায় এমনই অনুপ্রবিষ্ট যে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও যদি আমাদের বাড়িতে কলেরা বসন্ত দেখা দেয় তবে আমরা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগেই 'শীতলা' বা 'চণ্ডীর' স্মরাণাপন্ন হই, যদি কোনও মামলা মোকদ্দমা বা বিবাদের সৃষ্টি হয় তবে 'মা দুর্গা' বা 'মা কালীর' মানসিক করি, আর যদি একটু গ্রামাঞ্চল হয়, সাপের হাত থেকে পরিত্রান পেতে তো 'মা মনসার' পূজার ঘটার অন্ত থাকে না। ভাবতে হাসি পেলেও এটা আজ অত্যন্ত বাস্তব সত্য। জনসমক্ষে তর্কের খাতিরে স্বীকার না করলেও পথের ধারে গাছের তলায় পাথরের খণ্ড পড়ে থাকতে দেখলে নিজের অজান্তে যে কখনই হাতটা কপালে ঠেকে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আসলে এটা আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কার জাত।

ধর্মগুরুদের প্রশ্ন করুন তো—ঈশ্বর যে আছে এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ দিতে পারেন? ঈশ্বরকে দেখাতে পারেন? এর অত্যন্ত সহজ-সরল 'রেডিমেড' উত্তর পাবেন—জন্ম-জন্মান্তর ধরে সাধনা করলে তবেই তাঁকে দেখা যায়, তবেই তাঁকে অনুভব করা যায়।

আবার আপনি যদি প্রশ্ন করেন—ভগবান বা ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় অর্থাৎ তিনি যদি বিশ্বের সকলের মঙ্গল চান বা এ বিশ্বের সব কিছুই যদি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তবে তিনি কেন মানুষের মনে পাপবোধের জন্ম দেন আর কেনই বা, মানুষ অসৎ হয়? তিনিতো সব মানুষকেই সৎ ও সুন্দর করে তৈরী করলেই পারেন। তাতে তো পৃথিবীতে আর অনর্থক হানাহানি দাঙ্গার সৃষ্টি হয় না, কোন শোক-তাপ-দুঃখ থাকে না। তখন কিন্তু তার উত্তর মেলে, ঈশ্বর কাউকেই পাপ বা অন্যায় করতে বলে না। মানুষ নিজেই এসব করে। আর সেই

মানুষ যদি গরীব হয় তবে তো তার কঠোর শাস্ত্রীয় শাস্তিবিধান করতে ঐসব সাধু মহারাজদের বা দণ্ড দিতে রাষ্ট্রকর্তাদের বিন্দুমাত্রও বিলম্ব সয়না।

আবার যদি প্রশ্ন করেন, কৃপাময় ঈশ্বর কেন কাউকে ধনী আবার কাউকে গরীব করেন। তারও অত্যন্ত সহজ উত্তর তৈরী। তারা তখন বলেন, পূর্ব-জন্মের সুকৃতির জন্য মানুষ ধনী হয় আর দুষ্কৃতির জন্য গরীব হয়। এজন্মে ভাল কাজ কর তবে আবার পরজন্মে অর্থশালী হবে, কোনও দুঃখকষ্ট থাকবে না —সবই ভাগ্য। পূর্বজন্মে অন্যায় করেছ তার ফলভোগ যাবে কোথায়, তাই গরীব ঘরে জন্ম নিয়েছ।

এইসব 'রেডিমেড' উত্তরের চালাকিটুকু আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত স্বচ্ছ। সব কিছুকেই জন্মান্তরের আড়ালে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রকারেরা করে রেখেছে। ঐসব ধর্মীয় প্রধানেরা যে সব যুক্তি বা উত্তর দেন তাকে আপনি মূল প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ, আপনি পূর্বজন্মে কি করেছেন এবং পরজন্মে কি করবেন বা কি হবেন তা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। অগনিত অশিক্ষিত অপশিক্ষিত মানুষ যাদের দুবেলার পেটের যোগাড় করতেই প্রাণান্ত পরিশ্রমে দিন কেটে যায় ঈশ্বর আছে কি নেই, মানুষের জন্মান্তর ঘটে কি ঘটে না এসব প্রশ্ন ভাবার বা জানার অবকাশই বা তাদের কোথায়? ফলে পুরুষানুক্রমে লব্ধ কুসংস্কারকেই তারা সত্য বলে ধরে নেয়। তাছাড়া ঈশ্বর আছে বলে মেনে নিলে তো সবকিছু চিন্তাভাবনা তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে মিথ্যা হলেও কিছুটা যুক্তি এবং কল্পিত শান্তিতো পাওয়া যায়। ঠিক এই চিন্তাতেই মানুষ যতই বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয় ততই সে বেশী করে ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এই যুগ যুগ ধরে মানুষের ঈশ্বর নির্ভরশীলতাই মানুষকে ক্রমশঃ সৃষ্টিবিমুখ এবং কর্মবিমুখ করে দেয় নিজেরই অজান্তে। তাই যে দেশে ঈশ্বর বিশ্বাসের কুসংস্কার যত বেশী সে দেশ ততই অনুন্নত ও পশ্চাদ্‌পদ। এই পশ্চাদ্‌পদ ভারতীয় গ্রামীন সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভারত শাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ হাউস অব্ কমন্স্ এর এক পুরনো দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কার্ল মার্কস বলেন :

"নামতঃ স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোর মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে তারা (ভারতবাসীরা) কালাতিপাত করে আসছে; গ্রামের সীমা চৌহদ্দির

পরিবর্তন ঘটেনি প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই ; গ্রামগুলি নানা সময়ে আক্রান্ত হয়েছে বিধ্বস্ত হয়েছে, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারীতে উজাড় হয়েছে গ্রামগুলি কতবার, কিন্তু সেই একই নাম একই সীমা চৌহদ্দি বংশপরম্পরা একই আদি অকৃত্রিম বৃত্তিধারা বয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। রাজ্য ভাঙ্গা গড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার সামান্যতম কারণ ঘটেনি সেই মানব গোষ্ঠীর। বাইরের পরিবর্তন গ্রামের শিরা-উপশিরায় আনেনি এতটুকু চাঞ্চল্য। কোন্ শাসক গেল কোন শাসক এল—কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি সে বিষয়ে গ্রামীন অধিবাসীদের মধ্যে। এদের জীবন-জীবিকা, এদের গ্রামীন অর্থনীতি রইল একান্তই অপরিবর্তনীয়।[৩]

এই দলিলটি একটু বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টা আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার হবে যে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস ভারতের মত অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশেও কিভাবে অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি যেমন হয়নি একদিকে তেমনি অন্যদিকে তার মঠ, মন্দির মসজিদ এবং প্রাসাদ কেল্লা ও স্মৃতিসৌধগুলির স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলা তৎকালীন রাজন্যবর্গ পুরোহিত-যাজক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার যুগপৎ সাক্ষ্য দেয় একই সঙ্গে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনাও দৃষ্টিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে পারলৌকিক ও জন্মান্তরবাদের সুগভীর অন্ধকারে ফিরিয়ে দিয়ে এই রাজা-রাজড়া এবং পুরোহিত-যাজকরা পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্পদ সচ্ছন্দে ভোগ করে এসেছে নির্বিবাদে। আর ঐ সহজ-সরল মানুষগুলো ঐ মুষ্টিমেয়ের জন্যই সম্পদের পাহাড় তৈরীতে প্রাণাতিপাত করে এসেছে এইভেবে যে, 'মা ফলেষু কদাচনম',—অর্থাৎ কাজ করো কিন্তু ফলের আশা করো না।

ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা উন্মাদনা, একা মাদকতা, একা নেশাগ্রস্ততা আছে। ধর্মীয় সংস্কার মানুষকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবিমুখ করে অন্ধ করে দেয়। আর তার সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করে আসছে সুযোগ সন্ধানীরা যুগে যুগে।

সাম্রাজ্যবাদীরাও এই ধর্মকে তাদের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা বিভিন্ন মিশন এবং চার্চের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন

করছে অত্যন্ত সতর্কও সুচতুরভাবে। ভারতেও এই সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা পূর্বভারতে মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও বিদেশী চার্চ-মিশন গুলি অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের অজুহাতে দীর্ঘদিনের সরকারী বঞ্চনার শিকার এইসব রাজ্যগুলিতে গরীবদের অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধার বদলে ধর্মান্তরীকরণ করছে এবং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের মদৎ দিচ্ছে। আমাদের দেশের কিছু লোকও রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ফয়দা লুটতে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান আগুনে অজ্ঞ সাধারণ মানুষদের ঠেলে দিচ্ছে। আর এইভাবে রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টির মাধ্যমই হ'ল ধর্মনামক কাল্পনিক বস্তুটি।

পাঞ্জাবের খালিস্তানী আন্দোলনেরও সামনে এসেছে ধর্ম। ধর্মীয় উন্মাদনায় হাজার হাজার মানুষ আগুনের খেলা খেলছে। কি করছে, কেন করছে তারা নিজেরাই জানে না। অথচ পেছন থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভিন্দ্রানওয়ালের মত ধর্মীয় নেতাদের ব্যবহার করছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও যারা দেশে ধর্ম, জাত-পাত ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে। এক ধর্মের লোকেদের উস্কে দিচ্ছে অন্য ধর্মের লোকেদের বিরুদ্ধে।

আমাদের দেশের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তো দাঙ্গার হিসেব নিকেশ করার কোনও উপায় নেই। কিছু অসাধু লোকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই বহু লোকের অনর্থক প্রাণ গেল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি হয় তার কারণ হিন্দু আর মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা ভূখণ্ড বা রাষ্ট্র—অর্থাৎ সেই চিরাচরিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াই। ১৯৩৭ খৃঃ ভারতে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে ৪২৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং মাত্র ২৬টি আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ ঐ নির্বাচনে মাত্র ৪.৫ ভাগ আসন লাভ করলেও অনতিবিলম্বেই আপামর মুসলিম জনসাধারণকে তাদের সমর্থনে আনতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের বিভিন্ন দাবীর কাছে ক্রমশঃ পিছু হটতে হটতে কংগ্রেস একসময় ভাবতে শুরু করে যে মুসলমানরা কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী। যদিও মুসলিম লীগের জন্মই হয় উগ্র ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা থেকেই। তারপর কংগ্রেস

ও মুসলিম লীগ উভয়েই ধর্মকে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার করে আজ এই ভাতৃঘাতী দাঙ্গা ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। কই কোন ঈশ্বর বা ধর্ম তো মানুষে মানুষে এই অনর্থক বিভেদ হানাহানি বন্ধ করতে পারল না। বহু পুরোহিত ও মোল্লারাও বরং এই ধর্মীয় দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছে, অংশও নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য :

> ……আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।
>
> "সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিলনা তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি'। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না।[৪]

আসলে এই বাহ্যিক ধর্মাড়ম্বরের কোনও মূল্য নেই। যে ধর্ম কেবলই মানুষ বা সমাজকে কিছু অবান্তর অবাস্তব নিয়মের নিষ্পেষণে নির্মমভাবে নিস্তব্ধ করে, শোষণ করে তার কি ইবা মূল্য থাকতে পারে?

শুধু কি হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মন-শুদ্র, নারী-পুরুষের মধ্যেও ধর্ম বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে শুদ্রকে যেমন ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করার অধিকার দেওয়া হয়নি তেমনি ঐ অধিকার দেওয়া হয়নি মহিলাদেরও। তাছাড়া এই ধর্মীয় অনুশাসন পুরুষকে যতই স্বাধীনতা দিয়েছে নারীকে তার কনামাত্রও দেয়নি। মুসলমান সমাজেতো নারীর মূল্য কানাকড়ির দামেও বিকোয় না। নারী জাতিকে মুসলমান ধর্মে পদানশীন করে রেখে তাকে এই বিশ্ব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নারী সেখানে, 'Wife is only for beeding and cooking'

ধর্মকে আমাদের সমাজের কি গভীরে প্রবেশ করে তার রন্ধ্রে ঘুন ধরিয়ে জনসমাজকে আজকে এক সর্বনাশের নেশায় বুঁদ করে রেখেছে তা একটু চিন্তা করলে যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিই শিউরে উঠবেন নিশ্চই। গত ২৪ ও ২৫শে জুলাই মিজোরাম জাতীয় ফ্রন্ট (এম. এন. এফ) সদস্যরা যখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য বহু দুর দুরান্ত থেকে আসছিল তখন তাদের মুখে একটি গান শোনা যায় : কান্ দিল ন্গাই থ্লা আং চে, / কান আম্‌দান তুর ন্গাইনাহ্‌, /

মিপুই কান ইনক্হওন্ হিয়ান, / আও পাং কান্ লাল কান্ পাথিয়ান, ই মিং রোপুই বার সে, / ই মা আ কান্ লো কুন হিয়ান্।[৫]

এই গানটি মিজোদের অত্যন্ত প্রিয় গান, ভগবান যীশুর উদ্দেশ্যে লিখিত। যার সারমর্ম হল, হে প্রভু, আমরা তোমার উপরই আস্থাশীল। আমাদের প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তেই তুমি আছ। আপাতঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এই প্রসঙ্গটির অবতারনা করলাম এই জন্য যে মিজোরাম জাতীয় ফ্রন্টের সাধারণ সদস্যরা কিন্তু জানে তারা কোন অন্যায় করছে না। এই কাজের পেছনে আছে তাদের প্রভু যীশু। এ জিনিষ আমরা অতীতেও দেখেছি। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমচেতা যুযুৎসর:' — গীতার এই উক্তি এ বিষয়ে প্রামাণ্য। কারণ 'ধর্মযুদ্ধ' আখ্যা না দিলে তো সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকদের যুদ্ধে টেনে আনা যাবে না। কি আশ্চর্য ব্যাপার, একশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী লোক তাদের কাজ হাসিল করতে এ যুগেও ধর্মকে সস্তা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সরল মিজোদের ক্ষেপিয়ে দীর্ঘদিন এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি দার্জিলিং এ গোর্খা ন্যাসানেল লিবারেশন ফ্রন্ট ভারতকে টুকরো টুকরো করার যে সর্বনেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছে তার পেছনেও ধর্মীয় মিশনগুলি এক ভয়ঙ্কর বিপদজনক ভূমিকা পালন করছে। ওখানকার চার্চগুলি ঐ বিচ্ছিনতাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে উদার হচ্ছে অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছে। একটা দেশকে ধ্বংস করতে ধর্মীয় সংস্থাগুলি ধর্মের চেহারাকে একেবারে উলঙ্গ করে ধরেছে।

ধর্ম আছে কি নেই সেটা মোটেই আমার প্রশ্ন নয়। কিন্তু ধর্মকে অত্যন্ত সস্তাভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং নিতান্তই সংকীর্ণ প্রয়োজনে অপব্যবহার করায় তা আজ আমাদের সমাজ ও জনজীবনকে যে কি দৃঢ় নিস্পেষণে নিস্পেষিত করছে এবং গভীর সমস্যার সংকটে জর্জরিত করছে তা আজ আর আমাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধর্মীয় সংকট ও ধর্মের অপব্যহারে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাববাদী হলেও এর বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় তিনি ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি রবীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠভাবেই উপনিষদের মতাবলম্বী ছিলেন। তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত করেন। যদিও এর পেছনে সংগত কারণ ও আছে। তিনি তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আর দেবেন্দ্রনাথের ছিল উপনিষদে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাই উপনিষদ্ প্রীতি ছিল তার কাছে পৈত্রিক। তিনি প্রথমদিকে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থাবলীতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গিতেই তাঁর ধর্মমত বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু নিয়তঃ পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল মানসিকতাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ধর্ম সম্পর্কে, তাঁর আধ্যাত্মিক মনোভাবের পরিবর্তন করেন। লেখেন 'মানুষের ধর্ম'। তখন মানবিক দিক থেকেই তিনি ধর্মের বিশ্লেষন করেন। ধর্ম কিভাবে মানুষের সমাজ জীবন ও জাতীয় জীবনে সংকটের সৃষ্টি করছে তা তিনি বিষদ ভাবে তুলে ধরেন এবং যথাসাধ্য প্রতিকারের ও পথ নির্দেশের চেষ্টা করেন।

২

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন তক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনম্ ॥

ব্যক্তিগত জীবনে কবিগুরু মোটামুটি সারাজীবনই উপনিষদের এই বাণীকে মেনে এসেছেন। তিনি এর ব্যাক্ষ্যা দিয়ে লিখেছেন, :

……মাগৃধঃ, লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, একথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে, কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কি? সত্য হচ্ছে এই 'ঈশাবাস্যমিদং মঠং', সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সবচাইতে বড় সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সবচেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু, ইশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন, এইটেই যখন শেষকথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা, আর, তেন তক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন :

> যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি।[৭]

তিনি আরোও বললেন :

> য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ, বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক এবং তাঁর কোন বর্ণ নেই, অথচ বহুধা শক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজন সকল বিধান করছেন।[৮]

ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের পেছনে আমরা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব টের পাই। কারণ, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো নিশ্চই একটা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সে শক্তি অদৃশ্য, তার কোন বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আর কায়াতো নিশ্চই নেই। সেই শক্তিরই নামরূপ যদি হয় 'ঈশ্বর' তাতে তো আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। আর এই শক্তি তথা ঈশ্বরের নিয়ম তো সার্বিক ও শাশ্বত। তা কি রাজা-মহারাজা, কি পরোহিত যাজক, কি উচ্চ-নীচ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। অথচ একশ্রেণীর মানুষ সেই শক্তিকে (তারা বলে ঐশ্বরিক শক্তি) আয়ত্ব করে তার আর দ্বারা বিশ্বের আপামর সাধারণ মানব সমাজের উপর শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা আর নিপীড়ন করে চলেছে নির্বিবাদে। ক্ষমতার লোভে তারা (পুরোহিত ও যাজকেরা) আজ উন্মাদ, দিশেহারা হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঈশ্বর জাতিহীন। অথচ হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় আজ নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও বিভেদে লিপ্ত হয়ে দেশও জাতির জীবনে ঘোরতর দুর্দিন ও সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে। আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকু মাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়েদিয়ে তারপরে-

বাকি সমস্ত যায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানেনা ব'লেই এত ভয়ানক।[৯]

অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই সব কিছু করে ধর্মের ঘাড়ে তার দোষ চাপাচ্ছি। আর তার ফল স্বরূপ এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়ীক সংকট ভ্রামক এক জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের সমাজকে জর্জরীত করছে।

'একোবেশী সর্বভূতান্তরাত্মা' অর্থাৎ একই প্রভূই সর্বভূতের অন্তরাত্মা না ভেবে 'ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে' প্রতিষ্ঠিত ভাবছি বলেই তো আজ আমাদের মত বিপত্তি।

এই সংকট থেকে পরিত্রানের জন্য তিনি বলেছেন :

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে—সত্যকে পাওয়াতেই আপনাদের পরিত্রাণ।[১০]

সত্যিইতো অজ্ঞানতা আর অবিদ্যার জন্যই ধর্মের বা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ মানুষ বুঝতে পারছেনা। তিনি তাই বলেছেন :

আমরা দুর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এই জন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গ ভঙ্গিটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া ওঠে।[১১]

অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে কেবল বাহ্যিক ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর সর্বস্ব করে তুলেছি। পুরোহিত ও যাজকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধর্ম কেবল নিয়মতান্ত্রিকতা সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। ধর্মে কার্য-কারণ ও প্রয়োজনীতার দিকে আর কারুরই লক্ষ নেই, কেবল সার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ঠাঁটটুকু—ধর্মতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন :

মনেরাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই······

ধর্ম বলে, মানুষকে শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মবাদী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্ম ভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা

বিশেষ তিথিতে অন্ন-জল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লঙ্ঘন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয় চোদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মন সে যত বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।[১২]

শুধু এই কটি কথাতেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র বা ধর্মের বাহ্যিক নিয়মসর্বস্বতার যে ব্যাখ্যা ও তার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, মনে হয় বিশ্বে আর খুব কম সাহিত্যিকই তা করেছেন, আর পুরোহিত যাজকরা তো নয়ই। এই ক'টি কথার স্বরূপও মূল্য অবধারণ করতে পারলেই বিশ্বে আর কোনও ধর্মীয় সংকট ও হানাহানি বা কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারায় আমাদের সমাজের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তিনি বললেন :

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শুদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকার-ভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল, যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশী কিছু করিতে হয় নাই, তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই শুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণেই পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল।[১৩]

এই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যে অত্যন্ত সুপারিকল্পিত ভাবেই মানব সমাজের এতবড় সর্বনাশ করেছে তা-ই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। তাঁর মতে ধর্মের কোথাও হানাহানি বিভেদের কথা নেই, সেই কোনও রকম গোঁড়ামীর স্থান ও।

আসলে আবহমানকাল থেকেই প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই

ধারাই চলে আসছে। স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথ ধর্মের এই প্রগতিশীল ধারার অনুযায়ী ও অন্তর্গামী। যে ধারাটি বলে শান্তি, শুভেচ্ছা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম, সমাজ সেবা এবং সার্বজনীন সৌভ্রাত্য—অর্থাৎ সমস্ত মানুষের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি করা। আমরা নিশ্চই কবিগুরুর এই মতের স্বপক্ষে যে, মানব কল্যাণ কামনা ও এবং মানব সেবাই প্রকৃত ধর্ম।

পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ কবীর, চৈতন্য ও বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের সহজিয়া সাধন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁর কাছে অবান্তর ও অবাঞ্ছনীয় মনে হয়। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা জাতপাতভেদ প্রভৃতি সমস্ত কিছুতেই ধর্মের অজুহাতে যখন একশ্রেণীর অসাধু লোক তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে তা দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মর্মাহত হন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করেন :

> ···আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানব সমাজের সমস্ত ভেদাবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—
> শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামণি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরাস্তাৎ। ও একমেবাদ্বিতীয়ম্।[১৪]
> এবং তিনি প্রার্থনা করেন উপনিষদের সেই বাণী উচ্চারণে : অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। অবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যাও দক্ষিনং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।

এইখানে তিনি বিশ্ব চরাচর সেই মহাশাক্তির-ই প্রার্থনা করেছেন, কোথাও কোন বিশেষ ধর্মমত বা কোনও মূর্তিরূপী ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মাকে নিবেদন করেন নি। এই মহাশক্তিই তাঁর কাছে অমৃত স্বরূপ। তাঁর এই শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনের লক্ষ্য—'নমঃ সম্ভবায় চ সায়োভবায় চ'—অর্থাৎ তিনি নমস্কার করেন যা কিছু সুখকরকে, যা কিছু কল্যাণকরকে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ বাণী যা মানব সমাজের সংগ্রামী জীবনের পাথেয়। তা হল :

> ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোন মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় প্রাপ্ত বিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্ম বিদ্বেষ। দেড় শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েত রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে

বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্ম হননের আগুন উদ্দীপ্ত; মেক্সিকোয় বিদ্রোহ করে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।[১৫]

টীকা টিপ্পনী

১. ধর্ম ও সমাজ, জর্জ টমসন, পৃঃ ১৬।

২. ঐ। পৃঃ ১২।

৩. কার্ল মার্কস। ভারত শাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স-এর পুরনো দলিল থেকে উদ্ধৃত।

৪. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮।

৫. মিজোরাম জাতীয় ফ্রন্ট সদস্যরা অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে আসার সময় এই গানটি গাইতো।

৬. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১০৯।

৭. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬২।

৮. শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮।

৯. শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২-৩।

১০. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৩

১১. ঐ। পৃঃ ৪১।

১২. ঐ। পৃঃ ৬৮।

১৩. ঐ। পৃঃ ৫৩।

১৪. শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১২।

১৫. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২৫।

হীরেন্দ্রকুমার রায়

ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্ন ও রবীন্দ্রনাথ

আমরা ভারতবাসী অত্যন্ত গর্বিত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমরা বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াই। কিছু কিছু মানুষ বেঁচে থাকেন তাঁদের কর্মে। আর সেই কর্ম সম্পদই উত্তর সূরীদের কাছে আনে সম্মান, গৌরব ও প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন অহঙ্কার।

কিন্তু আজ এইক্ষণে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের পাশাপাশি এক ব্যর্থতাবোধ ও আত্মগ্লানি প্রতি মুহূর্তে এই দেশবাসীকে দগ্ধ করছে। বিশ্বকবির ১১৫তম জন্ম বার্ষিক পালনের মুহূর্তে আমরা যখন তাঁর আদর্শ, দেশবাসীর প্রতি অবিচল ভালবাসার কথা স্মরণ করছি, ঠিক তখনই এদেশের অধিবাসীরূপে আমরা অন্তরে সমধিক বিদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু কেন? আমরা কেন রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ হয়ে তাঁকে স্মরণ করতে লজ্জাবোধ করি। আমরা, যারা কবির আদর্শকে হৃদয়ে উপলব্ধি করি, সমকালীন দেশীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর ভূমিকার বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তাদের কাছে রবীন্দ্র-আদর্শের অবমাননা তথা লাঞ্ছনা অবশ্যই কশাঘাত করে থাকে। রবীন্দ্রকল্পিত 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' আজ উত্তাল-সংকটাপন্ন। তবুও একশ্রেণীর ভণ্ড রবীন্দ্রভক্ত মানুষ একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি গেয়ে বেড়াবেন আর তাঁর আদর্শের এই নগ্ন নির্যাতন দেখেও না দেখার ভান করবেন। অতএব, ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানি উপলব্ধি করার মানসিক অনুভূতি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্পষ্টতই রবীন্দ্র-আদর্শের তথা চিন্তাচেতনার পরিপন্থী এইসব মানুষ এই ব্যর্থতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে প্রমাণ করতে চাইবেন'—যারা রবীন্দ্র-আদর্শ জলাঞ্জলির কথা তুলছেন তারা কতটা মেকি, ভণ্ড, কৃত্রিম।

সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্য হল ভারতবর্ষের ঐক্য তথা এই দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে বসবাসের বিষয়টা বিবিধের মাঝে মিলনের এই উজ্জ্বল রূপ পৃথিবীর আর

কোনও দেশে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষকে মহামানবের সাগরতীর রূপে কল্পনা করেছিলেন। এই দেশের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির কথা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এমনভাবে—হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হূন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।—এই দেহটি হল ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে দেশের জাতীয় ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ঐক্যের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যা প্রবল আকার নিয়ে ঐআন্দোলনকে কণ্টকিত করেছিল, সৃষ্টি করেছিল প্রতিবন্ধকতা।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে শত সহস্র বীর শহীদের রক্তাক্ত পথে। ফলে সেই কণ্টকিত স্বাধীনতাকে চোখের মণির মত রক্ষা কঠিন ব্যাপার। আজ স্বাধীনতাকে বিপন্ন, দেশের ঐক্য বিনষ্ট করার সুগভীর চক্রান্ত ঐ রক্তাক্ত স্বাধীনতার পাদমূলে আঘাত হানছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মের মানুষের মধ্যেকার সম্প্রীতির সম্পর্কটিকে ছিন্ন করার মতলব আঁটছে সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু শক্তি। মুষ্টিমেয় শক্তির সদম্ভ পদচারণা দেশকে বিপন্ন করে তুলছে।

জাতীয় ঐক্য তথা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি যে রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার মধ্যে বিশেষ একটি স্থান পেয়েছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণে লেখা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন: 'আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মাল মশলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মাল-মশলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতরে দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত১।'

ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাননি। নিতান্ত যুক্তিহীনভাবে ধর্মের ফরমানকে মেনে নেওয়া ধর্মের প্রতি চরম অবমাননার সমতুল্য

বলে তিনি মনে করতেন। এক স্বচ্ছ জীবনমুখী ধর্মনিরপেক্ষ মন নিয়ে কবি যখন বলেন, 'ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো' তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের' ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, 'কেন করব না[২]।' অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানব পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে মানুষের চলার পথটি মসৃণ ছিল না—বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় সর্বদা মানুষের পরস্পর মিলন ঘটেনি। সমসাময়িক অবস্থা উপলব্ধি করে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সাম্প্রদাদিক ভেদাভেদ, দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করার বিভেদকামী শক্তিগুলির সক্রিয় কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে মতামত রাখলেন। রাস্তার মাঝখানে গেঁড়ে থাকা খুঁটিশ্বরীর যে উদ্ভব তার উপমা টানলেন : 'পদের মধ্যে সর্বদা আনাগেনায় পথ সকল রবমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা, বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চির বিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা।'

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এইসব শক্ত সমর্থ খুঁটির সুবাদে দেশ দ্বি-খণ্ডিত করে এসেছে দেশের স্বাধীনতা। দেশের মাটি খণ্ডিত হল, ভাগ হল অবিভক্ত ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস। স্বাধীনতার পরেও এই খুঁটিগুলিকে অপসারিত করা যায়নি। এই খুঁটির দাপটে বর্তমান দেশের মানুষের ঐক্য সংহতি দেশের স্বাধীনতা বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সব ধর্মাবলম্বীগনের নিজের ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভারতেও কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধেই ভারত সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহন করে একেবারে প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ঘোষিত হয়নি। তবুও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শ, বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিতে ও অন্যান্য সংবিধানগত ধারা-উপধারা এই সুরটি ধ্বনিত

হয়েছে যে, ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি কখনই ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রাখেনি।

বর্তমানে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমশ প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সর্বপক্ষ ধর্মীয়তায় আর ধর্ম নিছক সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এমন এক বিষাক্ত বাতাবরণের মধ্যে এদেশের ঐক্য আজ সংকটাপন্ন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ কি অমোঘ সত্য কথাটাই না লিখে রেখেছেন তাঁর 'সমস্যা' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে : 'হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয় মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়ের জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।'[৩]

অথচ আমরা কোন দিক থেকে কম নই। অন্যান্য সমস্ত রকম পরিচয় নিয়েও আমরা পেশা, শ্রেণী কিংবা বুদ্ধিগত পরিচয় সম্বল করে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের প্রসারে বিরাট আকারে নিয়োজিত করতে পারি। তাতে অন্তত আর কিছু না হোক, ঐক্যের সমস্যা অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের কর্ণধাররা শ্রেণীস্বার্থে সে পথে আমাদেরকে বড় হতে দেয় না। ধর্মের মুখোশ পরিয়ে আমাদের বিবেক বোধকে ভোঁতা করে রেখেছে। এমন কি ধর্মের জিগিরে সর্বদা পারস্পরিক সংকীর্ণতা বজায় রেখে চলেছে যাতে আমরা কিছুতেই সেই ধর্মীয় কুসংস্কার আর বিভেদের গণ্ডী ছাড়তে না পারি। উগ্র জাতীতাবাদ ও মেকি দেশপ্রেমের প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজেদেরকে দেশের প্রকৃত মানুষ বলে জাহির করার অপচেষ্টা নগ্নভাবে ফুটে ওঠে। তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাহীন কণ্ঠ: 'আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যার তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে, যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।'

অতীতের ক্যানভাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখি এদেশীয় ধনী ব্যক্তিদের

সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের শাসক-শোষক ইংরেজ-এর সংঘাত
ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকারকে কেন্দ্র করে।
বিদেশে পাঠানো বন্ধ করার স্লোগানে সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল সেই সময়ের নিপীড়িত, বঞ্চিত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের। হঠাৎ দেশপ্রেমের জোয়ারে মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায়, চাপে পড়ে তারা যোগ দেয় তৎকালীন ভারতীয় বুর্জোয়াদের নিজ স্বার্থবাহিত ঐ আন্দোলনে। জাতিগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের ঐ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অন্তরায় সৃষ্টিকরল ধর্মীয় সংকীর্নতা। ভারতবর্ষের সেই সময়ের ধর্মীয় চেহারাটা কেমন ছিল? ধর্মের আচ্ছাদনটাকে ধীরে ধীরে খুলে ফেলে ভারতীয় মানুষ তখন ধর্মীয় অনৈক্যতা ঘুচিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল। সাধারণ মানুষ সংহত হচ্ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্য দিয়েই। সুফীবাদ, সহজিয়া বাউল ও চৈতন্যের ভক্তিলীলার প্রবাহে মানুষ নির্মল আনন্দে অবগাহন করছিল। যে বছর রাজধানী স্থানান্তর হল, ১৯১১ সালের জনগণনায় দেখা গেল হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সমান। অথচ হিন্দু-রিভাই-ভালিজম-এর মধ্য দিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত করে দেওয়া হল। ১৯০৮-এর হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জাতীয় তথা ধর্মীয় সংহতি ত বিপন্ন হয়েছিলই, তার চেয়েও বড় কথা, বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের জাতীয় সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনগুলিও এ থেকে বাদ পড়েনি। মুক্তি আন্দোলনের এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বিদ্রোহী কবি লেখনী চালনা করলেন।

এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন ভারতবর্ষের সমস্ত মনীষী ও নেতৃবৃন্দ বুঝে কিংবা না বুঝে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অনুধ্যান করার চেষ্টা করছেন—উপলব্ধি করলেন শোষক ও শোষিতের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিত। আর তাই ইংরেজের সান্নিধ্যে ও দাক্ষিণ্যে ধনী হয়ে ওঠা নবোদিত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশের সন্তান রবীন্দ্রনাথ দুর্বল জাতির ওপর শোষনের কথা বললেন। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া ওঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।[8]

আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে সংগ্রাম তার মূলে কুঠারাঘাত করছে ইম্‌পিরিয়ালিজম। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিই এইসব মানুষের ঐক্য লোপ করছে আর তার হাত থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে একথা রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন: ঐক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। একাকার হওয়া, এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইমপিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি। গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘ বন্ধনের সমস্ত অনিশ্চয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে।[৫]

আজ ভারতে ধর্মীয় সংকীর্ণতায়, পৃথক রাজ্যের দাবিতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলি সংবেদনশীল বিষয়কে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে এদেশে এক স্থায়ী অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট কিছু বিদেশী শক্তি। এর আগেও আমরা দেখেছি আলিগড, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরীহ জনজীবনের কম ক্ষতি করেনি। সম্প্রতি পৃথক রাজ্যের দাবিতে বেশ কিছু জঙ্গী আন্দোলনে মদত দিচ্ছে। বিক্ষোভ, বিদ্রোহ দানা বাঁধছে মুষ্টিমেয় ঐ শক্তির বিরুদ্ধে। বিদেশী শক্তিকে এ ব্যাপারে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' প্রবন্ধে বললেন: স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোন কারণেই কোনমতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে। বিরুদ্ধে পক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায়

বলব।[৬] রবীন্দ্রনাথ এখানে কশাঘাত করেছেন তীক্ষ্ণভাবে। বিদেশী মদতপুষ্ট দেশীয় শাসক ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে আপন স্বার্থসিদ্ধির অজুহাতে। ১৯৩১ সালে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটি সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রের স্বার্থবুদ্ধি কি দেশকে বাঁচাতে পারে?'

আজ ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতির ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোন রকম আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার এক হীন জঘন্য খোলসের নিচে নিজেদের নগ্ন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না'।[৭]

ধর্মের নাম করে মানব বিরোধী কাজকর্ম, শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণগুলিকে ভুল উপস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত করে কিছু সনাতনপন্থী মানুষ বলছে, প্রকৃত ধর্ম এটাই। তাতে ধর্মের উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথাও মানুষের সামনে গুলিয়ে যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণীর মানুষ যেহেতু দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্ম মেনে চলে, তাই সর্বাপেক্ষা বেশি শোষিত হয়ে থাকে তারাই। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেও ধর্মের কুসংস্কার গুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধে মহম্মদ সম্পর্কে বলেছিলেন: মর্ত্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সেই সময় আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করেন।...একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলস ভাঙ্গিয়া যে নতুন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠেনা। মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে সেখানে দাঁড করাইলেন—তাহারা সেখানেই দাঁড়াইল আর নড়িল না।[৮]

সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মপ্রবণ। পুরনো

ধর্মীয় ধ্যানধরণা, কুপ্রথাগুলিকে আঁকড়ে রাখা ধর্মের নামে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন : 'দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুদের পদে পদে বাধাগ্রস্থ করেছে সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানেরা ঘরে মোল্লার অন্ন যোগাচ্ছে। এ কি মাটির গুণ ? এই রোগে বিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া এদেশে আর কতদিন চলবে ?'

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবনের ট্রাজেডিটা উপলব্ধি করে চড়া সুরে প্রশ্ন রেখেছিলেন : 'যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি, তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা, গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব ? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ ?'

তাই যারা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার মূলে পদাঘাত করে সদম্ভে বলে চলেছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই, তারা শ্রেণীগত স্বার্থেই এদেশে তাদের রাজত্ব ও ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোকে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। এই হল তাদের নীতি। দেশের মানুষ ধর্মের ধ্বজা ধরে যাতে কোনদিন না ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আজকের প্রজন্ম যাতে বড় না হয়ে উঠতে পারে তার নিরন্তর প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে প্রতিদিন মানুষকে ধর্মীয় বিরোধের সামনে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই সবকিছুকে নীতিহীন রাজনীতি ও মেকি দেশপ্রেমের মোড়কে পুরিয়া তৈরি করে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে। আজকের জাতীয় সংহতি তথা ধর্মনিরপেক্ষতার সংকট মোচনেও তাই রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধি ও প্রতীতিবোধ কি ভারতীয়রা অস্বীকার করতে পারে ? ··'আমার দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী এই— ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হতে দিও না, তাহাকে কার্যে পরিণত করো। 'বন্দেমাতরম' যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 'বন্দেমাতরম্'-এর স্থানে 'বন্দেভ্রাতরম্' বলো।'

সূত্র নির্দেশ

১. সমস্যা, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১।

২. সমস্যা, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।
৩. ঐ।
৪. লোকহিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ।
৫. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ।
৬. বাতায়নিকের পত্রে / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ।
৭. সমুদ্রযাত্রা, ঐ।
৮. প্রাচ্য সমাজ। ঐ।

অনুশীলা দাশগুপ্ত

নারীর অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ

'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাই দিবে অধিকার' ?—সারাজীবন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্ন ভাবিয়েছে। এমনই পরিহাস যে, আজও বিশ্বের ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণতন্ত্রপ্রিয়, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে, সংগ্রামী মানুষের কাছে—এ এক বিরাট প্রশ্ন। বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিচিন্তা মানবিকতাবোধ থেকে সঞ্জাত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই শৈল্পিকরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে, কোন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ বা রাজনৈতিক আদর্শবাদীর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

ঠাকুর বাড়ির ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের আঙিনায় বড় হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন পর্দার আড়ালে নারীজীবনের মর্মযাতনা, এখানে উল্লেখনীয় যে, তৎকালীন সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা তুলনামূলকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পেয়েছেন অনেক বেশি, ফলত ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই সবদিক থেকে অগ্রসর ছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ কিশোর কাল থেকেই মেয়েদের যতটুকু শোষণ নিপীড়নের দিকটাকে এবং তাদের পর্দার আড়ালে রাখার প্রবণতাকে লক্ষ্য করেছেন, তাতেই তিনি ব্যথিত হয়েছেন। নারীজীবনের প্রতি অবহেলা তাঁকে পীড়িত করেছে। চার দেয়ালের ভেতরে নারীজীবনের এমন দুঃসহ অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন : নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি / ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি। / অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে, / শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।[১]

রবীন্দ্রনাথ দেশের বা সমাজের এমনকি বিশ্বের সংকটময় অবস্থায় নির্দ্বিধায় কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতাবাদের পূজারী। মানবজাতি যেখানে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত হয়েছে সেখানেই তাঁর কলম বা কণ্ঠ সচেতনতায় উজ্জ্বল

স্বাক্ষর বহন করেছে। মানবজাতি বলতে তো পুরুষ-মহিলা দুই-ই। সমাজের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ হল নারীজাতি। তাই নারীজাতি যদি অবহেলিত, অবজ্ঞাত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়, তবে সামাজিক মুক্তি আসবে কিভাবে? দেশ অগ্রগতির পথেই বা এগোবে কি করে? তাই তাঁর আহ্বান: এসো ছেড়ে, এসো সখী কুসুম শয়ন / বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।[২]

পৃথিবীর মানবজাতির অর্দ্ধেক সংখ্যক হলো নারীজাতি—তাই নারী-জাতিকে অপমান, উৎপীড়ন, সংস্কারে নিমজ্জিত করে রাখলে, পণ্য হিসেবে ব্যবহার করলে, দাসীসম ব্যবহার করলে কি করে দেশের উন্নয়নমূলক চিন্তা, প্রগতির চিন্তা, দাসত্ব মোচনের চিন্তা বাস্তবায়িত হবে? স্বাদেশিকতা তো অলীক কল্পনামাত্র। এ'ধরনের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাস্তব যুক্তিবোধ কোথায়? এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজকাঠামোর বলি 'বারাঙ্গনা'ও কবির সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছে। কবি বারাঙ্গনার জীবন যন্ত্রণার কথা ভেবে ব্যথাতুর হয়ে বললেন: উর্দ্ধপানে চেয়ে দেখি, স্খলিত বসনা / লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই সার সত্যটুকু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন যে, কখনই নারী-জাতিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়। স্বদেশ চিন্তার ক্ষেত্রেও এটা এক প্রকার অসম্ভব ও অসুস্থ চিন্তাভাবনা। তিনি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-তে লিখলেন: 'সমাজের অর্দ্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তাঁর দানের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।' সামাজিক কুসংস্কারের বলি নারীজীবনের পর্দানসীন, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে-বেলা'র মধ্যে তুলে ধরেছেন: আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও।[৪]

দেশের অধিকসংখ্যক মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এবং ঈশ্বরের নামে কুসংস্কারের পাহাড় গড়ে তুলে নারীজাতিকে সেই অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়ে পুরুষ জাতি সমাজে পরিবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সদা সচেষ্ট,

নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহিরের প্রতি সে কি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা! মেয়েদের সামনে অন্ধকারের এক কঠিন প্রাচীর ঘিরে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে ঘরকন্নার কাজ, স্বামী-পুত্রের সেবা-দাসীসম জীবন-যাপন—এই তো তাদের সম্বল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের তো এটাই রীতি। ধর্মান্ধ, ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ ভদ্রতাও আভিজাত্যের খোলসে ঢাকা অথবা একটু নরম হৃদয়বান ব্যক্তিরা মেয়েদের এমন দশার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ হয়তো মেয়েদের 'সতী', 'দেবী'—এভাবে ভাবতে চেষ্টা করেন। বড হাস্যাস্পদ হলো মেয়েদেরকে রক্ত-মাংসের মানুষের মতো অধিকারে, ব্যক্তিত্বে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে নারাজ।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে মেয়েদের দুর্দশাময় অবস্থা থেকে মুক্তির অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনার জগতে তো নারীজাতি স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার মূর্ত প্রতীক, জীবনদায়িনী ও প্রেরণাদায়িনী শক্তি। তাই তাঁর কাব্যজগতে নারী প্রেরণাদায়িনী মানসমূর্তি এবং কাব্যলক্ষ্মীও বটে। রবীন্দ্রনাথ নারীজাতির জন্য তুলে রাখলেন 'শ্রেষ্ঠগান' ও 'সিংহাসন' যার গতিবেগ 'নদীর মতো', তিনি বললেন: তোমার নাহি শীত বসন্ত, জরা কি যৌবন, / সর্ব ঋতু সর্বকালে তোমার সিংহাসন / 'নদীর মতো এসেছিলে গিরিসিখর হতে, নদীর মতো সাগর পানে চল অবাধ স্রোতে।' / 'কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খসে পড়ে- / সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।[৫]

মনে রাখা দরকার সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান। অথচ তিনি সার্থক শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সেই সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বমানবতাবোধ, কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি অনুযায়ীই কতগুলো সীমারেখা টানা আছে। সেই সীমারেখা অতিক্রম করে এই যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নানাদিকে মুখ ফিরিয়েছেন, দৃষ্টিও প্রসারিত রেখেছেন। তথাপি কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব হয়নি, তবে মুক্তির পথ হিসেবে একটা শ্রেষ্ঠ পথ অনুসন্ধান করে বেরিয়েছেন, যখন আর নারীজীবনের যন্ত্রণাকাতর দিকটা আর সহ্য করতে পারেননি তখন এমনভাবে তাকে 'নিষ্কৃতি' দিয়েছেন যা আজকের প্রগতিশীল পাঠক ও সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে।

নারীর জীবন পুরুষের সেবা করার জন্য। পুরুষের সুখের জন্য, আনন্দের

জন্য—সে নারী স্ত্রী-কন্যা-ভগিনী অথবা যে-কেউই হন না কেন। পুরুষ তার আভিজাত্য-কৌলীন্যের গর্বে নিজের কন্যার জীবনটাকেও বিড়ম্বিত করতে পশ্চাদপদ নয়—একি নিষ্ঠুর পিতৃত্ব! পিতা কৌলীন্যের ও অর্থের জোরে বালিকা কন্যা মঞ্জুলিকাকে তার থেকে পাঁচগুণ বয়সে বড় যে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু মায়ের মন উতলা হয়ে ওঠে: 'মা কেঁদে কয় মঞ্জুলি মোর। / ঐ তো কচি মেয়ে। / তারই সঙ্গে বিয়ে দেবে। / বয়সে পাঁচগুণো সে বড়।' মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, পিতার সেবা-যত্ন, পিতার ঘর সামলানো, মায়ের মত রান্না করে বাবাকে খাওয়ানো—এটাই যেন তার জীবন—ঘরের চার দেয়ালে চাপা দুঃখের ভার নিয়ে যখন মঞ্জুলিকা দিনাতিপাত করছে, পিতা তখন প্রস্তুত হচ্ছেন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তখন সামাজিক-পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে মঞ্জুলিকাকে পুলিনের সঙ্গে ফরাক্কাবাদ পাঠিয়ে নিষ্কৃতি দিলেন: 'পুলিন তাকে বিয়ে করে / গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে।'

কিন্তু নিষ্কৃতি পায়নি মঞ্জুলিকার মত—তেমন মেয়ের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, যুগ যুগ ধরে কত লক্ষ লক্ষ মেয়েব জীবন বদ্ধ ঘরের চাকায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীরবে চিরতরে চলে গেছে, রয়ে গেছে শুধু দীর্ঘশ্বাস জল-বায়ুর সঙ্গে মিশে। এরকম একটি নির্মম নিষ্ঠুর সমাজ কাঠামোতে অবস্থান করে বিশ্বকবির পক্ষে দায়িত্বের সঙ্গে মঞ্জুলিকাকে জীবন মুক্তির আস্বাদ দিতে পারা অবশ্যই তাঁর সাহসিক পদক্ষেপ। 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'মায়ের সম্মান', 'কালোমেয়ে', 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতি কবিতাতে ফুটে উঠেছে নারীর অসহায় জীবনের অন্তর্বেদনা, কালোমেয়ে নন্দরানী 'ঐখানেতে বসে থাকে একা / শুকনো নদীর ঘাটে যেন / বিনা কাজে নৌকেখানি ঠেকা'। এই নিষ্ঠুর সমাসব্যবস্থার বলি অজস্র কালোমেয়ের অন্তর্বেদনা যেন কবির ও হৃদয় বেদনা, তাঁর লেখনী এমন নির্মম সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

২

বাঙালীসমাজে বৈধব্য জীবন মেয়েদের জীবনে এক ভয়ানক অভিশাপ। কত সহস্র বালিকাকে কৌলীন্য, বিত্ত এবং 'আইবুড়ো' নাম ঘোচাবার দায় থেকে মুক্তির জন্য পিতা-মাতা হয়তো বৃদ্ধ পাত্রের হাতেই কন্যাদান করলেন।

বিবাহিত জীবনের অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো স্বামীটিকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হল। বালিকাটির জীবন থেকে যৌবন, বসন্ত অকালেই বিদায় নিল: 'যে ফুল না ফুটিতে / ঝরিছে ধরনীতে / যে নদী মরুপথে হারালো ধারা'—এই তো হলো মেয়েটির জীবন। বালিকা বিধবাকে আমরণ দুঃখের জীবন নিয়ে কালাতিপাত করতে হল সকলের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্রী হয়ে। 'ঘাটের কথা' গল্পে সন্ন্যাসীর স্ত্রী কুসুমের বঞ্চিত শোষিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র গল্পটির মধ্যে। বিধবা কুসুম তার জীবনের মুক্তি খুঁজে পেল আত্মবিসর্জনের মধ্যে। চতুষ্পার্শ্বের কোথাও তার অধিকার খুঁজে পেলনা, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মুক্তির স্বাধীনতা লাভ করল। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের স্নেহের কাঙালিনী কাদম্বিনী খুঁজে বেড়াল সারাজীবন ধরে একটু অপত্য স্নেহের মর্যাদা, কিন্তু তার অন্তরের ব্যথা বোঝার মত বিশ্বে যেন কেউ নেই, কোথাও তার মর্যাদা নেই, তাকে 'মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে মরে নাই।' সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব পরিবার বা সমাজ কারুরই ছিলনা। প্রায় সব মেয়েই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, বোঝানো হতো 'লেখাপড়া ছেলেদের জন্য'। প্রচলিত কথা হল বুদ্ধিও ছেলেদেরই বেশি। মেয়েরা লেখাপড়া করলে সংসারের অমঙ্গল হয়। মেয়েরা অকালে বিধবা হয়। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করলেন, বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহ বন্ধ ও বিধবা বিবাহের পক্ষে সংগ্রাম করলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টি প্রাচুর্যের মধ্যে তুলে ধরলেন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মেয়েরা কতভাবে নিপীড়িত হয়, তার অন্তর্জ্বালাকে, অন্তর্বেদনাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন আন্তরিকভাবে। তাই নানাভাবে নারীজাতিকে মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দেয়ার জন্য তাঁর আন্তরিক আকূতি।

'খাতা' গল্পের বালিকা উমার লেখা-পড়ার একান্ত আগ্রহকে তার নিষ্ঠুর স্বামীটি ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিল, লেখা-পড়া শেখার আগ্রহ তার শুধু ব্যাথার কাঁটা হয়েই বিঁধে থাকল, সমাজ বা স্বামী কারুরই মূল্য দেবার দায় নেই। 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার অকালে পৃথিবী থেকে সরে যাওয়ার মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা ব্যক্তিত্বের স্ফূরণও তেমন স্পষ্ট নয়, এ যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে চিরশান্তির একান্ত কামনা। পণের বলি নিরুপমার সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সামাজিক প্রস্তুতি নেই, দুঃখ-যন্ত্রণার এবং

অপমানের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই সচেষ্ট। 'ত্যাগ' গল্পে কুসুম যখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে তখনই সমাজ তাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে। হেমন্তের পায়ে পড়ে সে নিষ্কৃতি চেয়েছে। বৈধব্য এবং কৌলীন্যের অভাবে তাঁকে যে অপমানের বোঝা বইতে হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব তাকে সেইখান থেকে মুক্তি দেয়নি। অনুকম্পার পাত্রী হিসেবে উদ্ধার করেছে, কিন্তু লেখকের সহানুভূতি যে কুসুমের দিকেই এবং এমন পরিণতিতে তিনি যে ব্যথিত তাও স্পষ্ট।

'কঙ্কাল' গল্পে কল্যাণীর প্রেমই কল্যাণীকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে বাধ্য করল। যদিও তার বাঁচবার আকাঙ্খা কিন্তু এই সমাজ বা তার প্রেমিক কেউ তাকে বাঁচবার অধিকার দেবেনা, তাই সে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিল। এই অধিকার-বঞ্চিত নারীসমাজ রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে গভীরভাবে—এখানেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য। এই সময়সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নারীর সংসার সমাজের যাঁতাকলে গুমরে গুমরে মরেছে, পরে মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজেছে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত নারীর রূপ হল,: 'একদিন / ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে / অন্ধকার কোণ থেকে / বেরিয়ে এল ঘোমটা খসা নারী ॥'

এই ঘোমটা খসে পড়া নারী আপন ব্যক্তিত্বে মাথা তুলে দাঁড়াল। অচলায়তন সমাজের হাতের পুতুল শুধু সে নয়—এই বোধ জাগরিত হল। এই যুগ বলাকা-পলাতকা-সবুজ-পত্রের যুগ। এরপর রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার দ্বিতীয়পর্ব শুরু। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারী যেন আস্তে আস্তে ঘোমটা সরাতে চেষ্টা করছে। কখনও সফল কখনও বিফল—এমনি এক অবস্থা, তবে আত্মপ্রকাশের প্রতি একান্ত আকুতি, সেটা লক্ষ্য করা যায়। সংসার সমাজ সংস্কার-এর কঠিন বেড়া টপকাতে গিয়ে হয়তো তখন হোচট খাচ্ছে পদে পদে। এগোবার মতো সঠিক নিশানা তারা পায়নি।

দ্বিতীয় পর্বের ছোট গল্পে নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জীবন জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হল। 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালার প্রতিবাদী ভূমিকা ও সচেতনতা উল্লেখযোগ্য। তার প্রতিবাদ জানাবার মতো পথও গোপীনাথের কাছে রুদ্ধ। 'নষ্টনীড়'-এ একদিকে রয়েছে চারুর অমলের প্রতি মানসিক দুর্বলতা এবং তাকে ধরে রাখতে না পারার যন্ত্রণা, অপরদিকে রয়েছে ভূপতিকে প্রবঞ্চনা করার যন্ত্রণা—এই দুটি যন্ত্রণায় চারুর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত ও সংশয়াকুল।

তৃতীয়পর্বে সেই সংশয় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছে। 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের গৃহত্যাগের মধ্যে যে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তা নারীজাতির অবমাননার বিরুদ্ধে, অসহায় বিন্দুকে পাগল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কর্তব্য সম্পন্ন হল, মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলা হল। মৃণাল হৃদয়ঙ্গম করল অসহায় বিন্দুর অবস্থা। তারপর মৃণাল বিদ্রোহিনী হয়ে সংসার ত্যাগ করল। পারিবারিক আভিজাত্যের বেড়াভেঙ্গে মেজ বৌ মৃণাল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানাবার জন্যই তার এই গৃহত্যাগ। মৃণাল ক্ষোভের সঙ্গে বলল : সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।.... ৭

'অপরিচিতা'র কল্যাণী শুধু তেজস্বিনী নয়, তার আত্মমর্যাদায় বিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই ঘটনার বাঁধুনিকে মজবুত করেছে। 'পয়লানম্বর' গল্পের অনিলা 'পূজা' বা 'প্রয়োজন' 'দেবী' বা 'দাসী হিসেবে বাধা পড়তে চায়নি, সে চেয়েছিল রক্ত-মাংসের এমন একটি মানুষকে যে ভাল-মন্দে, প্রেমে-ভালবাসায় মিশ্রিত, যেখানে অনিলা পেতে পারে মনুষ্যত্বের মর্যাদা কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল অদ্বৈত বা সীতাংশু কারুর কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে একাই পথে বেরুল পথ চিনে নেবার জন্য।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের মোহিনী আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এক কর্মী যাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। মোহিনীর বিশ্বাস মনুষ্যত্বে, সতীত্বে নয়। নন্দকিশোর বলেছে : দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর ঝক্‌মক্‌ করছে কেরেকটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম......ও নিজে জানে।৮

৩

ষোলবছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'করুণা' উপন্যাস, 'করুণার' কাহিনী হল ঠাকুর বাড়ির আভিজাত্যে-ঘেরা পর্দার আড়ালে মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার দিক, জীবনজিজ্ঞাসাই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে উপন্যাস রচনায় আগ্রহী করে তুলেছে, শ্রেণীবিভক্ত পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা তো মূলত পরাধীন। বৈধব্য বা বাল্যবিবাহজনিত লাঞ্ছনার জীবন তো পরের কথা। মেয়েদের যদি নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ পরিবার বা সমাজ যদি দাঁড়াবার মত

রসদ না দেয়, বৈধব্য বা বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা তো অনিবার্য ঘটনা।

'ঘরে বাইরে'র বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ ঘর থেকে বাইরে টেনে আনলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় তাকে গড়ে তুলতে চাইলেন। নিখিলেশ তাকে বাইরের আলো, শিক্ষার আলো, সচেতনতার আলোর আস্বাদ দিতে হাতধরে বাইরে নিয়ে এলো, কিন্তু সন্দীপের স্বাদেশিকতার নামে এক প্রকার উন্মত্ততার সংস্পর্শে এসে পরপুরুষের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বিমলা নারীত্বের মাধুর্য থেকে ভ্রষ্ট হল তাই নয়, চার দেয়ালের বাইরে বেরুতে পারার সুযোগ বা অধিকারের অপব্যবহার ঘটল—এ যেন খাঁচার পাখির মুক্ত হয়ে দিকবিভ্রম। বিমলার দিকবিভ্রম ঘটতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা যে প্রগতিশীল এবং মেয়েদের শিক্ষিতকরার ক্ষেত্রে তার যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ এলাকে দেশের কাজে টেনে এনেছে এই মর্মে ও এই সর্তে যে, সে কখনও সংসারে আবদ্ধ হবেনা, তার আত্মদান সমাজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণাদায়িনীশক্তি কিন্তু অতীনের সংস্পর্শে এলার চিন্তায় ভাঙন ধরল, সে অতীনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাইল, অথচ সেখানেও সার্থক হতে পারলনা। এলা দেশমাতৃকা ও অতীনের টানা-পোড়েনে দিশেহারা, অতীন অভিযোগ করে বলে : মাধুর্যের দানে নারী-শক্তির সীমা নেই। এইখানে নারীর প্রকৃত অধিকারের তাৎপর্য।[৯] ক্ষোভের সঙ্গে অতীন তাই এলাকে বলে : আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে, তাহলে আমাকে দলে তোমর টানতে না, বুকে টানতে।[১০] এখানে লক্ষনীয় যে, নারী যখনই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তখনই বাধা এসেছে পুরুষের কাছ থেকে। নারীর অধিকার এখানে মাধুর্য প্রকাশে, আপন ব্যক্তিত্বের ভালোলাগার প্রশ্নে নয়।

জীবনের শেষার্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাস লিখলেন। সেখানে মধুসূদন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধনী নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক একটি চরিত্র যে কুমুদিনীর মত শান্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলার কাছে মধুসূদন অপমানিত হয়েছে। কুমুর শিক্ষা হল 'প্রাণের চেয়ে মান বড়'। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী বিধবা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্মনিপুণা কিন্তু তার ব্যক্তিত্ববোধ কত প্রবল! তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায় তাহার চোখে যেন

স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। বিনোদিনী মনে মনে হাসে আর বলে—কোনো নারীর কি আমার মতো দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' দুটি দ্বন্দ্বে বিনোদিনী চরিত্র ক্ষত বিক্ষত। আর এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গে'র দামিনীর বিবাহিত জীবনে দামিনী এক বিদ্রোহিনী নারীসত্বা; কোন প্রকার সংস্কার দামিনীকে গ্রাস করেনি। এ' প্রসঙ্গে বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন: 'Drama is a much greater a rebel than Binodini.' 'The difference between Binodini and Damini measures the degree of Liberalism and Universalism to which Rabindranath moved between 1901 and 1915.'[১১]

আর 'যোগাযোগে'র কুমুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত, শোষিত নারীজাতির জন্য রয়েছে মর্মযাতনা। বিদ্রোহিনী কুমু বিপ্রদাসকে বললো: 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।'

'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যর প্রতিটি পদক্ষেপের চিন্তাভাবনাই যুক্তিনির্ভর। যখনই তার কোনো সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তখনই তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। আর সেই অভিব্যক্তির মধে ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে লাবণ্য তার বাস্তব বুদ্ধিতে বুঝেছে: জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসব সভা সাজাবর হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।[১২] উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তার ফসল হল 'নৌকাডুবি'র হেমনলিনী, 'গোরা'র সুচরিতা, 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী ও 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও 'শেষকথা'র অচিরা।

৪

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'গান্ধারী'র আবেদনে রবীন্দ্রনাথ গান্ধারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন, সাম্রাজ্যলোভী পুত্র দুর্যোধন ক্রোধে অন্ধ হয়ে দ্রৌপদীর প্রতি অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে গান্ধারী স্নেহান্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অনুরোধ

জানালেন দুর্যোধনকে ত্যাজ্যপুত্র করবার জন্য। গান্ধারী বললেন: 'যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ / সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ। / পদাহত সতীত্বের ঘোচাও ক্রন্দন'।[১৩] সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারীতো ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী নয়, কাজেই গান্ধারীর অনুনয়-অনুরোধের মধ্যে, ক্ষোভের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত কিন্তু কাকুতি মিনতি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দ্রৌপদীকে, আলিঙ্গনপূর্বক বললেন, যে নারী জাতির অপমান ঘটাবে সে নিজেই কলঙ্কিত হয়ে অক্ষয় হয়ে থাকবে এই ধরাতলে। গান্ধারীর আদর্শবোধ, ঔচিত্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, মাতৃত্বের স্নেহান্ধতা নেই, তাই তিনি দ্রৌপদীকে বললেন: 'যে তোমারে অবমানে তারি অপমান / জগতে রহিবে নিত্য-কলঙ্ক অক্ষয়'।[১৪]

৫

মালিনী নাটকের মালিনীকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের আহ্বানে ঘরের বাইরে এনেছেন। রাজকন্যা মালিনী ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপনজনের স্নেহডোর পরিত্যাগ করে ও উপেক্ষা করে বিশ্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহিণী হয়ে বেরিয়ে আসে, মালিনীর আন্তরিক আকুতি, 'জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে', অথবা, 'সর্বলোকে / যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে / বাহির-সংসার।'[১৫]

যদিও মালিনীকেও পরে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে হয়েছে, তখন পিতার (রাজা) উচ্ছ্বসিত উক্তি: 'দেবী নারে, দয়া নারে, / ঘরের সে মেয়ে'।[১৬] বিসর্জন নাটকে স্নেহময়ী অপর্ণার প্রেমই জয়লাভ করল, একটি ছাগল ছানাকে আশ্রয় করে অপর্ণার যে স্নেহ-ভালবাসা গড়ে উঠেছিল, তারই প্রেমময় রূপ প্রকাশিত হল অসহায় জয়সিংহের প্রতি তার আন্তরিক টানে। তার প্রতি-পালিত স্নেহের ধন ছাগল ছানাটিকে যখন দেবীর কাছে বলি দেয়া হল; তখন অপর্ণার আকুল ক্রন্দন রাজার মনকেও ব্যথাতুর করে তুললো,—তিনি আদেশ করলেন,—জীববলি বন্ধ করতে হবে, কিন্তু জীববলি বন্ধের খেসারত দিল জয়সিংহ তাঁর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে—সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের এই তো পরিণতি! রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন: 'যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা

তাকেই প্রকাশ করেছে। বাইরের থেকে তাকে দুর্বল মনে হয়, কার্যত তারই জয় হল।' এই জয় অপর্ণার স্নেহ-ভালবাসার জয়,—অধিকার প্রতিষ্ঠার জয় নয়।

শ্যামা নাটকে দেখা গেল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন প্রশাসন যন্ত্র, নিরপরাধীর শাস্তির কথা ভেবে উতলা হয়েছেন। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে তো দেশের মানুষ অসহায়, সেখানে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' এই নাটকে মেয়েদের মুখেই সেই প্রতিবাদধ্বনিত হল। সখীরা গান ধরল : 'সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে। / নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে। / আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা, / অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা'।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী চরিত্র এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

৬

জীবনের অন্তিমপর্বে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী চরিত্র আস্তে আস্তে পা শক্ত করে মাটি আঁকড়ে ধরে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে। শৃঙ্খলমোচনের প্রতি মানসিকতা গড়ে উঠতে লাগলো, নারী উপলব্ধি করল তার অস্তিত্বের মূল্য প্রধানত মনুষ্যত্বে, শুধুমাত্র নারীত্বে বা সতীত্বে নয়, জাগরিত হতে চাইল অধিকারের প্রশ্নে : 'শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে / সার্থকের পথ'?[১৮]

নারীর একান্ত প্রার্থনা : 'উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে / জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে / কণ্ঠ হতে / নির্ধারিত স্রোতে।' [১৯]

রবীন্দ্রনাথ নারীর অধিকার বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারী বিকশিত হয়ে উঠবে তার মাধুর্যের গুণে, নারীর অপরিমেয় শক্তির গুণে। নারীর জগৎ শোষণ-বঞ্চনার জগৎ নয়, নারীর পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই পুরুষেরও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারও পূর্ণতা ঘটে। নারীর অধিকার পৌরুষে নয়, উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, তার অধিকার মনুষ্যত্বের সুন্দর বিকাশের মধ্যে, প্রেরণাদায়িনী শক্তিরূপে, তিনি তাঁর 'স্বদেশ ও সমাজ' গ্রন্থের 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন : 'গণনায়

মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।'[২০] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'নারীর স্বাধিকার তার স্বধর্মের মধ্যে, মাতৃত্বের মধ্যে, বিশ্বমাতৃত্ববোধের মধ্যেই নারীর পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য'। কারণ 'মানুষের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা।'[২১] কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থা তাকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি। বিশ্বকবির দৃষ্টিতে 'নারী সে যে মহেন্দ্রের দান' অথবা 'মহীয়সী'। অথচ নারী পেলনা ধরাতলের মানুষ হয়ে এগিয়ে যাবার পথ। পুরুষের সমান অধিকারে ও মর্যাদায় পা ফেলে চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হল না—অধিকার সেখানে পথ আটকে দাঁড়াল। কবির একান্ত আকুতি হল, নারীজাতিকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য। কিন্তু অধিকারে অধিকারী হবার সুযোগ নেই—এটাই তো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের স্বরূপ। এমনকি যে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে 'দেবী' বা 'সামান্যা রমণী' বলে নিজেকে ভাবতে পারছেনা সেও অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলছে: 'যদি সুখে-দুঃখে মোরে কর সহচরী / আমার পাইবে তবে পরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতেন যে, যেহেতু এদেশের মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, ফলে বহির্বিশ্ব তার কাছে অন্ধকার পৃথিবী। পরমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া তারা মনে করে তাদের অস্তিত্বই মূল্যহীন। আপন অস্তিত্বকে মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন সুযোগ বা পরিবেশ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তারা সংস্কারে আবদ্ধ। তাছাড়া 'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধনমানা প্রবণতা আছে ……।' তিনি লিখলেন: 'তার বুদ্ধি তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়নি'।[২২]

তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, অনেক অসুবিধে আছে। পদে পদে হয়তো হোঁচটও খেতে হবে। তথাপি মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, দেশের উন্নতির কথা ভেবেও এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য একটু একটু করেও সংস্কারের পাহাড়কে দূরে সরিয়ে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে হবে, মনুষ্যত্ববোধে, চিন্তা-চেতনায় মেয়েদের এগিয়ে যেতে হবে এবং তার সুযোগও করে দিতে হবে দেশের সচেতন

মানুষদের। তাঁর অভিমত হল: 'মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে, বিচার করতে আরম্ভ করে। তাঁর পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে।'

'এই অভ্যাস পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় করে আধুনিককালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।'[২৩]

বহির্বিশ্ব ঘুরে এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া পরিভ্রমণ করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মেয়েদের অন্দরে আবদ্ধ রেখে, সামাজিক সংস্কার দ্বারা চাপা দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ কিছুতেই প্রশস্ত হতে পারে না। সেই রাষ্ট্রকাঠামোতে মূলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমানাধিকার, মেয়েরা স্বীকৃতি পেয়েছে সম্মানের সঙ্গে। আর আমাদের দেশের মেয়েদের প্রতি ছিল তাঁর আবেদন: 'তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী।'[২৪]

৭

রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ কাঠামোতে অবস্থান করে নারীর অন্তর্বেদনায় আকুল হয়েছেন, তা সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে নয়। মানবিক কারণেই তিনি দুঃখিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত নারীর অন্তর্বেদনাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। লক্ষণীয় যে, মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে যখন রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন তখন আমূল পরিবর্তিত সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখে অভিভূত হলেন, বিস্মিত হলেন। মেয়েদের সমান মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেখে শুধু মুগ্ধ হলেন তাই নয়, ব্যথিতও হলেন স্বদেশের নিপীড়িত অবহেলিত মেয়েদের বিড়ম্বিত জীবনের কথা ভেবে। রাশিয়ার চিঠিতে লিখলেন: 'আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে'।[২৫] নারী-পুরুষ সকল মানুষের প্রতি সমান মনোযোগ—এটা কবির মনে নাড়া দিয়েছে গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত।

ভারতীয় মেয়েদের জীবনে বঞ্চনার পাহাড় দেখে রবীন্দ্রনাথ উতলা হতেন। মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সকলের দৃষ্টিকে আড়াল করে যদি কোন মেয়ে নিজ বুদ্ধিবলে, নিজের শ্রমে, নিষ্ঠায়, সাধনায় বিদ্যার্জন করে বা ভাল কিছু করতে পারে তাও সকলের আড়ালেই থেকে যায়। তার যোগ্যতা তো কোন মর্যাদা পায় না। কারণ প্রকৃত সমজদারের যে বড় অভাব। কবি যেন নিরুপায় হয়েই এমনি একটা সাধারণ মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে মুক্তি দিতে চাইলেন, মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করলেন: 'মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে। / সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর, / যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা, / দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে। / জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে— / শুধু বিদেশী ব'লে নয়, নারী বলে ; / ওর মধ্যে যে বিশ্বজয়ী জাদু আছে / ধরা পড়ুক তার রহস্য—মূঢ়ের দেশে নয়— / যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি, / আছে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী। / মালতীর সম্মানের জন্যে সভা ডাকা হোক—না— / বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।'[১৬]

৮

মনে রাখা দরকার, সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের মূল ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী পরিবার—জমির ওপরেই সকলে নির্ভরশীল। গোটা পরিবারের যিনি প্রধান তিনিই পরিচালক—তিনি পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা-স্বামী। স্বাধীন চিন্তা বা মত প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না। আর মেয়েদের তো মত প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না এই শ্রেণীবিভক্ত পুরুষ শাসিত সমাজে। স্বভাবতই মেয়েরা নিষ্পেষিত অনেক বেশি। নিষ্পেষণের মূলে তো রয়েছে শ্রেণীবৈষম্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা, মেয়েদের অর্থ নৈতিক পরাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যতটা ভেদাভেদের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ততটা পরিমাণে অর্থ নৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রতি তেমন কোন আলোকপাত নেই।

জমিনির্ভর রাষ্ট্রকাঠামোতে কোন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে সেই অর্থে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার কোন সুযোগও নেই। স্মরণে রাখা দরকার তাঁর অভিমত বিশ্বমানবিকতাবোধ থেকে সঞ্জাত, সার্থক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই তার যাবতীয় সৃষ্টিভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে।

কোন রাজনীতিবিদের ভূমিকায় তিনি নেই। রাষ্ট্রনৈতিক কোন স্পষ্ট মতামতও তাঁর পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের মাটিতে নারীর মর্যাদা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা কেউ করেছেন কী না জানিনা। অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ধাপে ধাপে প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়েছে। তাই নারীমুক্তির প্রশ্নে, নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে ভারতীয় নারীসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয় শুধু নয়, এগিয়ে যাবার পক্ষে সহায়ক শক্তিও বটে।

সহায়ক রচনাসমূহ

১. বধূ, মানসী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫।

২. কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩. করুণা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪ চৈত্র, ১৩০২।

৪. ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ।

৫. কল্যাণী, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

৬. নিষ্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭. স্ত্রীরপত্র, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮. ল্যাবরেটরি, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯. চার অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. ঐ

১১. Heroines of Tagore by Biman Behari Mazumdar, P. 245

১২. শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩. গান্ধারীর আবেদন, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪. ঐ, মাঘ ১৩০৪।

১৫. মালিনী, রবীন্দ্রনাথের নাটক, রবীন্দ্ররচনাবলী।

১৬. ঐ

১৭. শ্যামা নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখীদের গান।

১৮. সবলা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯. সবলা, মহুয়া কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ০ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২০. নারীর মনুষ্যত্ব, স্বদেশ ও সমাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১. ঐ

২২. নারী, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৪।

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৬. সাধারণ মেয়ে, পুনশ্চ, ২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯।

প্রথমা রায়মণ্ডল

পণপ্রথা ও পণপ্রথা-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

১

ভারতীয় উপমহাদেশের নারীসমাজ পণপ্রথার মত একটি বিষাক্ত সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে দীর্ঘকাল থেকে। এবং ক্রমে ক্রমে এর ভয়াবহতা ব্যাপকহারে বেড়ে পণের দায়ে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে বলি হতে হচ্ছে অসহায় নিরীহ মেয়েদের। গণতান্ত্রিক দেশে এই অগণতান্ত্রিক ব্যাধি নির্মূল করার জন্য আইন তৈরি করতে হচ্ছে সকলকে। রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি একে 'লজ্জাজনক এবং অপমানজনক' প্রথা বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে তিনি সোচ্চার হয়েছেন: 'পণপ্রথার ন্যায় লজ্জাজনক ও অপমানজনক প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সহিত নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দর দাম করিতে থাকা, এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই'।

তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দরদাম করার মত ব্যবসায়িক মানসিকতাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন। আমাদের দেশে সরকারী আইন পণপ্রথাকে বন্ধ করতে পারছে না বলেই এত বধূহত্যা, নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান দিন দিন বাড়ছে। পণপ্রথা-বিরোধী রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ বর্ণনার আগে পণপ্রথার মত সামাজিক ব্যাধি নিয়ে উপক্রমণিকা হিসেবে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

বরপণ দেবার সূত্রপাতটি সেই মধ্যযুগে যখন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন কে জানতো, সেই হাসতে হাসতে বরপণের খেলা একদিন জীবন খেলার মারণযন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। মহাভারতের শল্য-পর্বে বৃদ্ধা রূপহীনা কন্যা সুভ্রূর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, সমর্থবান পিতা একদিন তাঁর কুরূপা

মেয়েকে নির্ভরযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দেবার জন্য, বরং বলা যায় কিছুটা পাত্রের সন্তুষ্টিকরণ-ভেটের মতই একসময় কিছু অর্থ সম্পদ বা শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন বর-এর হাতে। সেই অনায়াসে তুলে দেয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পদই কালের বিবর্তনে সামাজিক প্রথায় রূপ পেল; ভয়াবহ আকারে ডালপালা বিস্তার করে মেয়ের বাবার সামর্থ্যকে পাওনাদারের রোলার দণ্ডে রূপান্তরিত হলো। সুস্থ সমাজ জীবনে যা সারাক্ষণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মনে অশুভ করাল ছায়ার ন্যায় আগ্রাসী হাতের স্পর্শ লাগার মতই আতংকের সৃষ্টি করছে। দিন দিন আমরা কৃত্রিম সভ্য হচ্ছি, প্রগতির রথে এগিয়ে যাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে ভারতের আসন শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত হোক এই কামনা করছি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছি, মানবিক তথা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলছি এবং ঢাক ঢোল পিটিয়ে নারী-উন্নয়ন দশক পালন করেছি। অথচ ভেতরে ভেতরে বংশপরম্পরায় রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা পণপ্রথাকে মনের অজান্তেই, উর্বরতা দেবার জন্য লালন করছি; পণ নেবার ব্যাপারে ঔদার্য দেখাচ্ছি। সেই মুহূর্তে একবারও ভাবছি না এই অবচেতন মনের সযত্নলালিত পণপ্রথার উর্বর শক্তিশালী আঘাতে একদিন আমিও চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারি। একবারও সচেতন মন নিয়ে ভাবছি না যে, এটি একটি অবচেতন প্রতিশোধস্পৃহাজাত বিষাক্ত সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি মানুষের মনুষ্যত্বকে হেয় করে—স্ত্রী সহধর্মিনী, সহকর্মিনী, সহমর্মিনী না হয়ে, হয়ে যায় দাসী, পরিচারিকা কিংবা বাজার থেকে কিনে আনা পণ্যবস্তু। সেই স্ত্রী স্বামীর কথায় কাঁদে, হাসে, স্বামীর মনমতো 'সোসাইটিতে' মেশে এবং সভ্যতার চাপে অতি সুখী দম্পতির সুনিপুণ অভিনয়ও করে। কিন্তু পণের চাপে বাবাকে নিঃস্ব করে আসা মেয়ের মনের গভীরে যে ক্ষত দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে, সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তব্যপরায়ণ স্বামী কোনদিনই রাখেন না কিংবা স্ত্রীর মনের নাগাল কোনদিনই পান না। নিজের মা-বাবা ভাই-বোন, পরিচিত আত্মীয়স্বজন ছেড়ে স্বামীর আপনজনকে নিজের বলে মেনে নিতে হয়। শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যোগ দিয়ে নিজের অনিচ্ছাকেও ইচ্ছায় পরিণত করতে হয়। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই কিংবা নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেই দেখা দেবে সংঘাত—তার চরিত্রে লেপে দেয়া হবে কলংকের তিলক এবং পরিণাম হয়তো হবে আরো ভয়ংকর। আর যারা নীরবে আঘাত হজম করেন, তাদের মনের ভেতরে যন্ত্রণা

হয় আরো গভীর। এই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সব দিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়েই অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে পারিবারিক সুখের রশিটি টেনে রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মেয়েদেরকে বিশেষণ নিতে হয় ছলনাময়ী বলে, শুনতে হয় 'নারীর মন দেবতারও অগোচর।'

একটি মেয়েকে জন্ম নেবার পর থেকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তোমার স্থান ভাইয়ের পরে, আগে নয়। আর একটু বড় হলে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় সে মেয়ে, এ ঘর তার নয়। তাকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে পরকে আপন করার; স্বামীর ঘরই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। তাই বাবার ঘর থেকে তার স্থান হয় শ্বশুরের কিংবা স্বামীর ঘরে। হায়রে ভারতের দুর্ভাগা নারী! নিজের ঘর আর তার হয় না কখনো। তাই ব্যক্তিইচ্ছার মৃত্যু ঘটাতে না পারলে সমাজে কোন নারী হয় ভয়ংকরী, কেউ ছলনাময়ী, কেউবা আবার কলহপরায়না। আর যে নারী ইচ্ছার সম্পূর্ণ অপমৃত্যু না ঘটিয়ে সংসারে শান্তি চায়, তাকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হয়তো একদিন ঢলে পড়তে হয় মৃত্যুর কোলে। এই দৃষ্টান্ত অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলেছে আজো। আসলে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে সম্পদ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এ এক বিচিত্র প্রক্রিয়া। যুগ যুগ ধরে শোষনের এই কূট-কৌশল সমাজে শিকড় গেড়ে বসে আছে।

২

পনপ্রথাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠা নারীর যন্ত্রণাকে রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খণ্ডে লেখা 'দেনাপাওনা' গল্পটির মধ্য দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার বরং বলা ভাল পণদায়গ্রস্ত দেনাদার পিতা এবং সেই দেনার দায়ে বিবাহিতা কন্যার জীবনের ভয়ংকর পরিনতিকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে পণের কবলে পতিতা কন্যার মর্মবেদনার সার্থক ভাষাচিত্র এ গল্পে নির্মান করেছেন।

'দেনাপাওনা' নামকরণের মধ্য দিয়েই পণপ্রথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। গল্পটি এরকম: মেয়ের বাবা রামসুন্দর একজন সাধারণ মানুষ। পাঁচ ছেলের পর একটি মেয়ের জন্ম হল তাঁর। বড় আদরের সে মেয়ে, নাম নিরুপমা। যথাসময় মেয়ের বিয়ের

জন্য ব্যস্ত হলেন বাপ। তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য তিনি যে পাত্র খুঁজে আনলেন, সে ক্ষয়িষ্ণু রায়বাহাদুরের পুত্র, যার বাজারদর নিরুপমার বাবার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মিলিয়েও নাগাল পাবার মত নয়। অর্থাৎ পাত্র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। তবু দরিদ্র পিতা তাঁর একমাত্র মেয়েকে সুখী দেখার জন্য অর্থাৎ আর্থিক ক্লেশমুক্ত ঐশ্বর্যময়ী রূপে দেখার জন্য একটি নামী দামী ঘরে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। ঐ বর কিনতে হলে দশ হাজার টাকা লাগবে এবং বহু দান সামগ্রী। কিন্তু 'কিছুতেই টাকার যোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া অনেক চেষ্টাতেও ছয় সাত হাজার বাকি রহিল।'[১] এ অবস্থায় বরের পিতা রায়বাহাদুর মহাশয়, তাঁর পক্ষে যা-ই বলা স্বাভাবিক তাই বললেন: 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না'।[২] এই দৃষ্টান্ত আজো চোখে পড়ে। এখনও পনের টাকা হাতে না পেলে বরকে বিয়ের পিড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

শুধুমাত্র তাই সংকটপন্ন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বরকে অতিমাত্রায় প্রতিবাদী করে তুলেছেন। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাপ্তির ব্যাপারে এযুগের বরেরাও এ ধরণের কথা বলে না, বরং বাবার বাধ্য ছেলে সেজে বিয়ের পিড়ি ছেড়ে উঠে যায়। নিরুপমার বর তার রায়বাহাদুর বাবাকে বলে বসলো: 'কেনা বেচা দর-দামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইবো'।[৩] অতএব রায়বাহাদুরের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর ছেলের সংগে নিরুপমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হলো বটে কিন্তু দেনা-পাওনার সম্পর্কটি ঘুচে গেল না। একমাত্র আদরের নিরুপমা; রামসুন্দর মেয়েকে না দেখে থাকতে পারেন না। মেয়েকে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে দেখতে যায় বটে 'কিন্তু বেয়াই বাড়িতে তার কোন প্রতিপত্তি নাই, চাকরগুলো পর্যন্ত তাহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনদিন বা দেখিতে পান না'।[৪] এতো গেল মেয়ের বাপের অবস্থা। মেয়ের অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। উঠতে বসতে নিরুকে টাকার জন্য খোঁটা খেতে হয়, বিনাদোষে কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হয়। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত নিরুপমা, বাপের অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছে। কিন্তু নিরুপায় রামসুন্দর নিষ্ফল যন্ত্রণায় মাথা কুটেছেন: 'নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার

আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।[৫] সেই বাবা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাবে কোন সাহসে, কোন যোগ্যতায় ?

মেয়েকে বাপের বাড়ি আনার জন্য, গঞ্জনার হাত থেকে একটু রেহাই দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত রামসুন্দর বহু অপমান, বহু ক্ষতি স্বীকার করে, বহু কষ্টে তিন হাজার টাকা যোগার করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মেয়েকে সুখে রাখার যে কল্পিত আকাংক্ষা পিতার মনে দানা বেঁধেছিল ইতিমধ্যেই তা মিটে গেছে। টাকাটা চাদরের কোণে বেঁধে নিয়ে রামসুন্দর সহাস্যমুখে বেয়াইর কাছে গেলেন বটে কিন্তু 'পঞ্জরের তিন খানি অস্থির মত ঐ তিন খানি নোট'[৬] তিনি বেয়াইর সামনে তুলে ধরলেন। এত কষ্টে সংগৃহীত হলেও টাকাটা যেহেতু পুরো পাওনা শোধ নয় (বাকি ছিল ৭০০০ টাকা), তাই ঐ সামান্য টাকা নিয়ে বেয়াইমশাই আর 'হাত দুর্গন্ধ' করতে চাইলেন না। কাজেই মেয়েকে বাড়ি নিতে পারার অনুমতিও মিললো না। 'রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে নোট কয়খানি চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার ওপরে দাবি করিতে পারিবেন। ততদিন আর বেহাই বাড়ি যাইবেন না।'[৭] কিন্তু কোনভাবেই যখন পুরো টাকাটা যোগাড় করতে পারলেন না রামসুন্দর, তখন ছেলেদের অজ্ঞাতে তিনি বসতবাড়ি বিক্রি করে বসলেন বরপণের দেনা শোধ করার জন্য—যাতে করে বিয়ের অপরাধে আসামী মেয়ের ওপর থেকে ওয়ারেণ্ট তুলে নিয়ে তাকে জামীনে ঘোরাফেরা করার মত একটু সুযোগ করে দেয়া যায়। কিন্তু সেই ন্যূনতম অধিকারটুকু ফিরিয়ে দিতেও কত বাধা। যখন টাকা নিয়ে মেয়ের কাছে গেলেন রামসুন্দর, খবর জানতে পেরে তাঁর ছেলে ও নাতিরা হাজির হলো সেখানে। ছেলে বললো : 'বাবা আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে'।[৮] নিরুপমা সব বুঝতে পারলো। সার্বিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ওর স্বাধিকার বোধ ও ব্যক্তি মর্যাদাবোধ তীব্র হলো। ও বাবাকে বললো : 'টাকাটা যদি দাও, তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। আমি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো

না। তাছাড়া আমার স্বামীতো এ টাকা চান না'।[৯] স্বামীকে এখানে উদার করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথ চান 'স্বামীরা' এমনি উদার মানসিকতারই হোক। কিন্তু আজকের সমাজেও শ্বশুরবাড়ির প্রাপ্তি গ্রহণে কুণ্ঠিত, এমন অনুদার স্বামী বড একটা চোখে পডে না। মেয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে পরাভূত হয়ে রামসুন্দর এবারও কম্পিত হস্তে টাকাগুলো নিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা গোপন রইলো না। 'ডেপুটি মেজিস্ট্রেট' স্বামীর অনুপস্থিতিতে অত্যাচারিতা নিরুপমার পক্ষে শ্বশুরবাড়ি ক্রমে ক্রমে 'শরশয্যা' হয়ে উঠলো। এবং 'কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না —যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইলো, সেই দিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেই দিনই ডাক্তারের দেখা শেষ হইলো।'[১০]

রায়বাহাদুর বাড়ির বড বৌ-এর শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই হলো। রামসুন্দরের কাছে সান্ত্বনাবাণী পৌঁছলো, কত সমারোহে তাঁর মেয়ের শ্রাদ্ধ হয়েছে। তাঁর অন্তরের ঘা বাইরে বেরুবার সুযোগ পেল না কোনদিন। স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে, এতবড উদারস্বামী, যিনি পুরো পণের টাকা না পেয়েও স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন, তিনি এতসব ঘটনার কিছুই জানলেন না। তিনি এতদিন বাদে তাঁর স্ত্রীকে নিজের কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। তাঁর মা জবাব দিলেন : 'বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে'।[১১] এবার পণের অংক দ্বিগুণ : 'বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'।[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

ক. বরের পিতা-মাতার পণের টাকার খাই প্রচণ্ড। এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায়ও ঐ একই চিত্র বিদ্যমান।

খ. পণের টাকা মেটানোর জন্য পিতাকে সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়। এই চিত্র এখনও এতটুকু ম্লান হয় নি। সমাজে তা এখনও বিদ্যমান।

গ. এখনও নিরুপমার মত পণের টাকা পরিশোধ না করতে পারায় কনেকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয়া হয় না।

ঘ. পণের টাকা না দিতে পারায় নিরুপমার ওপর যে নির্যাতন, এখনও তা সমাজে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

এবং ঙ. পণের শেষ পরিণতি বধূর মৃত্যু। এর নাম কি পক্ষান্তরে আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করা নয়?

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মধ্য দিয়ে পণপ্রথার পরিণতির চিত্র যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অর্থগৃধ্নুতার দৃশ্যপটও নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই গল্পে 'পরিণতি'র প্রতিকার নেই। অবশ্য এখনও ময়না তদন্ত ছাড়াই এমনিভাবে বহু বধূকে নীরবে পণের বলি হতে হয়, যেখানে আইনের ফাঁস দিয়ে বধূ-মৃত্যুর নায়কদের সোপর্দ করা যায় না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সোচ্চার মানসিকতা আজকের দিনের মানুষের প্রতিবাদের মন্ত্র হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছের তৃতীয় পর্বের গল্প 'হৈমন্তী'। স্বভাবতই এ গল্পের প্রকাশ-ভঙ্গীতে ঋজুতা এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও বিচিত্রমুখীনতা ঝরে পড়েছে। এটি একটি স্মৃতিচারণমূলক গল্প। এখানেও শ্বশুরের অর্থগৃধ্নুতার স্বীকার হয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। স্বামীর রস-সমৃদ্ধ ভালবাসা পেয়ে হৈমন্তী শ্বশুরকুলের নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নুতার প্রতিবাদে আত্মঅবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তাঁর করুণ পরিণতিকে আরো দ্রুততর করেছে মাত্র।

এ গল্পের পণগ্রহীতা, হৈমন্তীর শ্বশুরমশাই-র অর্থ-পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ পণপ্রথার ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু বিয়ের আসরে চুক্তিবদ্ধ পণের টাকা পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি—তাঁর লোভের শিকড় আরো গভীরে লুক্কায়িত ছিল। নিজের কল্পিত আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন এবং হৈমন্তীর প্রতি সেই যন্ত্রণার বিষ অযথা বর্ষণ করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। গল্পটি এরূপ : গল্পের নায়ক তথা পাত্র অপূর্ব। কনে হৈমন্তী। কলেজে পড়া যুবক অপূর্বর বিয়ে ঠিক হলো পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোন এক রাজার অধীনে চাকুরীরত গৌরীশংকরবাবুর একমাত্র কন্যা হৈমন্তীর সঙ্গে। হৈমন্তীর বয়স ষোল। তবে 'সে স্বভাবের ষোল, সমাজের ষোল নহে'।[১৩] বিদুষী সংযত সহজ অনাড়ম্বর অথচ প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী হৈমন্তী। ছেলের বাবা গৌরীদানের পক্ষপাতী হলেও হৈম'র ষোল/সতের বছর বয়সকে মেনে নিতে আপত্তি নেই। 'মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনও তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।'[১৪] অর্থাৎ পণের অংক পনের হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকার

গহনা। যা দেবার কথা সবটাই গৌরীশংকরবাবু দিয়েছেন, চড়া সুদে টাকা ধার করে; বইপ্রেমী, ধীর, শান্ত, সংযমী মানুষ তিনি, একথা কাউকে বুঝতে দেন নি। অপূর্ব'র বাবা-মা কল্পনা করে নিয়েছিল বেয়াই বুঝি রাজার অধীনে মন্ত্রীগোছের একটা বড় চাকুরী করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবসরের পর একমাত্র জামাই অপূর্ব ঐ পদে স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে; ব্যাঙ্কেও কমপক্ষে লাখখানেক আছে যার উত্তরাধিকারী পরোক্ষে অপূর্ব-ই। কিন্তু সত্যভাষী গৌরীশংকরবাবু কখনই কাউকে বলেননি, তিনি মন্ত্রীর চাকুরী করেন কিংবা ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত আছে। অতএব ভবিষ্যতে প্রাপ্তির লোভে অনুমান নির্ভর 'মন্ত্রী-গোছের বেয়াই'র মেয়েকে যথাযথ বৌ-র মর্যাদা দিতে প্রথম অবস্থায় ওরা কার্পণ্য করেনি। কিন্তু যেদিন ছেলের বাবার স্বপ্নভঙ্গ হলো, তারপর থেকেই শুরু হলো হৈমন্তীর ওপর মানসিক অত্যাচার। অপূর্ব'র ভাষায়: 'যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনদিন কোন আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানিনা কোন যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাহার বেহাই তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন'।[১৫] হৈমর প্রতি অত্যাচারের সঙ্গে মিথ্যে ভাষণ যখন যুক্ত হলো, ওর ঋষিতুল্য বাবাকে যখন 'ঋষিবাবা' বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলো, হৈমন্তীর আঘাত মরমে গভীরভাবে প্রবেশ করলো তখন থেকেই। মনের যন্ত্রণাকে শিক্ষা, রুচি ও সংযম দিয়ে ঢেকে রাখতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছে ভয়ংকর ভাবে। একদিন হৈমর বাবা এলেন, হৈম কাঙালের মত হাহাকার করে উঠলো বাবার সঙ্গে যাবার জন্য। বাবা মেয়েকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু বইপ্রেমী আপনভোলা মানুষটি বুঝতে পারলেন না, বেয়াইবাড়িতে আগের মত যত্ন তাঁর নেই; বাপের সঙ্গে মেয়ের যাবার অনুমোদনেও বাঁধা পড়বে। বিয়ের শর্তানুযায়ী ষোল আনা যৌতুক দিয়েও তার অপরাধ তিনি মন্ত্রীগোছের চাকরি করেন না; তাঁর অপরাধ, তাঁর নামে ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত নেই। তাই ডাক্তার এনে মেয়েকে দেখানোর পর ডাক্তারের মুখ থেকে মেয়ের রোগের ভয়াবহতা যখন শুনেছে, তখন পাল্টাভাবে তাকে এ ব্যঙ্গও শুনতে হয়েছে, 'অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতের-ই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারের কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।'[১৬] যে ভয়াবহ পরিণাম 'দেনা পাওনায়' দেখা গেল অনুরূপভাবে এ

গল্পেও নায়ককে 'বুকের রক্ত দিয়ে দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী'[১৭] লিখতে হলো। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, 'দেনা পাওনার' চেয়ে 'হৈমন্তী' গল্পের পণ-গ্রহীতার চাহিদা আরো বেশী অনমনীয়; আরো বেশী সাংঘাতিক লোভের দৃষ্টি এদের। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণপ্রাপ্তির ভয়ংকর লালসা ছাড়াও বিয়ের পরবর্তী আরো একটি 'পণতুল্য' ঘৃণ্য আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী জীবনকেও বিষময় করে তুলতে পারে। 'হৈমন্তী' গল্প তার প্রমাণ।

প্রাগুক্ত গল্পদুটিতে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে পণপ্রথার কবলে পতিত ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার মেয়েদের জীবনের শোচনীয় পরিণামকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গভীর প্রত্যয়ী আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ এর পাশাপাশি পণ-গ্রাহকদের হীনমন্যতার বিরুদ্ধে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং বিবাহলগ্না কন্যাকেও বিদ্রোহী করে তুলেছেন তাঁর 'অপরিচিতা' গল্পে। এটি নিঃসন্দেহে পণপ্রথার তথা বরপক্ষের দুষ্টলোভের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গল্পটির রচনাকাল ১৩২১ সালের কার্তিক মাস। অর্থাৎ আজ থেকে ৭২ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ, মা ষষ্ঠীর কৃপায় পুত্রসন্তানলাভকারী হীনলোভী শোষনেচ্ছু পিতাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কনে তথা কনের পিতাদের ব্যক্তি মর্যাদা নিয়ে গর্জে ওঠার মন্ত্র শুনিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এই 'অপরিচিতা' গল্পটিতে।

এ গল্পের বক্তা পাত্র অনুপম স্বয়ং। তিনি এম. এ. পাশ কিন্তু অভিভাবক (মামা) হীন চলার যোগ্যতা তাঁর হয় নি আজো। যথাসময়ে অনুপমের বিয়ের খোঁজখবর করা শুরু হলো। ছেলে বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকমামা রীতিমত শোষক এবং প্রভু-অভিভাবক সেজে বসলেন। 'ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তার অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না··· · মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর।'[১৮]

এ ক্ষেত্রেও মেয়ের বয়স পনের। বয়সটা আপত্তিকর হলেও টাকার অঙ্ক গহনার ভরি-ওজন ও দর সব পাওনা এককথায় মিটে যাওয়ায় এবং মেয়ের বাবা শম্ভুনাথ সেনকে স্বল্পভাষী চুপচাপ দেখে তাকে নির্জীব তেজহীন ভেবে নিয়ে

বয়সের আপত্তিটি শিথিল হয়ে গেল। ধুমধাম করে গায়ে হলুদের পর্ব সমাধা করলেন ছেলের মামা, মেয়ের বাবাকে নাজেহাল করার জন্য। বিয়ের আসর সাজানো হয়েছে মাঝারী ধরনের, মামার তা মনোঃপুত হলো না। বিয়ের কাজ শুরু হবার আগেই মামা কনের গয়নাগুলোর গুণাগুণ এবং ওজন যাচাই করে নিতে চাইলেন। আর এর জন্য তিনি বাড়ির স্যাকরাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মেয়ের বাবা তা শুনে মনক্ষুণ্ণ হলেও বাইরে তিনি স্থির অবিচল। বিয়ের বরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তারও স্যাকরা দিয়ে গয়না যাচাই করার অভিমত কিনা ? বলা বাহুল্য পাত্র অনুপমের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। সে মামার ভাষায়ই সম্মতি জানায়। মেয়ের গা থেকে সব গয়না খুলে আনার পর মামা একটা নোট বুক নিয়ে একে একে সব গয়নার হিসেব টুকে নিলেন। গয়নাগুলোর গুণাগুণ এবং ওজন যাচাই করে জানা গেল, সেগুলো সর্বাংশে খাঁটি এবং তার ওজন বরপক্ষের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী। অবশেষে একজোড়া 'এয়ারিং' এনে শম্ভুবাবু স্যাকরাকে দিয়ে তার গুণাগুণ যাচাই করতে বললেন। স্যাকরা জানালো ঐটি সমস্ত গয়নার মধ্যে গুণমানে নিকৃষ্টতম। অর্থাৎ প্রচুর ভেজালযুক্ত সোনা। মামার মুখ লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়। কারণ ঐ ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট গয়নাটি দিয়েই মামা কনের আশীর্বাদ-পর্ব সমাধা করেছিলেন। এর-পরের অংশটি চমকপ্রদ। মামা ঘনঘন তাড়া দিচ্ছেন বিয়ের কাজ শুরু করার জন্য, লগ্ন যে বয়ে যায় ! কিন্তু শম্ভুবাবু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সকল বরযাত্রীদের অত্যন্ত যত্নসহকারে খাইয়ে দাইয়ে খুব শান্তভাবে বললেন : 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দি।'[১৯] মামা অবাক হচ্ছেন, ঠাট্টা নয় তো ! শম্ভুবাবু জানালেন : 'আমার কন্যার গহনা চুরি করিব, একথা যারা মনে করেন, তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।'[২০] চরম অপমানিত হয়ে দাম্ভিক মামাকে পাত্র-কে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হলো। এ প্রসঙ্গে অনুপমের ক্ষেদোক্তি : 'সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাবা বিবাহের আসর হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে।'[২১] বরযাত্রীরা বলাবলি করিল : 'বিবাহ হইল না, অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল। পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নশুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আপশোস মিটিত।'[২২]

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর কিছুদিনপর অনুপম মামাকে নিয়ে

তীর্থভ্রমণে গেছে। পথিমধ্যে ট্রেনের একই কামরায় দেখা হয়েছে এক অপরূপা সুন্দরী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী-সরলা যুবতীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে। এই যুবতী ট্রেনে চলাকালীন কয়েকবার বিভিন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিদিয়ে সহযাত্রী হিসেবে অনুপমকে রক্ষা করেছে। অনুপম মুগ্ধ, মোহিত। পরিচয় নিয়ে সে জানলো, এই যুবতীর নাম কল্যাণী (বাবা শম্ভুনাথ সেন, কানপুরের একজন বড ডাক্তার), যার সঙ্গে অনুপমের বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনুপম পুনরায় কল্যণী এবং ওঁর বাবার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করলো। কিন্তু এবারও তাকে বিফল হতে হলো। কল্যানীর বাবা একটু নরম হ'লেও কল্যানী নিজেই বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হলো না। সেই বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই ও মেয়েদের শিক্ষারব্রত গ্রহণ করেছে। মেয়েরাও যে মানুষ, পুরুষ শাসিত সমাজের দেনা পাওনার উর্ধেও যে নারীর ব্যক্তিত্বশালিনী পরিচয় আছে, নারীও যে পুরুষের কাছে দুর্লভ, পুরুষের একান্ত সাধনার ধন হ'তে পারে—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ 'অপরিচিতা' গল্পে আমাদের মস্তিস্কে ঢুকিয়ে দিলেন। আমাদের মস্তিষ্কোষ তা কতটুকু ধরে রাখতে পারবে, সেইটেই ভাববার।

এই গল্প লেখার ৭২ বছর পরের আমরা আরো আধুনিক, আরো যুক্তিবাদী হয়েও মেয়ে-বিয়ের বেলায় ছেলের বাবার কাংক্ষিত পণ যৌতুকের কাছে জোড়-হাত হয়ে দণ্ডায়মাণ হই অনুগত ভৃত্যের মত। 'লগ্নভ্রষ্টা মেয়েব' বিয়ে হবে না—এই ভয়ে এখনও পাত্র পক্ষের অন্যায় আবদার আমরা মাথা পেতে নিই। সাহস-করে প্রতিবাদ করি না, যদি আমার ঘরের মেয়েটিই লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যায়! পাত্র-পক্ষের অপরিমিত দাবি মেটাতে না পারায় বা না মেটালে ঘরে ঘরে লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের সংখ্যা কতটা বাড়ে এবং পরবর্তীতে এদের সত্যি সত্যি অনূঢ়া হয়ে থাকতে হয় কি না, আর থাকলেও তাদের জীবনটাও যে ব্যর্থ হয়ে যায় না, সেটা যাচাই করার পরীক্ষা করার সময় এসেছে। আমরা সম্ভবত সবাই চাই এই অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া প্রথার বিলোপ হোক। কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাইনা কেউ। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে! মুসকিলটা এখানেই।

৩

ক্রীতদাস প্রথা সব ধনতান্ত্রিক দেশ থেকেই প্রায় উঠে গেছে। ক্রীতদাস

প্রথার নামে আমরা আতংকিত হই। অথচ একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভাবলে পণপ্রথার ভয়াবহতাকে ক্রীতদাস প্রথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা যায় না। উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যক্তিমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা। পার্থক্য এই পণপ্রথার শোষণটি রোমান্টিক--দাসীবৃত্তিতে তাই নিজেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাই, আর ক্রীতদাস প্রথাটি মন ও শরীর উভয়দিক থেকেই নির্মম, তাই আতংক এতবেশী।

পণপ্রথার মত ঘৃণ্য একটা প্রথা তাই আজও আমাদের সমাজে টিকে আছে। মেয়ের বাবার কাছ থেকে য-যত বেশী পণ নিতে পারেন, সেই পাত্র নিজেকে ততবেশী যোগ্যপাত্র মনে করেন। একবারও কি তারা ভেবে দেখেন তাতে করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, মানবিক মূল্যবোধ কোথায় উবে যায়! ভাবেন না। প্রতিটি ব্যক্তি একথা তলিয়ে ভাবেন না! ভাবলে পণপ্রথা বিরোধী আইন এ-ভাবে ব্যর্থ হতো না। আইনত পণ দেয়া-নেয়া নিষিদ্ধ হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পণ দেয়া নেয়াটা দিনদিন জ্যামিতিক হারে এভাবে বেড়েই চলতো না।

অতিরিক্ত পণের চাপে আজকাল 'যৌতুক' ও 'পণ' একাকার হয়ে গেছে। আজকাল যৌতুক বলতে আর শুধু মেয়ের বাবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপহার দেয়াকেই বোঝায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বর পক্ষের বাধ্যবাধকতা।

অথচ পণ আদান-প্রদানের মত একটি ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। প্রতিদিন যে হারে পণের দায়ে গৃহবধূর জীবন নাশ হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের নিজেদের কীর্তির চেয়ে অপকীর্তির দৃষ্টান্তই উজ্জ্বলতর হবে। ১৯৮০-৮৬'র মার্চ পর্যন্ত পণের দায়ে বলি হয়েছেন ১৫৬২ জন নারী। ১৯৮০-৮৬-তে শুধু দিল্লীতেই পণের দায়ে মৃত্যু হয়েছে ২১৩৭ জনের। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এধরনের ঘটনায় গৃহবধূ-মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম।

১৯৬১ সালে সংসদে পণপ্রথা-বিরোধী আইন পাশ হয়। ১৯৮৪ সালে ঐ আইন সংশোধিত হয়। ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট রাজ্যসভায় উত্থাপিত সংশোধিত পণপ্রথায় ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 'পণপ্রথা সংক্রান্ত মৃত্যু' নামে একটি নতুন অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে। পণগ্রহণকারীদের পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কিন্তু দীর্ঘকালের অস্থি মজ্জায় চেপেবসা পণপ্রথার উচ্ছেদ ঘটানো শুধুই

আইন করে সম্ভব নয়, এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আনুষঙ্গিক আরো কিছু সমস্যার সমাধান দরকার।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মেয়েরাই কোনো না কোনভাবে পিতা কিংবা স্বামী অথবা অন্য যেকোন পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতা মানসিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দেয়। ভরণপোষণ-দাতা এবং তার সাথে সাথে তার চারপাশের সকলের কথামত চলতে গিয়ে একসময় নিজের ইচ্ছেমত কথা বলতেই তারা ভুলে যায়। কোন নারীকে স্বাধীনভাবে চলতে দেখলে অভ্যাসের বশে তাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে মনে হয়। মনের ওপর বশ্যতা স্বীকারের এই পর্দাটি থাকে কিংবা না-থেকে উপায় নেই বলেই পুরুষদের হাতের পুতুল হয়ে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। তাঁদের নির্যাতন সইতে হচ্ছে নিয়তির বিধান বলে অসহায়ভাবে মেনে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হচ্ছে। আসলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া নারীমুক্তি নেই, কোন মতেই নয়। অক্ষমতা আর নিভরতা থেকে জন্ম হয় শোষণের বিভিন্ন কলাকৌশল। তাই পণপ্রথার ভয়াবহতা থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে হলে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বনিভরতার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। একথা বলছি না যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এলেই পণপ্রথার ভয়াবহ পরিনাম সমূলে নিশ্চিহ্ন হবে, তবে অত্যাচার অনেকাংশে বন্ধ হবে, একথা নিশ্চিত। অত্যাচারীরা তাদের প্রাপ্তির স্বার্থেই অত্যাচার বন্ধ করবেন। আর যদি তাতেও অত্যাচার বন্ধ না হয়, তাহলে বিকল্প পথ খুঁজে নেবার সুযোগ মেয়েদের নিজের অধিকারে। কাজেই পণপ্রথার করুণ পরিণতিকে ঠেকাতে হলে চাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রায় সমস্ত ধরনের কাজে (যা তাঁর শারীরিক দিক দিয়ে অসুবিধেজনক, কেবলমাত্র সে সব বাদে) অংশ গ্রহণের সমান অধিকার। একজন অশিক্ষিত পুরুষের যদি কর্মসংস্থান হতে পারে, তাহলে একজন অশিক্ষিত নারীর কর্মসংস্থান হতে পারবে না? কাজ পাবার ব্যাপারে মেয়েরা, বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে। কৃষক পরিবারের মেয়েদের এখনও স্বাভাবিকভাবে জমিতে কাজ করতে দেয়া হয় না। তাদের শারীরিক অক্ষমতাকে বড় করে দেখা হয়। অথচ এই শস্য উৎপাদন নারীর মৌলিক সৃষ্টি। জমির সব কাজই লাঙল ঠেলার মত কঠিন নয়। সন্তানকে গর্ভেধারণ

ও লালন-পালনের মত কঠিন ধৈর্যের ও কষ্টের কাজটি যদি নারীদের দ্বারা অনায়াসে সম্পাদিত হতে পারে, তাহলে জননীতুল্য জামর সন্তানদের যত্ন নিতে নারীরা পারবে না, একথা কোন্ যুক্তিতে মেনে নিই? মেয়েরা জমিতে ফসল ফলানোর কাজে পুরুষদের সাহায্য করতে পারে না, কারণ তাতে পুরুষদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়। এখানে কর্ম-নিয়োগের ক্ষেত্রে বড বাধা শোষণের আর একরকম প্রক্রিয়া। কয়লা-ভাঙা বা ইটভাঙা প্রভৃতির কাজেও মজুরী নির্ধারিত হয় স্ত্রী এবং পুরুষ হিসেবে আলাদা আলাদা ভাবে। কোন মেয়ের কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। যোগ্যতা শ্রেণীকরণের চাপে তলিয়ে যায়। এসব দিক ব্যাপকভাবে ভাববার দরকার। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, সব মহিলারাই কাজে নিযুক্ত হতে চান না। পুরুষের ওপর নির্ভর করে করে পরনির্ভরতাই কারো কারো কাছে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ধারণা হয়েছে স্বামীদেবতার ঘাড়ে চেপে বসে খাওয়াটা যেন তাদের বৈবাহিক অধিকার। পরিশ্রমবিমুখ থেকে থেকে স্বনির্ভরতার কথা শুনলে ভেতরে ভেতরে তাঁরা আঁতকে উঠেন? এমন দৃষ্টান্তও সমাজে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের মগজ ধোলাই-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য সংখ্যার বিচারে এরা এতই নগন্য যে এদিকটাকে এক্ষেত্রে মুখ্য করে না ভাবলেও চলে।

এছাড়া, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এবং মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। নিজেকে সচেতন করার জন্য শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় একথা বহুল প্রচলিত। ১৯৭১ সালের লোকগণনায় ভারতের নারী শিক্ষার হার মাত্র ১৮.৪৪, গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশেরও কম।

বর্তমানে পুরুষ বেকার সমস্যার আধিক্য 'পণপ্রথাকে' বিলোপ করার পেছনে একটা বড অন্তরায়। যেহেতু হাজার হাজার যুবকই এখন বেকার, তাই বিয়ের মাধ্যমে শ্বশুরের কাছ থেকে পণ নিয়ে তাদের অনেকেই চান ঐ টাকা দিয়ে ছোটখাট কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করে বেকারত্বের দুবিসহ জ্বালা ঘোচাতে, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে। এদিকটি ভাববারও প্রয়োজন আছে। সরকারী আইন করেও পণপ্রথার মত একটা ঘৃণ্যপ্রথাকে বন্ধ করা যে যাচ্ছে না তার পেছনে ক্রমবর্ধমান যুব-বেকার সমস্যাও বেশ কিছুটা দায়ী।

সর্বস্তরের নারী সমাজকে পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে সচেতন করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম গুলিরও একটা বড ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য প্রচার যদি

একেবারেই প্রচারধর্মিতায় রূপ নেয়, (যেমন খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে পরিবেশিত খবর বা তাত্ত্বিক আলোচনা) তাহলে তা সর্বসাধারণের মানসিকতাকে আলোড়িত না-ও করতে পারে। রেডিও-টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কিংবা নাট্যাকারে যদি পণপ্রথার ভয়াবহতা, অধিকার সচেতনতা বোধ, স্বনির্ভরতার উপযোগিতা প্রভৃতি আরো বেশী করে তুলে ধরা যায়, তাহলে কিছুটা সুফল পাবার সম্ভবনা থাকে। বিভিন্ন সভাসমিতিও একাজে ভূমিকা নিতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একাজে অগ্রণী-ভূমিকা নিচ্ছে।

পণপ্রথার করুণ পরিণতিকে ঠেকাতে হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদেরও একটি ব্যাপারে সচেতন হওয়া বোধ হয় দরকার। সেটা হলো, বর ও কনে উভয় পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রতিপত্তিগত সমতাবিধান। কনের বাবা স্বভাবতই চান নিজের চেয়ে আরো বেশি স্বচ্ছল ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে। ফলে বরের ঘরের সংগে নিজেকে ও মেয়েকে মানানসই করতে গিয়ে তাকে সামথের বাইরে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় ; পাত্রপক্ষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজেকে অন্যদিক থেকে ঋণের ভারে জর্জরিত করতে হয়। সে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে টিকতে না পারলেই পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনার' নিরুপমার মত। কাজেই কন্যাপক্ষকেও অবদমিতলোভের কামনাকে একটু সংযত করা ভাল নয় কি ? তাতে করে মেয়ের পক্ষেও খানিকটা সুবিধে হয় স্বামী বা শ্বশুরের ঘরে নিজেকে মানিয়ে নিতে।

আর একটা কথা। শুনতে কারো কারো কাছে শ্রুতিকটু হলেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবাঞ্ছিত নয়। তাহলো প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র-পাত্রীকে তাদের মনমত স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের সুযোগ দেয়া। যা'কে সারা জীবনের জন্য সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়া হয়, তাকে উভয়ের ঐক্যমতের, চেনাজানার মধ্য দিয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে নির্বাচন করাই কি ভাল নয় ? মানছি এই চেনা-জানার মধ্যেও ফাঁক থাকে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয় কোন কোন ক্ষেত্রে। তবু নিজের মনের কাছে কিছু সান্ত্বনা থাকে। আর আমাদের যে মূল আলোচনার বিষয় পণপ্রথার ভয়াবহতা, তাকে অনেকাংশে হ্রাস করা যায়।

সবশেষে বলা যায় ! কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পেছনে তাঁদের নিজেদের বৈষম্যমূলক আচারণও কিছুটা পরোক্ষে দায়ী।

পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সবার সমান অধিকার। একথা ভারতীয় সম্পত্তি অধিকার আইনেই স্বীকৃত। সম্পত্তির এই 'সমানাধিকার আইন'-র দ্বারা স্বীকৃত হলেও সমাজের বিশেষত পিতাদের দ্বারা সহজ-স্বীকৃত বা সমবণ্টন হয়নি আজও। এখনও পিতারা স্থাবর সম্পত্তি ভাগ করেন ছেলেদের সংখ্যাগুণে। বণ্টনও করেন এভাবেই, যেমন দু'ছেলে হলে দু'ভাগ, মেয়েকে সহজে হিসেবেই ধরতে চান না ; ঐ মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাভাবিক নিয়মে হতে পারছে না। আমাদের সমাজে তাই দেখা যায়, বাবার কাছ থেকেও একধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে মেয়েরা। নিজের আপন ঘর বলে কিছু থাকেনা এদের। ফলে অধিকাংশ নিম্ন-উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বিয়ের সময় বাবার অত্যধিক যৌতুক ও পণ দিতে দেখলে বিব্রত হন না, বরং মনে মনে খুশী হন এই ভেবে যে বিয়ের সময়ে যেটুকু পাওয়া গেল এটুকু যথার্থপাওয়া, ওইটুকুই তার ভবিষ্যতের ভরসা। এর পরের পাওনা তো সব ফাঁকি। আর তাই বড় মেয়ের চেয়ে ছোটমেয়েকে কম দিলে ছোটমেয়ে মনে মনে চটে যায়। ভাবে কেন বরপক্ষ আর একটু চাইতে পারলো না। পাত্রপক্ষও বোঝেন, একবার 'পণ' নিয়েই সারাজীবনের জন্য মেয়েটির সমস্ত খরচ বহন করতে হবে, কাজেই যতটা সম্ভব চাপ দিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই মেয়েকে সুখী, স্বনির্ভর দেখতে হলে মেয়ের বাবাকেও বিমাতাসুলভ মনোভাব পাল্টাতে হবে, মেয়েকে দিতে হবে সুসম বণ্টনের আইনানুগ অধিকার।

পাদটীকা

১. রবীন্দ্রনাথের **গল্পগুচ্ছ** / আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, দেনা পাওনা, পৃ: ১৩।
২. ঐ। পৃ: ঐ।
৩. ঐ। পৃ: ঐ।
৪. ঐ। পৃ: ১৪।
৫. ঐ। পৃ: ১৫।
৬. ঐ। পৃ: ঐ।
৭. ঐ। পৃ: ঐ।

৮. ঐ। পৃ: ১৬।
৯. ঐ। পৃ: ১৬-১৭।
১০. ঐ। পৃ: ১৭।
১১. ঐ। পৃ: ১৮।
১২. ঐ। পৃ: ১৮।
১৩. হৈমন্তী, গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ: ৬৪৮।
১৪. ঐ। পৃ: ৬৪৭।
১৫. ঐ। পৃ: ৬৫১।
১৬. ঐ। পৃ: ৬৫৭।
১৭. ঐ। পৃ: ঐ।
১৮. অপরিচিতা, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ: ৭০৭-৭০৮।
১৯. ঐ। পৃ: ৭১২।
২০. ঐ। পৃ: ঐ।
২১. ঐ। পৃ: ৭১২।
২২. ঐ। পৃ: ঐ।

কৃষ্ণকলি বিশ্বাস

বর্ণবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

ভারতের একতৃতীয়াংশ আয়তনের দেশটা আফ্রিকা, জনসংখ্যা তিনকোটির মত। এরমধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। যেসব সদ্যস্বাধীন দেশে নয়া উপনিবেশ গড়ার মার্কিনীষড়যন্ত্র জোরকদমে চলছে তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ সামনের সারিতে। বর্ণবিদ্বেষবাদের পোষাক গায়ে চাপিয়ে সংখ্যালঘু গোরা সাহেবদের লাগামছাড়া অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু জনগণের স্বাধীনতা হরণ করে চলেছে সভ্য পৃথিবীর নাকের ডগায়। আর সেই কারণেই স্বাধীনতাকামী মানুষের উত্তাল সংগ্রাম চলছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। অজস্র ত্যাগ ও আত্মদানের ধারালো অভিজ্ঞতায় আফ্রিকার কালোরঙের মানুষগুলো দিনে দিনে জীবন্ত ইস্পাত হয়ে উঠছে।

বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের প্রতিবাদ-আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯১২ সালে 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' জন্মলাভের মধ্যদিয়ে। পাশাপাশি তৈরি হয় 'সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' ও বিভিন্ন গণসংগঠন। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠিত হয়। এরই সঙ্গে 'কালার্ড পিপলস্ কংগ্রেস' এবং 'কংগ্রেস অব ডেমোক্রাটস' সংগঠন দু'টির সংঘবদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের জুন মাসে, জোহানেসবার্গের কাছাকাছি ক্লেপটাউনে, এই মহাসম্মেলনে 'ফ্রিডাম চার্টার' বা 'স্বাধীনতার দলিল' গৃহীত হয়, সেই দলিল আজও স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ রূপরেখা। এই দলিলের মূল কথাগুলির মধ্যে ছিল বর্ণবিদ্বেষ বা জাতিরভিত্তিতে ঘৃণা প্রচার করা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন বর্ণবিদ্বেষী 'পীস' আইনের মত বর্বোররচিত আইনকে তাদের সামনে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তখন প্রতিবাদী সংগ্রাম জোরালো আকার ধারণ করল। ১৯৬০ সালে আইনগত

ভাবে 'পীস' আইন পাস হয় ; এই আইন ছিল সভ্য দুনিয়ার কাছে চরম লজ্জার বিষয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর অন্যায় জুলুম।

ক্রমশ অন্যায়ের বোঝাটা কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর আরো বেশী করে পেষণ করবার জন্য এগিয়ে এলো শ্বেতাঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ শিশুর শিক্ষার জন্য সরকার খরচ করে বছরে ৬৯৬ ডলার কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু মাত্র ৪৫ ডলার। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের এক বিরাট অংশ শিক্ষার জগতে ঢুকতেই পারে না। এছাড়া, কৃষ্ণাঙ্গ রমণীদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করবার অধিকারে শ্বেতাঙ্গরা জন্মগত অধিকারেই অধিকারী। এই হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষবাদ। এই বর্ণবিদ্বেষবাদ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে অবিচল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এর অবিসংবাদী নেতা নেলসন্ ম্যাণ্ডেলা। তাকেও বোথা সরকারের পুলিস গ্রেপ্তার করে ১৯৬১ সালে। টানা তিনবছর চলে বিচারের প্রহসন। ১৯৬৪ সালে ম্যাণ্ডেলা ও অন্যান্য নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোলো।

কিন্তু এরফলে বিদ্রোহের আগুন আরো প্রবলতর সংগ্রামীরূপ নিয়ে দেখা দিল। তরুণ কবি বেঞ্জামিন মোলাইজের লেখনী গর্জে উঠল। এ কণ্ঠকেও স্তব্ধ করে দেবার জন্য ২৮ বছরের তরুণ কবিকে ১৮ অক্টোবর' ৮৫ ফাঁসী দিলো বোথা সরকার, কিন্তু এভাবে জনতার কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায় না। ফাঁসির ঠিক আগের মুহূর্তে তরুণ কবি তাঁর শক্ত সবল বলিষ্ঠ ডানহাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে তুলে ধরেছিল আকাশের দিকে আর নির্ভয়ে বলেছিল—সংগ্রাম চলবেই। স্বদেশবাসীর প্রতি বেঞ্জামিন মোলাইজের এই শেষ আশ্বাস কিন্তু স্বদেশবাসী এতটুকু বিস্মৃত হয়নি। তাই আজও আফ্রিকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মুক্তির সংগ্রাম।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষ মানুষকে শোষণ করে। আর সেই শোষণ চালাবার জন্য দাঁড় করানো হয় নানান যুক্তির, নানান তত্ত্ব গড়ে ওঠে। বর্ণবিদ্বেষও যে এ ধরনের কিছু তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী আলোচনায় তা বোধহয় স্পষ্টত ফুটে উঠছে। এইযে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর শ্বেতাঙ্গ, সাম্রাজ্যবাদী, ক্ষমতা লিপ্সু সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকভাবে শোষণ চালাচ্ছে, এরজন্য তারা কখনও বিজ্ঞান কখনও সংস্কৃতির দোহাই দিচ্ছে, তরুণ কবির কণ্ঠ রোধ করছে। উদ্দেশ্য একটাই, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিকৃষ্ট প্রচার করে ধন, সম্পত্তি

ও শ্রমশক্তি লুঠ করা। আজকের পৃথিবীও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এর ভিন্ন ভিন্নরূপে নিজেকে কলুষিত করছে, সময়ের সঙ্গে যদিও এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছে তবু আজও বর্ণবিদ্বেষের ঘৃণ্য অন্যায় অত্যাচার থেকে পৃথিবী মুক্ত নয়।

এরই মধ্যে শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনা করে গিয়েছেন এবং করছেন, সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। সর্বকালেই দেখা গিয়েছে সমসাময়িক অবস্থা তাদের চিন্তাধারায় প্রভাব-বিস্তার করেছে, তাদেরকে আন্দোলিত করেছে বিভিন্নভাবে এবং এর প্রকাশও ঘটেছে এক এক জনার ক্ষেত্রে এক এক ভাবে। কেউ এগিয়ে এসেছেন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে, বর্ণবিদ্বেষকে ধিক্কার জানাতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার শোষণ নীতির সমর্থনে তৎপরতা পরিলক্ষিত হলেও তা জনগণের সর্বোপরি কালের সমর্থনলাভে সক্ষম হয়নি। এভাবেই মানুষের শিল্প সাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তার অতীত, তার বর্তমান। ইতিহাসও নিঃশব্দে তার ছাপ রেখে যায় কালের বিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখেই।

২

বিশ্বের কবি, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকাব্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর অফুরন্ত কাব্য সম্ভারে। বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নেও কবিকে মূক থাকতে দেখা যায়নি। সমসাময়িক ঘটনাবলী বারবার তাঁর রচনাকে নাড়া দিয়েছে, আর ঠিক একইভাবে ত' তাঁর সাহিত্য বিকাশলাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতশক্তির প্রবল প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে তার নগ্ন ঔদ্ধত্যের দীনতা প্রকাশ পেয়েছে কবির সাহিত্যে, এ সবকিছুর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে আজকে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে তার সূচনা করে গিয়েছেন কবি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতায় কবি এর প্রতিবাদ করেছেন অত্যন্ত সুদৃঢ় কণ্ঠে।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন কলকাতার বিত্তশালী, বনেদীপরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। ব্রাহ্ম সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এ সব অবস্থার প্রভাবই তাঁর জীবনে পড়েছিল। তাঁর বিভিন্ন সময়ের রচনার মধ্যে অবস্থাগুলির প্রভাবও পড়েছে বেশ সচেতন ভাবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কবির লেখনী সোচ্চার হয়েছে

বিভিন্ন সময়ে। সেই কারণেই কবিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদও করতে দেখা গিয়েছিল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই। কিন্তু জীবনের শুরুতেই কবির সৃষ্টির এ পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যায়নি, কবিজীবনের সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। কবির বিভিন্ন সময়ের লেখা বিভিন্ন রচনা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তাঁর চিন্তাধারার মূল সুরটি এবং তাঁর বিবর্তনের সুরটি সহজেই ধরা পড়ে। এটা উপলব্ধি করা বোধহয় এতটুকুও অসুবিধাজনক মনে হবেনা যে, চিন্তার জগতে একটি মেরুর থেকে অন্য মেরুতে তাঁর যাত্রা, যার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর রচণার মধ্য দিয়ে।

বাল্যকাল থেকেই কবির ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তার-পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল; ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর এই যোগসূত্র আরো দৃঢ় হয়েছিল। এই অবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে কবির মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে একটা দুর্বলতাও গড়ে ওঠে। আর, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্যায়ে শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত উৎকৃষ্টতা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মনে এ-বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে এসেই ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব। একদিন অগ্রগতির যে জোয়ার এনেছিল শ্বেতাঙ্গ আর্যরা, পরবর্তীকালে সেই ভূমিকা পালন করবে ইংরেজরা, এইছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। আর সেই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাসক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অ-শ্বেতকায়, দলিত একটি জাতির-সংঘাত ফুটে উঠেছে তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কবি দীর্ঘদিন ধরে, শ্বেতকায়দের জাতিগত উৎকৃষ্টতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনের মধ্যে দোদুল্যমান থেকে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয় এবং শোষিত জাতির লেখক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখানেই কবির জয়। কবির সাহিত্য প্রকাশের বিবর্তনের ধারাকে কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা করলে তাঁকে বোঝা সহজ হতে পারে।

১৩১৫-এ 'সমাজ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম' বিষয়ে লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য-সভ্যতার ছোঁয়া অপরিহার্য, যা স্পষ্টত তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত: 'পশ্চিমের সংস্রব হইতে

বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখনও জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের-প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার-যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। ইংরেজের আহ্বান যে পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, আমাদের সঙ্গে মিলন যে পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের-জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে'।[১]

এ থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের-পক্ষ সমর্থনকারী, বর্ণবিদ্বেষী চিন্তাধারার একটা প্রতিফলন প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে, এবং এ থেকে কবির সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা যায়, তা বোধ হয় একেবারেই সঠিক নয়। কারণ পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত কবি নিজেকে সাহিত্য জীবনের শুরুতে কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে প্রকাশ করলেও, এর পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রমশ তা তার রচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়

১৩১৫-এ 'সমাজ' গ্রন্থের যে বিষয় উল্লেখ করা হোলো, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেই মনোভাবের সঙ্গে গবিনিউ, চেম্বারলেন প্রমুখ শ্বেতকায় বর্ণবিদ্বেষীদের চিন্তাধারার খুব একটা তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্বেতাঙ্গদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের অন্যতম যুক্তি হিসাবে তাঁরা 'white man's burden'-এর তত্ত্বটির উত্থাপনা করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গদের সাম্রাজ্যবাদকে নৈতিক আচ্ছাদন দেওয়া হয়। বর্ণবিদ্বেষকে তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে জিইয়ে রাখা হয়। এই বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে বলা হয় যে কৃষ্ণাঙ্গ বা অ-শ্বেতাঙ্গদের ওপর শাসন করা 'উন্নত' শ্বেতাঙ্গদের একটা স্বাভাবিক কর্তব্য। পাশ্চাত্য দর্শনে উদ্বুদ্ধ বহু অ-শ্বেতাঙ্গ বুদ্ধিজীবীকে এই প্রচার মোহাচ্ছন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ তথাকথিত 'সভ্য' রাষ্ট্রগুলি দিনের পর দিন এশিয়া ও আফ্রিকার হাজার হাজার মানুষকে দাবিয়ে রেখেছিল যে একটি মাত্র জোরালো তত্ত্বকে খাড়া করে, তা হোলো বর্ণবিদ্বেষী তত্ত্ব। নিজেদেরকে 'সভ্য' বলে মনে করলেও শ্বেতাঙ্গরা তাদের ভাষায় 'অ-সভ্য' কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে যে আচরণ করে চলছিল (এখনও চলছে) তাকে মোটেই সভ্য আচরণ বলা চলে না, তাই

রবীন্দ্রনাথের সামনে এই 'সভ্য' জাতির মুখোশ একটার পর একটা খসে পড়তে লাগল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ এপ্রিল। জলিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক 'সভ্য' ইংরেজ। এইবারই রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ওপর দাগ কাটল, ইংরেজ জাতির প্রতি গভীর-শ্রদ্ধা থাকা স্বত্বেও রবীন্দ্রনাথ এ-ঘটনার প্রতিবাদ না করে পারলেন না, ইংরেজ সরকারের দেয়া 'নাইট হুড্' তিনি ফিরিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারকে লিখলেন: ' অন্তত: আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিত করতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য সম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি'।[২]

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাবলী কবিকে মর্মাহত করেছিল তাই তাঁর এই প্রতিবাদ। তাঁর এই প্রতিবাদের ভাষা ছিল এত কঠোর যার জন্য সেদিনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কবির এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনের প্রকাশকে বিস্মিত করেছিল। তাঁরা উষ্মা প্রকাশও করেছিলেন কেউ কেউ। রাজনৈতিক দলের পুরোধা মহাত্মাগান্ধীজীও সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি ঐ সময়ে প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। কবির একান্ত হিতৈষী এণ্ড্রুজ সাহেবও সেদিন কবিকে তার চিঠির ভাষা নরম করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠকে কিছুতেই সোচ্চার করা থেকে বিরত করতে পারেননি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও কিন্তু তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হতে পারেননি। আর সেই কারণেই, ১৯২০ সালে তিনি লণ্ডনে গিয়ে যখন দেখলেন পার্লামেন্টে ডায়ারের নিরঙ্কুশ সমর্থন, তখন মনে মনে বেদনা অনুভব করলেন।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন থেকে তিনি লেখেন: ' ... ...পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যে ডায়ারের বিতর্ক হ'ল, তারফলে ভারতের প্রতি এ দেশের শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে এতে বোঝা গেল, বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রতি যতই অমানুষিক

অত্যাচার করুন না কেন, এতে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মনে বিন্দুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হয় না।'।[৩]

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় মনে করেছিলেন যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন। হয়তো তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল। তাঁর মনে ইংরেজের জন্য তখনো একটি বিশেষ স্থান ছিল, ' বিশেষ স্থান ছিল পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য। এহেন শ্বেতাঙ্গ মানুষ অনৈতিক বা অমানবিক কাজে লিপ্ত হবে, এ-ধারণা তিনি হয়ত মনে সম্পূর্ণভাবে স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু কার্যত তা প্রত্যক্ষ করায় তিনি স্বভাবতঃই আহত হলেন।

কবি যখন তাঁর চতুর্দিকে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ শাসনকর্তাদের অন্যায় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন, তখনো কিন্তু তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজকে পুরোপুরি দায়ী করতে পারেননি। শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্য জাতির-সভ্যতার তত্ত্বকে ভুলতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কুশাসনের দায়ভারটা অনেকাংশেই ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেন : স্বদেশ ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশান্তভাবে কাজ করে, কিন্তু যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার সেই ভারতবর্ষের সমাজ নিজের দুর্গতি দুর্বলতা বশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছেনা ; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এদেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সে ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে'।[৪]

এইভাবে ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ইংরেজের অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, অপরদিকে কিন্তু ইংরেজের জাতিগত উৎকৃষ্টতার তত্ত্বকে ভুলতে পারেন না। যদিও শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই মোহ থেকে মুক্ত হন অনেকটাই।

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও তাই রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে তাঁর মোহ অনেকটাই কেটে যায়। তিনি উপলব্ধি করেন কিভাবে ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে, শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের

সর্বনাশ সাধনে উদ্যত। তাই 'আফ্রিকা' কবিতায় তিনি যখন ক্ষমতালিপ্সু এই জাতির কথা লেখেন, তখন তাঁর আগেকার মোহের অবশিষ্ট দেখা যায় না : 'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে, / এল মানুষ ধরার দল / গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে, / সভ্যের বর্বর লোভ / নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা'।[৫]

এবারে কবিকে দেখা গেল যেন এক নতুন সাহিত্যিকরূপে। কবি কণ্ঠে সোচ্চার প্রতিবাদের পাশাপাশি নিপীড়িত'আফ্রিকা'-র কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে জাগরণের মন্ত্র প্রবেশ করিয়ে দেবার এক অদম্য প্রচেষ্টা। কবির সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল বর্ণবিদ্বেষী, শ্বেতাঙ্গদের মুক্তির প্রতিধ্বনিমূলক বার্তার কোনো ইঙ্গিত, এ যেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথ। কবিকে যেন মনে হোলো, অনেক আগুনের তাপে দগ্ধ হয়ে, অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক নতুন ঔজ্জ্বল্যলাভ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবির লেখনীতে বেজে উঠল শোষিত মানুষ-জনের কণ্ঠ, তিনি যেন তাদের প্রতিনিধি হয়ে লেখনী ধরলেন। শুধমাত্র তাঁর নিজের দেশের নয়, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠল তাঁর লেখনীতে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, এই একইভাবে একই ভাব ফুটে উঠেছিল পৃথিবীর আর একপ্রান্তের কৃষ্ণাঙ্গ লেখক ডেভিড ডিওপ-এর-লেখনীতে। তার 'আফ্রিকা' কবিতায় তিনি লিখলেন : আফ্রিকা। আমার আফ্রিকা / ঐ শোন কান পেতে শোন। / গম্ভীর-গর্জনে উন্মাদ ক্রোধ। / আফ্রিকা সরব সোচ্চার।[৬]

এরই পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার আর একজন তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ কবির কণ্ঠেও শোনা যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ। তরুণ কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজ লেখেন : কোসি সিকেলে আফ্রিকা / জাগো জাগো আফ্রিকা / আমাদের হাতে আজ ঠিকঠাক ধাতুর ব্যবহার, / মুঠোর ভেতরে দমবন্ধ গ্রেণেড, / ফাঁসিকাঠ, গুলি আর মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে / হুল্লোড, চড়ুইভাতি, ভালোবাসা— / কোসি সিকেলে আফ্রিকা......... ।[৭]

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে 'আফ্রিকা' কবিতার মধ্যদিয়েই খুঁজে পাওয়া যায় বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী কবিকে। নিজেকে যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে দিতে চাইলেন এ সমস্ত নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষজনের সঙ্গে। শ্বেত সভ্যতার ওপর যে শ্রদ্ধা নিয়ে কবি জীবন শুরু করেছিলেন, জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে তিনি সে শ্রদ্ধা

হারিয়ে ফেলেন। বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসের দিকে তাঁর মানসিকতার ক্রম-বিবর্তন ঘটে। তার জীবনের শেষ জন্মদিনে, ১৩৪৮-এ প্রকাশিত 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে তাঁর সেই ভেঙে পড়া বিশ্বাসের ছবিই ফুটে ওঠে : 'এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়াণী মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা—অভিমাণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি'।[৮]

রবীন্দ্রনাথের লেখনী বহুধারায় বহুদিকে প্রসারিত। নানান কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডার। নানান ধারায় প্রবাহিত রবীন্দ্রসাহিত্যের শুরু হয়েছিল প্রেম-প্রকৃতির সমন্বয়ের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়কে সঙ্গে করে, কিন্তু ধীরে ধীরে কবির কাব্যে গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে অর্থাৎ সাহিত্যের প্রতিটি ধারাতেই বিষয়ের চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে বেশ স্পষ্টভাবেই।

আজ কৃষ্ণাঙ্গ দুনিয়ায় যে 'ব্ল্যাক কনসাসনেসের আন্দোলনের' রূপ দানা বেঁধে উঠেছে প্রবলভাবে, তার প্রথম ধাপে যে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে ছিলেন, তা তাঁর প্রকাশিত 'আফ্রিকা' সাক্ষ্য বহন করে। 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদীর নগ্নরূপ তুলে ধরে তার সমালোচনা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। তাই তো জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেও কবি যখনই উপলব্ধি করেছেন, তখনই তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। নিজেকে পুরোপুরি সংগ্রামী লেখক হিসেবে উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও তিনি তাঁর এ ঘাটতি খুব সহজভাবেই স্বীকার করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি।

সূত্র

১. পূর্ব-পশ্চিম / সমাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংকলন, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ : ৭৫।

২. রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, টেগোর রিসার্চ ইনসটিটিউস, কলিকাতা ১৯৭৭, পৃ : ১৮-১৯।

৩. রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, টেগোর রিসার্চ ইনসটিটিউট, কলিকাতা ১৯৭০। পৃ: ৩২।

৪. পূর্ব ও পশ্চিম, সমাজ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংকলিত গ্রন্থ / পৃ: ৮১।

৫. আফ্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ: ৭২০।

৬. মূলকবিতা 'Africa'র ভাবান্তর / অনুবাদ : নির্মল রায়।

৭. কোসি সিকেলে আফ্রিকা / বেঞ্জামিন মোলায়েজ-এর কবিতার বাংলা রূপান্তর / ভাষান্তর : অমিতাভ দাশগুপ্ত।

৮. সভ্যতার সংকট / রবীন্দ্ররচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৫।

মানস ভট্টাচার্য

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথ

১

সাম্রাজ্যবাদ কথাটির আক্ষরিক অর্থ সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেতন ভূমিকা গ্রহণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এক অর্থে বিংশ শতাব্দীতে সাম্রজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্য বাদের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বদলায়নি তার অন্তর চরিত্র। বিশ্ব সামাজিক অবস্থার পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে তাল রেখে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠিরাও পালটে ফেলেছে তাদের কর্মধারা। আগের মত সরাসরি রাজার ভূমিকায় না এসে দালাল শ্রেণীর হাতে সে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদেশী পুঁজিবাদীগোষ্ঠী নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ কথাটি খোলস ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছে উপনিবেশিকতাবাদ এবং ক্রমে ক্রমে সামাজিক সাম্রাজ্য বাদ নামে। নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিদেশী পুঁজিবাদীগোষ্ঠী তাদের পুরনো ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ শোষণের যন্ত্রটিকে কিন্তু একই ভাবে চালিয়ে আসছে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে, তার হাতছাড়া হতে বাধ্য করেছে উপনিবেশগুলিকে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার তথা-কথিত সাম্রাজ্যবাদী গৌরব হারালেও সে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আর একটু বিস্তৃতভাবে ধরলে জার্মান ও জাপানকেও বাদ দেয়া যায়না। খুব ধীরে হলেও জায়গা করে নিয়েছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। এদেরই নগ্নরূপ দেখতে পাওয়া গেছে ভিয়েতনামের মাটিতে। বেঁটে খাটো মানুষগুলিকে পিষে নিজেদের লাভের অংক ব্যাংকবন্দী করতে উদ্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবশ্য সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছে। এই চলে আসার কারণ হিসেবে কেবল মার্কিন সামরিক শক্তির অপচয়কে উল্লেখ করেন, তারা সম্ভবত আর একদিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে থাকেন। সে দিকটি হ'ল গণ প্রতিরোধ। ভিয়েতনামের মানুষগুলির গণ-প্রতিরোধ এবং গণ-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভেতরেই বুদ্ধিজীবী লেখক,

রাজনীতিবিদ, চিত্রকর সমেত সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের একই সময়ে গর্জে ওঠা—এদিকটিই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কলমের আঁচড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার স্বরূপ দেখে শংকিত হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। এ কেবল বিংশ-শতাব্দীর ইতিহাস নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীন গণতন্ত্রপ্রিয় বুদ্ধিজীবী ও লেখকসম্প্রদায় বার বার গর্জে উঠেছেন। তাঁদের কলমে বারবার মানবাত্মার চরম অপমান বোধকল্পে এগিয়ে এসেছে। অত্যাচার মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন কোন কিছুই তাঁদের পথরোধ করতে পারেনি। এরই প্রমাণ পাওয়া গেছে সেই ১৪৫৩ সালে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে যাকে রেনেসাঁর কাল বলা হয়, সে সময়েই দেখা গেছে শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরেরই ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ' এ জাতীয় কথাবার্তার উপরে ওঠে আসে যে কথাটি তা হল 'মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ আর সমাজ হ'ল বড় কথা। মানুষের প্রতি অপার ভালবাসার তাগিদেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে জীবনের অন্তিম ক্ষণটি পর্যন্ত লেখনী আর তাঁর অসুস্থ কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ হতে দেননি। তাইতো তাকে দেখি অক্সিজেন সিলিণ্ডার পাশে রেখে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে কলকাতার টাউন হলের বক্তৃতামঞ্চে। গল্পে, নাটকে, কবিতায়, গানের বিভিন্ন পংক্তিতে তিনি সাজিয়ে রেখে গেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শাণিত বাণ।

১৯১৪ সালে পৃথিবী রক্তস্নাতা হবার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ অর্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত যুবক। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর বয়েস আঠাত্তর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ফ্রান্স, ইটালি ও জার্মানী গেছেন। সম্মানের প্রসঙ্গ থাক্। ফ্যাসিবাদের স্রষ্টা সাংবাদিক মুসোলিনীর নিজস্ব পত্রিকা 'পপোলোডিটালিয়া'।[১] রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করে। অথচ রবীন্দ্রনাথই মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানী' প্রবন্ধের লেখক জার্মানীর কাউণ্ট কাইজার লিং-ও তাঁকে যথেচ্ছভাবে সমালোচনা করেছিলেন। এটা ঠিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে

মুসোলিনীর ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কবির সেই প্রশংসাধ্বনী জার্মানী তার দেশের হয়ে বিজ্ঞাপণের কাজেও লাগিয়েছিল স্বৈরতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে জার্মানী আত্মপ্রকাশ করার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জার্মানীতে প্রকাশিত হয়নি। এর পরই কবি গেলেন সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯৩০-এ রাশিয়ার চিঠিতে লিখলেন: 'রাশিয়ায় না গেলে তাঁর এ জীবনের তীর্থ দর্শন সম্ভব হোত না'। কবির এই মনোভঙ্গির সংগে সামঞ্জস্য রেখে ইউরোপে ফ্যাসিজমের বিস্তারে রোমা রলাঁ, আইনস্টাইন, গোর্কি, আনতোল ফ্রাঁস, স্তেপানজইগ, সিনক্লেয়ার প্রমুখেরা যেমন পারীতে গঠন করলেন ফ্যাসি-বিরোধী গোষ্ঠী, ঠিক সেরকম রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসিবিরোধী সংঘের ভারতীয় শাখার সভাপতি হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ যেখানেই দেখেছেন নরপশুর হাতে অত্যাচারিত মানুষকে, সেখানেই তাঁর লেখনী আর কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 'নৈবেদ্য'র যুগে কবি লিখলেন: শক্তি দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন / দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন। / দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শ বিষ তার / শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার। সাম্রাজ্যবাদীদের পদচারণার কুসুমকে পদদলিত করার আহ্বান জানিয়ে রবি লিখলেন: কোরনা, কোরনা লজ্জা, হে ভারতবাসী, / শক্তি মদমত্ত ওই বণিক বিশ্বাসী / ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে / শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্তি সৌম্যমুখে সরল জীবন খানি করিতে বহন। 'গান্ধারীর আবেদন' দুর্যোধনের মুখে সাম্রাজ্যবাদীদের দাপটের স্বরূপ দেখিয়েছেন কবি / 'বলাকা'-র যুগে আর এক ধাপ এগিয়ে লিখলেন: তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা / এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা। দেশের যুব সমাজকে নতুন স্বর্গদ্বারে পৌছনোর জন্য কবির আর্জি: 'নতুন উষার স্বর্ণদ্বার / খুলিতে বিলম্ব কত আর / ...রাত্রি আছে কিনা আছে; দিগন্ত ফেনায়ে ওঠে ঢেউ—/ তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী নতুন সমুদ্রতীরে দিতে হবে পাড়ি।' এর পরই কবি ইংরেজ প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ৩১ সালে হিজলী জেলে বর্বর ইংরেজের গুলি চালনার প্রতিবাদে 'প্রশ্ন' তে লিখলেন: 'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে / হেনেছে নিঃসহায়ে। 'প্রান্তিক'-এ তাঁর লেখনী গর্জে উঠল কঠোর ভাবে: 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত

নিঃশ্বাস'। দানব দমনে কালিংপং বসে কবি লিখলেন : 'ক্ষুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আমার দৃষ্টিহারা / শ্মশানের প্রান্তচর। কবি জানিয়েছিলেন : জীবনের আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়েগেল'। অত্যাচারিত মানবাত্মার কাতর ক্রন্দন কবির মরমে পৌছনোর সংগে কবির এই আত্মোপলব্ধি সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর তাঁর বৈরিতাই প্রকাশ করে। ইম্পিরিয়ালিজম সম্পর্কে কবি বলেন : 'যাহারা ইম্পীরিয়ালিজমের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র ও অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে মির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর নানা দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। ......নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কী নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই , কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।[১]

সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণনীতির বিরুদ্ধেও রবি কবি ছিলেন সোচ্চার। সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক হিসেবে ভারতবাসীকে ব্যবহার করার সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী দুর্বল আফ্রো-এশিয় দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামগুলিকে দমন করেছে ভারতে বসে এবং ভারতীয়দের সাহায্যে। এই অবস্থার প্রতিবাদে মুখর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে বলেছেন : 'ইম্পারিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহাতে খরচ জোগানো। সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রানদান করা, উষ্ণ প্রধান ও উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া।[৩] কবি সবচেয়ে আঘাত পেয়েছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহে নেমেছেন শুনে। ১৯১৪ সালে জরুরী অবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন বলবৎ ছিল বলে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেয়া কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই 'ঘোরতর অন্যায় ও পাপ কাজ' থেকে বিরত থাকার জন্য গান্ধীজীকে তিনি এণ্ড্রুজকে দিয়ে ২০ খানি চিঠি লিখিয়েছিলেন। শেষমেষ কবি প্রচণ্ড ক্ষোভ আর দুঃখের সংগে লিখেছিলেন :

Not very long ago, we said to our rulers,-'We are willing to sacrifice our people and to persuade our men to join in a battle abont whose merit they have not the least notion ; only in exchange, we ghall claim your favour'. It was pitifully, weak, it was a sinful. And now we must acknowledge our responsibility—to extent of our late effort at recruiting—for turning our men into mercenary horde, drenching the soil of Asia with brothers, blood for the sack of self aggraidisement of a people wallowing in the mire of imperialism.

'I am mightly glad that any reward was refused, or, at least what was flung to us was deemed in adequate.[8]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এ সময় মিশর তুরস্ক ও আরব দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভারতীয় সেনাদের পাঠানো আরম্ভ করে। কবি সে সময় ছিলেন আমেরিকায়। সেনা পাঠানোর সংবাদ শুনেই কবি সেখান থেকে এক বিবৃতিতে এর তীব্র-নিন্দা ও প্রতিবাদ করে লেখেন : 'The use of mercernary troops for utilitarian purposes in degrading to all parties concerned, and it grives my heart as an Indian to see members of the subject race, which has been deprived of its right to carry arms for its own self-protection, are being turned into fighting autonomues for the imperialistic aggran-disement of a nation whose possessions are already to burdensome for its moral integrity and physical strength'.[৫]

১৯২৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণ চীনে এক বৃটিশ অফিসারের নির্দেশে ভারতীয় শিখ সেনাবাহিনী নিরস্ত্র ছাত্রযুব ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি বর্ষণ করে। এই ঘটনা 'Shameen massacre' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এই ভয়াবহ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে কবি লিখলেন : 'চীনকে অপমানিত করবার ভার-প্রভুর জয়ে এরা গ্রহণ করেছে ; সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শুভ্র ধর্মের হাওয়ায় মানুষ। 'নিমকের' সহজ দাবি

যতদূর পৌঁছয় এরা সহজেই তাকে বহুদূর লঙ্ঘন করে যায়, তাতে আনন্দ পায় গর্ববোধ করে'।[৬]

চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক অভিযান সম্পর্কে কবির সঙ্গে ফরোয়ার্ড পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। কবি সেই সাক্ষাতকারে প্রশ্নোত্তরে বলেন : 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীর ভাবে ভেবেছি, তাছাড়া ওখানে যে নীতি চালানো হচ্ছে তার প্রতি আমার ধিক্কার ব্যক্ত করতে আমি কখনোও পিছপা হয়নি। চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান এক মানবিক অপরাধ এবং লজ্জার কথা এই যে ভারতকে এই খেলায় খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' চপলাবাবু কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইংরেজরা অজুহাত দিয়ে বলছে যে তারা প্রতিরোধের লড়াই লড়ছে, এ কথাকি আমরা গ্রহণ করতে পারি ?—উত্তরে কবি বলেছিলেন : 'It was the loonglish who took up the origioonal offensive and they should not now take shaler under the false cry of a defensive Compaign It is China that really on the defensive.' ইংরেজরা ভারতের কাছে সৈন্য সামগ্রী দাবি করে তার কারণ তারা একই সাম্রাজ্যভুক্ত। একথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ চপলাবাবুকে বলেছিলেন : হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি মনে কর সমদর্শিতা ও ন্যায় বিচারের ওপর এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে ? তুমি কি বিশ্বাস কর যে সেই সাম্রাজ্যের আমরা কোন প্রাণময় অংশ ?.........ফলটা দাঁড়াচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া যখন সমগ্র ব্রিটিশ সরকারকে তোয়াক্কা করছেনা, তখন আমরা সৈন্য সামগ্রী দিয়ে সাম্রাজ্যের সেবা করছি এবং জালিয়ানওয়ালা-বাগের পুরস্কার পাচ্ছি।' কবি পরিস্কার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : আমরা সকল ক্ষেত্রেই সেদেশে সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে'। এক্ষেত্রে আমরা মানবিকতার প্রশস্ত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াতে চাই। তাই আমরা অন্যান্য যে কোন দেশেই আমেদের সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদীদেব আগ্রা-সন নীতিতে বিষ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে কবি যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতি-রই বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে কবির জাপানী বন্ধু কবি নোগুচি-কে যে চিঠি দিয়েছেন সেখানেও একই সুর একই তাল বিদ্যমান। জাপান ও চীনকে একই কারণে অভিযুক্ত করার কথা জানলে কবি বন্ধু নোগুচিকে লিখলেন আক্রমণকারীরা যদি প্রথমে আক্রমণ হইতে প্রতি নিবৃত্ত না হয় তবে, আপনি

কি করিয়া বলেন, যে, আমি চিয়াং কাইশেক-কে আত্মরক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতে পারি ?

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে উনিশ বিশ শতকের যত যুদ্ধ সবই হয়েছে, সাম্রাজ্য প্রসার ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। এক পক্ষ শোষণ আর বর্বরের লড়াই চালাচ্ছে। অপরদল সেই বর্বরের শোষণ শাসনের প্রতিরোধের জন্য ধর্মযুদ্ধ চালাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির আক্রান্ত হবার ঘটনাকে কোন সময়ই এক আসনে বসাতে চাননি। অর্থাৎ প্যাসিফিষ্টদের মত অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে পরিচালিত হননি। রবীন্দ্রনাথের মতে যতদিন-না বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের 'সাম্রাজ্যবাদ' ত্যাগ করছে ততদিন পৃথিবীতে যথার্থ ও স্থায়ী শান্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র। ১৯৩৪ সালে ব্রাসেলস-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে কবির ভাষণে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ পরিহার না করা হলে যে বিশ্বশান্তি কেবল কথার কথা থাকবে তা পরিস্ফুট। কবি ঐ মহাসম্মেলনে বলেছিলেন, কেবলমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্তিকেই শান্তি না বলিয়া শান্তি অর্থ যদি ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে ন্যায় পরায়ণের শক্তির উপরেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দুর্বলজনের ক্লান্তির ওপর নহে।'

রবীন্দ্রনাথ ভেবেই নিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ চিরস্থায়ী হতে পারেনা। অন্যায় অত্যাচারের ইতিহাস কখনোই দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেনা। জীবনের বিদায় লগ্নে এসে ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কবির লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের ভবিষৎ নিয়ে। লিখলেন : 'আরবার সেই শূন্য তলে / আসিয়াছে দলে দলে / লৌহ বাঁধা পথে / অনল বিশ্বাসী রথে / প্রবল ইংরেজ, / বিকীর্ণ করেছে তার তেজ। / জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, / কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল / জানি তার পণ্যবহা সেনা / জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবেনা।

সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ চরিত্রের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল পরিস্কার। আজও বিশ্বে সাম্রাজ্যদীদের হিংস্র পদচিহ্ন নিকারাগুয়া, পাকিস্থান, আফ্রিকার মতো দেশগুলিতে সজীব ও সচল। বিশ্ব সাম্যবাদ যাতে তার পথ খুঁজে না পায় সে জন্য সে সক্রিয়। সক্রিয় তার গোয়েন্দা চক্র। তৃতীয় বিশ্বের ওপরে পুঁজিবাদী দুনিয়ার খবরদারির অন্ত নেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে ইচ্ছে

করে : 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে / পথ জুড়ে কি কবির লড়াই ? মরতে হবে। / লুটকরা ধন করে জড / কে হতে চাস সবার বড়, / এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে / নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় পড়তে হবে'।

টীকা-টিপ্পনী

১. পপোলোডিটালিয়া, ১৭ জুন, ১৯২৬।

২. ইম্পীরিয়ালিজম / রাজাপ্রজা

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সফলতার সদুপায়

৪. Modern Review, March 1921 p. 356

৫. Gandhi and Tagore Argue, p. 20

৬. প্রবাসী, অগ্রায়ণ ১৩৩১, পৃ : ২১৩-১৭ / শুদ্রধর্ম

অন্যসূত্র

(ক) রবীন্দ্র জীবনী (৩-৪ খণ্ড) : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

(খ) ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড) : নেপাল মজুমদার,

(গ) রবীন্দ্ররচনাবলী।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

যুদ্ধ ও শান্তি এবং রবীন্দ্রনাথ

'মনে রেখো, এখানে যে-বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হলো মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে।......অর্থসম্বল এদের সামান্য; বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট্ নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এই জন্য কোনমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ– সৈনিকবিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য্য। কেননা, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।'[১]

১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিখিত ও 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে সংকলিত ৪ সংখ্যক চিঠির এই উদ্ধৃতাংশের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করেন, তা হলেই পাঠক অনুভব করবেন যে, যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত শান্তিপ্রিয় নিৰ্ঝঞ্ঝাট 'অহিংসবাদী'-র অথবা তথাকথিত 'নিরপেক্ষ শান্তিকামী'-রই ছিল না।

১৯৩০ সালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর আংশিক ও প্রাথমিক রূপায়ণ দেখেই মুগ্ধ-অভিভূত রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিঃসংশয় হয়ে উঠছেন, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি থেকে এবং পরবর্তী রচনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ থেকে তা' অনুভব করা যায়।

কিন্তু, তিনি যদিও জানেন, সামরিক খাতে ব্যয় 'অনুৎপাদক' এবং সামরিক 'অনুৎপাদক বিভাগ' এবং দেখলেন, সেই বিভাগকেও 'সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয়' সোভিয়েতকে করতে হচ্ছে, তথাপি শান্তিকামী রবীন্দ্রনাথ একবারও

বললেন না যে, এই 'অপব্যয়' না করাই সোভিয়েতের কর্তব্য আর 'পেটের ভাত বিক্রি করে' যেখানে দেশগড়ারকাজ চালাতে হচ্ছে, সেখানে এই 'অপব্যয়টা' অন্যায়। বরং ঠিক উল্টোটাই বললেন দ্বিধা হীন ভাষায় লিখলেন যে, সামরিক বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের (সোভিয়েতের) পক্ষে অনিবার্য' ! 'কেননা' আমরা রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণের পুণরাবৃত্তি করছি,, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা ভরে তুলেছে।'[২]

১৯৩০ সালে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েতকে সর্বোতভাবে বেঁচে থাকতে হবে, পরিণামী বিকাশের দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হবে আর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সকলেই সোভিয়েতের শত্রুপক্ষ এবং তারা সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য 'সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায়-কানায় ভরে তুলেছে', সুতরাং সোভিয়েত চুপচাপ বসে ওঁ শান্তি-র ঔপনিষদিক মন্ত্রোচারণে তদ্গত থাকতে পারে না এবং তার সামরিক বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার জন্য সোভিয়েতের অপব্যয় অনিবার্য—রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ থেকেই যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে তাঁর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এক নজরেই পড়ে নেওয়া যায়।

তথাপি, যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যত্নসহকারে অনুধাবন-যোগ্য, কেননা, দীর্ঘায়ু রবীন্দ্রনাথ প্রায় ছেষট্টি বছর যাবত অসংখ্য রচনায় বিবিধ বিষয়ের মতোই যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে গেছেন।

কোন-কোন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকেই একমাত্র গণ্য করলে চলবে না, সমস্তটা জড়িয়ে তাঁর ধারাবাহিক মূল প্রত্যয় এবং তার পটভূমি ও বিশ্লেষণকে সুবিন্যস্ত করে দেখতে হবে। শুধু কবিতা বা প্রবন্ধেই নয়, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, গানে সর্বত্র তাঁর অভিমত সবসময়ে সোচ্চারও নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে-তাৎপর্যে নিহিত। তাঁর সামগ্রিক মনোভাবকে বুঝে নেওয়া ও সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করা পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সময় ও মনসংযোগ দাবি করে। সে-কাজ যোগ্যতর ব্যক্তি বা অবকাশের জন্য গচ্ছিত রেখে আপাতত এই খসড়া-সদৃশ ক্ষুদ্রনিবন্ধের সূচনাপর্বেই নিবেদন করা যেতে পারে, রামমোহন, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাধ্যমে উপনিষদের, ভারতীয় দর্শন ও জীবনাদর্শের প্রভাব ও প্রেরণাই

রবীন্দ্রজীবনে একমাত্র নয়, শুধু জাতীয় জীবনেরও নয়, সতেরো বছর পাঁচ মাস বয়সে প্রথম ইংল্যাণ্ড যাত্রা থেকে আরম্ভ করে সারাজীবনের বিশ্বপরিক্রমার, বিশেষত ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-লাভজনিত দায়বদ্ধতার ফলেও রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা বিশ্বতোমুখী, ব্যাপক ও সর্বজনীন তাৎপর্য লাভ করে।

আর তাই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে ছিলেন বললেই সবটা বলা হয় না। 'অহিংসা পরম ধর্ম-'গোছের কোনো নির্ঝঞ্ঝাট নামাবলী তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলেই যুদ্ধ ও শান্তি প্র... ...ীন্দ্রনাথের বিচারনিষ্ঠ মতামতের হদিশ মিলবে না। যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ক্রমবিকাশের বৃত্তান্ত অনুধাবনযোগ্য।

পরাধীন দেশের কবি কিশোর বয়সেই পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেছিলেন, তীব্র হয়েছিল তাঁর স্বাধীনতা-কামনা। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই চৈত্র মেলায় দাঁড়িয়ে তিনি যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন, সেই কবিতাতেই তাঁর দীপ্ত স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।—সেটা ছিল তাঁর দেশকাল ও প্রগতিশীল পারিবারিক পরিবেশের ফল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকের 'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ' সমাপ্তি-সঙ্গীত রচনার মাধ্যমেও তাঁর কৈশোরক স্বদেশানুরাগের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

আরো অনেক দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর জাতীয় মুক্তিকামনার পরিচয় পাওয়া যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন রামমোহনের প্রভাব ও প্রেরণা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ মানসিকতা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রামমোহন পৃথিবীর যে কোনো পরাধীন দেশ বা জাতির মুক্তিসংগ্রামে বিজয় অর্জিত হলে আনন্দে অধীর ও সোচ্চার হয়ে উঠতেন। রামমোহনের আন্তর্জাতিক সচেতনতা রবীন্দ্রনাথকেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তরুণ বয়সেই আগ্রহী করে তুলেছিল। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে, এক্ষেত্রেও রামমোহনই তাঁর প্রেরণা। এই কারণেই, সংকীর্ণ জাত্যাভিমান রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণাকে কখনো স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ

করতে পারেনি। কল্পনা-নৈবেদ্য যুগের প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী উচ্ছ্বাস সাময়িক। 'গোরা'র উদার-মুক্ত ভারতবোধেই তার পরিণতি।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে (১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৮৮১, জুন) লেখা 'চীনে মরণের ব্যবসায় প্রবন্ধেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের বিরুদ্ধেই সোচ্চার নন' তিনি চীন দেশে নারকীয় বীভৎস্য ও তাণ্ডব পীড়নের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখোশ ছিন্নভিন্ন করেছেন, পাশব শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনসাধরণের ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে নিজের ক্রোধ ও ঘৃণাকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

ব্যবসার মাধ্যমে শোষণ ও অর্থসঞ্চয় এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে একসূত্রে গ্রথিত বলে কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, তার কিছু নিদর্শন তাঁর ঐ লেখা থেকে দেওয়া যায়ঃ একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল, এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি অহিফেন খাইব না'। ইংরাজ বণিক কহিল, সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে, তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছে।··· অর্থ সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায় তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে।······এশিয়ার একটি বৃহত্তম প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষস্থলে বসিয়া কীটের ন্যায় তাহাব শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছে। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংস বিক্রয় করিয়া, কিছু কিছু লাভ করিতেছে।

·…অবশেষে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল।··· · বিদেশীয়েরা উপর্য্যপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে লোহিত কেশ বিদেশীদের একেবারে বিনাশ করিতে তাহারা কল্পনা করিল।

··· পুনর্বার চীনাদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। এবারে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিল।··· চীনেরা বলে যে সহজে চীনদেশ জয় করিবা

অভিপ্রায়ে ধূর্ত ইংরাজরা অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে। এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে।[৩]

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবসাবাণিজ্যভিত্তিক শোষণ, বিশেষভাবে এখানে আফিমের ব্যবসার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে শুধু আফিমের নিষ্ঠুর ব্যবসাই চালাত না, ধর্মকেও ব্যবহার করতো তারই পাশাপাশি আফিমের মতোই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কুড়ি বৎসর বয়সেই তা লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই, উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকেও যে কীভাবে ব্যবহার করা হয়, এই প্রবন্ধে ('চীনে মরণের ব্যবসায়') রবীন্দ্রনাথ তারও উল্লেখ করেছেন, এখন থেকে একশত এক বছর আগে: 'পাদ্রীদিগের ধর্মোপদেশ শুনিলে চীনবাসীদের গা জ্বলিয়া যায়। জ্বলিবার কথাই তো বটে। একবার একজন আমেরিকান পাদ্রী কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সেখানে একদল লোক জুটিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়। তাহারা আমেরিকান পাদ্রীকে বলে তোমরা...... আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে আর আজ আমাদের ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ'।[৪]

অহিফেনরূপ ঘুমপাডানি ওষুধে চীনাজাতিকে ইংরাজেরা অচেতন করে রাখতে চেয়েছিল কেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তার বিশ্লেষণ পাই— 'কুম্ভকর্ণের ন্যায় চীনের যদি একবার নিদ্রাভঙ্গ হয় (চীনের জনসাধারণ যদি জাগ্রত হয়), এশিয়ার কোনো জাতিই তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না'। কুড়ি বৎসর বয়সে এই প্রবন্ধ লিখবার মাত্র চার বছর পরে প্রায় বছর দশেকের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুরবাড়ির জমিজমা দেয়ার কাজে গ্রামবাঙলায় কাটাতে হয়। গ্রামবাঙলায় এসে স্বদেশের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার যথার্থ পরিচয় পেলেন রবীন্দ্রনাথ। জনসাধারণ সচেতন না হলে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়, তাই জনশিক্ষাই প্রথম কাজ, এ নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখলেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজের উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপও তিনি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরলেন। বিদেশী ভাষা কী ভাবে জনশিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা রচনার কাজে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা-ও উদ্‌ঘাটিত করলেন।

পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। গানে-কবিতায় বক্তৃতায়-সংগঠনে। ক'বছর পরে ঘনিয়ে এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। তার আগে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ থেকে ফিরেছেন। মহাযুদ্ধের মতো একটা বিধ্বংসী কাণ্ড যে আসন্ন, তখন সে কথা অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনুভব করেছিল। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তাঁকে বলেছিলেন 'তোমার কাছে এই সংবাদ (যুদ্ধের সংবাদ) যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সীমাহীন লোভের ফলে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, একটা সর্বনাশা যুদ্ধ আসন্ন।

তাই, রবীন্দ্রনাথের 'বলকা'র কিছু কবিতায়, প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই, মহাযুদ্ধের আভাস প্রতিফলিত হয়েছে।

যেমন বলাকার ২-সংখ্যক কবিতা: এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। / বেদনায় যে বান ডেকেছে / রোদনে যায় ভেসে গো। / রক্তমেঘে ঝিলিক মারে, / বজ্র বাজে গহন-পারে, / কোন, পাগল ওই বারে বারে / উঠছে অট্টহেসে গো। / এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন: যুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে।' রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছিলেন: 'আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতিই নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানুষের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীতরাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা এখানে আমাদের অনুভব করতে হবে। যুদ্ধ ও শান্তির প্রসঙ্গে তথাকথিত 'অহিংসাবাদী'র নিরপেক্ষ শান্তিকামনা"-র দুর্বলতা তাঁর ছিলনা। প্রথম মহাযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বনাশ' হিসেবেই দেখেছিলেন কিন্তু সে সর্বনাশ ছিল তাঁর মতে 'অনিবার্য'—তা ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতেই তিনি এও বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা 'বৃহৎ রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন'—তিনি কি 'বৃহৎ রক্তাভ অরুণোদয়' বলতে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকেই বোঝান নি? যুদ্ধের দু'মাস আগে লিখেছিলেন 'শঙ্খ' কবিতায়: যৌবনেরই পরশমণি / করাও তব

স্পর্শ। / দীপকতানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ / নিশার বক্ষবিদার ক'রে / উদ্বোধনে গগন ভরে / অন্ধ দিকে দিগন্তরে / জাগাও না আতংক। / দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয়শঙ্খ।

লিখেছিলেন : এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে / পরাও রণসজ্জা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় রবীন্দ্রনাথের কোনো দ্বিধা ছিল না। 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা'—প্রয়োজনে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার আহ্বানে তাই তিনি অকুণ্ঠিত।

এই কবিতার ভাষ্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজেই লিখেছিলেন : এই কবিতা ('শঙ্খ' কবিতা) যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দুমাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে, ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে-যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটি সর্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহন পর্ব এখনো আরম্ভ হয়নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘর-ছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘর-ছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে-কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁছেছে। রোমা রলাঁ, বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ এই দলের লোক। এঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলে অপমানিত হয়েছেন। জেল খেটেছেন। সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছেন। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হ'তে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এঁরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন।[৫]

যুদ্ধের বিরুদ্ধে রোমা রোলাঁ, বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীর উল্লেখ এখানে লক্ষণীয়।

সাধারণভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা সম্পর্কে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেই মূল্যায়ন যে কতটা জরুরি ও আজকের পটভূমিকায় শিক্ষনীয়, তা এই

সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেও স্পষ্ট হবে। এই যুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রগতিশীল যুদ্ধবিরোধী শক্তির সঙ্গেই নিজেকে কীভাবে সামিল করেছিলেন, সেটাও তাঁরই ভাষায় শোনা যেতে পারে, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব যে ক্রমশ স্থায়ী ও পরিণত রূপ পেয়েছিল এ-ও তাঁরই কথা : 'বলাকা রচনাকালে (অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে) যে-ভাবে আমাকে উৎকণ্ঠীত করেছিল, এখনও সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে-চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সেই ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানেনি। বলাকায় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : 'বহু যুগ হতে জমি' বায়কোণে আজিকে ঘনায় / ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় / লোভীর নিষ্ঠুর লোভ বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, / জাতি—অভিমান...... '

তাই, কবি এই যুদ্ধকে অনিবার্য অনুভব করেছেন : 'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, / নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ'।

কেননা কবির আশা, এই যুদ্ধের শেষে নতুন সৃষ্টির উপকূলে মানবজাতি পৌঁছতে পারবে : 'শুধু একমনে হও পার / এ প্রলয় পারাবার / নূতন সৃষ্টির উপকূলে / নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।'

'নূতন সৃষ্টির' সম্ভাবনা না থাকলে, নূতন বিজয়ধ্বজা উড্ডীন না হলে : 'তবে ঘরছাড়া সবে / অন্তরের কী আশ্বাস রবে / মরিতে ছুটিছে শত শত / প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো। / বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা / এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ? / স্বর্গ কি হবে না কেনা। / বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না / এত ঋণ ? / রাত্রির তপস্যা সে কি আসিবে না দিন ?'

অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, যুদ্ধ ন্যায়ও হতে পারে, অন্যায়ও হতে পারে। পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অন্যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী পশুশক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের আত্মরক্ষার যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন অন্যায় দেখেননি। 'বীরের রক্তস্রোত' 'মাতার অশ্রুধারা' সাধারণ মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও দুঃখবরণকে রবীন্দ্রনাথ কবিজনোচিত ভাষায় বলেছেন 'রাত্রির তপস্যা'। প্রশ্নচ্ছলে উত্তর দিয়েছেন 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?'

পৌষ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে) অর্থাৎ মহাযুদ্ধকালে মহাযুদ্ধের কারণ নির্ণয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে : 'সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পতন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিচক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গন্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে'।[৬] ব্যবসাবাণিজ্য যে সাম্রাজ্যবাদের ছল ও উপলক্ষ হিসেবে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ, তা উল্লেখযোগ্য। ব্যাখ্যা করে আরো লিখলেন : 'এক সময়ে জিনিস ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কি তাহা বুঝিয়ে দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব, রাজা সেখানেই জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

'কিন্তু এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহের দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুটা দেশ সমুদ্রের দুই পারে।'

'এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না।'

'য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।'[৭]

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নতুন চেহারা ও চরিত্রের চাতুরি রবীন্দ্রনাথ এভাবেই স্পষ্ট করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গেই একই প্রবন্ধে [illegible]
'এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের [illegible]
কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জার্মানির [illegible]
প্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার, যারা প্রবল তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজে গায়ের জোরই যথেষ্ট।'

'আজ ক্ষুধিত জার্মানির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ (অর্থাৎ শোষক ও শোষিত, দুইটি শ্রেণী বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ) আছে। প্রভু (অর্থাৎ শোষক) সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস (অর্থাৎ শোষিত) সমস্তই প্রভুর জন্য যোগাইবে—যার জোর আছে রথ হাকাইবে, যার জোর নাই, সে পথ করিয়া দিবে।'[৮]

এখানেই থামলেন না রবীন্দ্রনাথ, আরো লিখলেন : 'য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির (অর্থাৎ শোষণ নীতির) প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।'

'আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জার্মান পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে'।[৯]

১৯১৭ সালে লেখা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির ঐতিহ্য ও স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও 'আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রের কুবের দেবতার চরগুলির যে সকল কুকীর্তির' ফিরিস্তি দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিকতা সাতষট্টি বছরের ব্যবধানেও সমান আছে এটাই দুর্ভাগ্যজনক : 'কর্তৃপক্ষদের (সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে) একথাও স্মরণ করাইতে পারি যে আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটরগাড়ি চালাইতেছ, কিন্তু এক দিন রাস্তা থাকিতে যখন গরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইত না। পার্লামেণ্টে বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষাঘাস, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া-হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালার স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত। আর, গলদের কথা যদি বলো, কবেকার কথা যদি বলো, কবেকার সেই আয়ার্ল্যাণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বুয়র যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায়,

ভারত- বিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোট নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই।'[১০]

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত লোভের থাবা এবং দুনিয়া জুড়ে ত্রাস সঞ্চারের অপচেষ্টা আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ কালেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন: 'আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যেসব কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেয়সের নির্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক প্রাধান্যের যে-অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়।'

প্রথম মহাযুদ্ধকালে ১৯১৭ সালেই রবীন্দ্রনাথ মার্কিনী রাষ্ট্রতন্ত্রের কুবের দেবতার চরগুলির কুকীর্তি দেখে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার প্রকাশ ক'র ছিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতেই (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) তিনি কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একটি চিঠিতে ফ্যাসিস্ত দানবের উত্থানের মূলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীকেই দায়ী করেছিলেন: 'দেখলুম দূরে বসে ব্যাথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগলো, জাপানের করাল দংষ্ট্রাশক্তির দ্বারা চীনকে থাবলে থাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করলো যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম, ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখলো, মৈত্রীর নামে সাহায্য করলো জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইনটারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম, মিউনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ঈমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে।'[১১]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তির' চেয়েও বড় বিপদ ছিল ফ্যাসিজম নাৎসিজম। প্রধান ও আশু শত্রুর বিনাশ ঘটাতে হবে, অবশিষ্ট সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সমবেদনা ও শুভেচ্ছা ছিল চীনের

প্রভি—প্রধান ও আশু শত্রু ফ্যাসিবাদের ধ্বংস চাইলে ইঙ্গ-ফরাসীদের জয়-কামনা অনিবার্য হয়ে ওঠে: 'এই যুদ্ধে ইংলণ্ড-ফ্রান্স জয়ী হোক, একান্তমনে এই কামনা করি। কেননা, মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নৎসিজমের কলংক-প্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা, সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে, সামর্থ আছে; আর সহায়শূন্য কেবল চীন লড়ছে প্রায় শূন্যহাতে, কেবল তার নির্ভীকবীর্যে ভর করে।'

বছর ছয়েক আগেই ১৯৩৩ সালে (শ্রাবণ, ১৩৪০) লিখিত 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সঙ্গে—উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসিত ভূমিকা তাঁর ভাষায়: 'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগানোর জন্য। [তুলনীয় 'The profound hypocrisy and inherent barbarism of bourgeois civilization lies unveiled before our eyes, turning from its home, where it assums respectable forms, to the colonies, where it gose naked'.—K. Marx. বুর্জোয়া সভ্যতার দারুণ শঠতা ও নিগূঢ় বর্বরতা আমাদের চোখের সামনে অনাবৃত। সেটা কিন্তু ওদের স্বদেশের বাইরে। বুর্জোয়া সভ্যতার চেহারাটা স্বদেশে বেশ ভদ্ররকমের কিন্তু উপনিবেশ-গুলিতে তা নগ্ন হয়ে যায়। The Future Results of the British Rule In India. July 22, 1853] তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হলো চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনদিন কোথাও হয়নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিস্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল, তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মত এতবড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল।[১]

শুধু চীনের নয়, রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকপটে মূল্যায়ন করেছেন বুর্জোয়া সভ্যতার: 'একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য

য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের অদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্ব সচীব শুস্টারের 'স্ট্যাংলিং অব পারসিয়া' বইখানা পড়লে।'

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার মর্মবাণীর সঙ্গে নিম্নোক্ত অংশ মিলিয়ে নেওয়া যায়: 'ওদিকে আফ্রিকার কনগো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল, সে সকলেরই জানা।'

শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে লাঞ্ছিত আফ্রিকার কথা প্রবন্ধকারে লিখেছিলেন, আর সাড়ে তিন বছর পরে লিখলেন 'আফ্রিকা' কবিতা (২৮ মাঘ ১৩৪৩), ইটালি কর্তৃক আবিসীনিয়া অধিকার সেই কবিতা রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল বুর্জোয়া সভ্যতার সীমাহীন উপনিবেশিক বর্বরতার আগ্নেয় কাব্যরূপ: 'এল ওরা হাতকড়ি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে, / এল মানুষ ধরার দল / গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে। / সভ্যের বর্বর লোভ / নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা'।[১৩]

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ খোদ আমেরিকায় কালো মানুষের পতি বুর্জোয়া শ্বেত-চর্মীদের নৃশংস অত্যাচারের কথাও পূর্বোক্ত 'কালান্তর' প্রবন্ধেই উল্লেখ করলেন: 'আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোন হতভাগ্যকে যখন জীবত অবস্থায় দাহ করা হয় তখন শ্বেতচর্মী নর-নারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ভিড় করে আসে।'[১৪]

'কালান্তর' প্রবন্ধেই পুনরায় এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস নিদারুণতার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন: 'তার পর মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি'।[১৫]

বুর্জোয়া সভ্যতার বর্বর লোভ ও নৃশংসতা কীভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে ক্রমশ, সেই চিত্র তুলে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ: 'সভ্য য়ুরোরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লংঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়ারল্যাণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা

তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে য়ুরোপের এক দিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম এর নির্বিচার নিদারুণতা।'

এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে য়ুরোপীয় নৃশংসতার পাশাপাশি আমেরিকার মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের লাঞ্ছনার কথাও রবীন্দ্রনাথ সবসময়েই উল্লেখ করে যাচ্ছেন। সেই ১৯৩৩ সালেই লিখছেন: 'এক দিন জেনেছিলুম, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।'

এই প্রসঙ্গেই যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যুদ্ধবিরোধী রবীন্দ্রনাথ: 'So after the war I was sent to Guiana······Condemned to fifteen years' penal sarvitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains alwys the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health', young, vigorous, one leaves (if one leavss), weakly, old, ill··· · One arrives in Guiana honest—a few months later one is corrupted·········They (tho transportees) are an easy prey to all the mafadies of ,this land—fever, dysen tery, tuberculosis and most terriblo of ,all, leprosy.[১৬] অর্থাৎ যুদ্ধের পরে আমাকে গায়েনায় চালান করে দেওয়া হলো। পনের বছরের গোলামির দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় বিষের পাত্রটি তলানি পর্যন্ত আমাকে শুষে নিতে হয়েছে। কিন্তু গোলামির দণ্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সবসময়েই আনুষঙ্গিক শাস্তি কিছু থেকেই যায়—যাবজ্জীবন নির্বাসন। গায়েনায় স্বাস্থ্যবান, তরুণ ও শৌর্যময় যে এসে পৌঁছায়, সে যখন গায়েনা ছেড়ে যায় (যদি তা আদৌ সম্ভব হয়) তখন সে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, অসুস্থ······সৎ যে আসে, গায়েনায় ক'মাসের মধ্যেই সে হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত······যারা এখানে চালান হয়ে আসে, তারা এখানকার ব্যাধিগুলোর শিকার হয়ে যায় সহজেই—জ্বর, রক্তমাশয়, যক্ষ্মা এবং সর্বাধিক মারাত্মক যা'—কুষ্ঠ।'

রাজনৈতিক মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছিল, সে ছিল দুঃসহ নরকবাস, একথাও উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে—'য়ুরোপীয় সভ্যতা' যে সব দেশে উজ্জ্বলতম অর্থাৎ পূর্ণ বিকশিত সেই সব দেশেই অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ইউরোপে, আমেরিকায়, ইটালিতে, জার্মানিতে (রবীন্দ্রনাথ এগুলির উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে) 'সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো-টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে' গ্রাস করছে, তাঁর ভাষায় 'যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা……আজ · নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদঘাটিত' হচ্ছে। আজ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া পারমাণবিক মহাযুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত বিশ্বশান্তির পক্ষে ক্রমশ সংগঠিত ও সংহত হচ্ছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ছ'বছর আগে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যুদ্ধাতংকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছিলেন, এবং কী বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, সেকথা জেনে রাখা জরুরী—শুধু তাই নয়, একথাও ভুললে চলবে না যে, 'য়ুরোপীয় সভ্যতার উন্মত্ত দানবিকতা ও বর্বর নির্দয়তা' বলতে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতরূপে পুঁজিবাদী সভ্যতাকেই বুঝিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী সভ্যতারই স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

না হলে 'সভ্যতা' কী করে 'উন্মত্ত দানবিক' বা 'বর্বর নির্দয়' হতে পারে? সামগ্রিকভাবে ইউরোপে, আমেরিকায় ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও ইটালিতে কোন্ 'য়ুরোপীয় সভ্যতা' 'উজ্জ্বলতম আলোক' ছড়িয়েছিল? রবীন্দ্রনাথ যে 'বুর্জোয়া সভ্যতার' তথা 'পুঁজিবাদী সভ্যতার'ই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন নিপুণভাবে, নিঃসংশয়িতরূপেই স্পষ্ট।

আর এখানেই, রবীন্দ্র-মানসিকতায় একটি জটিল গ্রন্থির হদিশ পাওয়া যায়।

বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে স্থিতধী থাকলে পাঠক-সমালোচককে এই সত্য অনুভব করতেই হয় যে, যে-বুর্জোয়া সভ্যতার 'উন্মত্ত দানবিকতা' ও 'বর্বর নির্দয়তা' দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত, অস্থির ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ এবং এমন কি প্রতিবাদে ও মনে-মনে বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছেন; সেই 'সভ্যতা'-রই কাছে তাঁর নিজের ও মানবসমাজের গভীর ও ব্যাপক ঋণের অপরিমেয়তাও তিনি ভুলতে পারেন না।

ঐ পুঁজিবাদী সভ্যতা, 'সাম্রাজ্যিক সভ্যতা সমাজের বিকাশের ইতিহাসের একটি পর্ব বা অধ্যায় মাত্র নয়, দাস সমাজ ও তৎপরবর্তী সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থারও পরবর্তী উন্নততর পর্যায় বলেই পুঁজিবাদী সভ্যতার ইতিবাচক অগ্রগামিত্বের দিকও নিশ্চিতরূপেই বর্তমান।

যে-যুগে রবীন্দ্রনাথ জাত, লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন, সেই যুগে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এইরকম দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন তাঁকে অনিবার্য-ভাবেই হতে হয়েছে।

পুঁজিবাদী সভ্যতা, সাম্রাজ্যিক সভ্যতা, মানবসমাজকে যে নৈরাশ্য ও নির্দয়তার মধ্যেই নিক্ষিপ্ত করবে, এ-ও যেমন অনিবার্য, তেমনি তারপরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের জন্ম, বিকাশ ও পরিনতিও অনিবার্য' ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে ক্রমান্বয়িক সমাজ বিশ্লেষণ করলেই তা দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিশেষতঃ ১৯৩০ সালে সোভিয়েত ভ্রমণের সময়ে তিনি তাঁর সচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুণে সেই প্রত্যয়ের খুব কাছাকাছি প্রায়শঃ উপনীত হতে পেরেছেন, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ অনুচিত হবে কিন্তু সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বতস্ফূর্ত ভাববাদী প্রত্যয়ের প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং আলোচ্য 'কালান্তর' প্রবন্ধেও লিখেছেন : '......কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌছবে আজ। মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?'[১৭]

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনিত অনুভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৩৩ সালেই লিখেছেন : 'কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি 'তুমি অশ্রদ্ধেয়', অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি, 'বিনিপাত' বলবারজন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়—এই তো সকল দুঃখের সকল ভয়ের উপরের কথা।'

বুর্জোয়া সভ্যতার সীমাহীন সর্বনাশা পরিণামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী দুঃখী ও অপমানিত মানুষের সান্ত্বনা তবে কোথায়? শুধু সান্ত্বনা নয়, মুক্তিও?

সেটা আত্ম-উদ্‌বোধনের মধ্যেই নিহিত। বুঝতে হবে, নির্ভীক হতে হবে-তা না হলে আর কোনো উপায়ই থাকবে না: 'যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব, এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হলো। তার পরে আসুক কল্লান্ত।'

চার বছর পরে ১৯৩৭ সালে, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষের ভাষণে 'প্রলয়ের সৃষ্টি' শিরোনামে যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর ভাববাদী প্রত্যয় সত্ত্বেও আরো প্রসারিত হয়েছে, স্পষ্টতা পেয়েছে: 'উদ্দাম নিষ্ঠুরতা আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলছে সমুদ্রের তীরে তীরে দৈত্যরা জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধ্যে যে অসুর এই কি সত্য?

'এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শান্তির প্রয়াস সে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি, এই দুঃখের দিনেও কত মহাপুরুষ দাঁড়িয়েছেন শান্তির বাণী নিয়ে—সেজন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। এঁদের সংখ্যা বেশী নয়, সাম্রাজ্যলুব্ধরা এঁদের হিংসা করে মারে—তবু এঁদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারে না। এখনো মানুষ বিপদকে স্বকার করেও দূর ভবিষ্যতের বাণীবহন করে চলেছে অকুতোভয়ে। সত্য এখানেই।'[১৮]

বাস্তব পরিস্থিতি, ঘটনাবলী ও ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য অসামান্য গভীর মানুষ ও মনুষ্যত্বে তাঁর প্রত্যয় অপরিমেয় হলেও সেই প্রত্যয় তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত। নিখাদ বস্তুবাদী নয়। তথাপি, এই প্রগাঢ় উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব স্বীকার্য: 'চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু আমাদের কি করবার আছে?... আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু একথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে, অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ—যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—একথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের

মেশিনগান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করবো।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক-কালে ও সমকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প -প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে অন্যান্য অনেক আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষতঃ ১৯৩০ সালে সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে রবীন্দ্রজীবনে ক্রমশ একটি উত্তরণ সম্ভব হচ্ছিল, নিষ্ঠা ও সততাপূর্ণ সন্ধান গভীর চিন্তাশীল একজন মানুষের জীবনে যে-উত্তরণ সম্ভব করে তুলতে পারে।

মৃত্যুর (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) মাস চারেক আগে লেখা (১ বৈশাখ ১৩৪৮) এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও বিশ্লেষণ আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক নয়। একটা ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্মোচনরূপেই তাকে দেখাটা বস্তুবাদী 'দর্শন' হবে। 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটি কৌতূহলী পাঠক যদি আরো একবার খুঁটিয়ে পড়ার শ্রম স্বীকার করেন, তাহলেই অনুভব করবেন—রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সরাসরি তুলনা করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে খারিজ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এতকাল যে দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিল, তারও কারণ হিসেবে 'জীবনের প্রথম আরম্ভে'-র প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন: 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।'[১৯]

কেউ তেমন খেয়াল করে দেখেন না যে, এই প্রবন্ধেই কিছুটা আগে সোভিয়েত অনুশীলিত ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে'।[২০]

অর্থাৎ দু'রকম 'সভ্যতা' প্রসঙ্গে সচেতন বিশ্লেষণ শেষে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষেই তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'তত্ত্ব' রূপে নয়, প্রয়োগ পরীক্ষার ফলাফল স্বচক্ষে দেখে।

তাই, সীমাহীন হতাশার মধ্যেও এই তাঁর পরিণামী উচ্চারণ: 'কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।......

মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের 'যুদ্ধ ও শান্তি এবং রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল (বর্ষ ১৭ // সংখ্যা ৪২ ৪৩॥২৮ বৈশাখ-৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ ॥ ১১ ১৮ মে ১৯৮৪)। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে অশুভশক্তি বিশ্বজুড়ে প্রকট হয়ে উঠেছে এবং তারই বিরুদ্ধে যখন বিশ্ববাসী সোচ্চার, তখন রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধ বিরোধিতা ও শান্তির অনাবিল আকাংখা একালের মানুষের কাছে শক্তি হয়ে দেখা দেবে। রবীন্দ্রনাথের মত যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একালের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বিজ্ঞানীরাও সোচ্চার হবেন, প্রবন্ধ লিখবেন, বক্তৃতা করবেন, এ ভরসা করা যায়। এই প্রবন্ধটি তাই সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

[সম্পাদক]

সূত্র—নির্দেশ

১. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৫২, • পৌষ, প্রথম প্রকাশ। পৃ: ২৮৬-২৮৭।

২. ঐ। ঐ।

৩. 'চীনে মরণের ব্যবসা' শিরোনামের প্রবন্ধ / ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮৮১।

৪. ঐ।

৫. কবি লিখিত বলাকা কাব্যের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

৬. লড়াইয়ের মূল, ১৯১৫ ইং, বাংলা ১৩২১, পৌষ।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৯১৭।

১১. কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির চিঠি, ১৯৩৯, সেপ্টেম্বর।

১২. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজী ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০, শ্রাবণ।

১৩. আফ্রিকা কবিতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. কালান্তর / রবীন্দ্রনাথ।

১৫. ঐ।

১৬. ফরাসী যুবক রেণে রেইমঁ-এর উক্তি:ক রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেন।

১৭. কালান্তর / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮. প্রলয়ের সৃষ্টি, ভাষণ, ইং ১৯৩৭, বাং ১৩৪৪, ৭ পৌষ।

১৯. সভ্যতার সংকট, ১৩৪৮, জৈষ্ঠ প্রকাশিত।

২০. ঐ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট/৩

রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ঘটনায় তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, কখনো লিখে, বিবৃতিতে, কখনো বা সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। সেই রবীন্দ্রনাথকে বিভাগ-উত্তর কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে রাজনীতির শিকার হতে হয়। সত্তর দশকে ভারতে জরুরী অবস্থার সময় খবরের কাগজ, বেতার ও দূরদর্শনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ-রোধ করা হয়েছিল, প্রকাশ বন্ধ হয়েছিল তাঁর প্রগতিবাদী বা জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা কিংবা গদ্য-ভাষা, গাইতে দেওয়া হয়নি তাঁর কতগুলো নির্বাচিত গান। অন্যদিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সরকারও জাতিগতশোষণের কারণে, বাঙালীর অস্তিত্ব নির্মূল করতে এবং সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে নস্যাৎ করতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার ষড়যন্ত্র করেছে, বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করেছে। রবীন্দ্র-নাথের কণ্ঠরোধী সেই স্মৃক ভঙ্গিটি বড়ই করুণ। প্রগতিশীল, এবং গণতান্ত্রিক মানুষ সরকারের সেই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, সেই চিত্রার্পিত দৃশ্যপটের পাশাপাশি সেই সময়কার শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির বর্ণনা এই অংশের মূল বিষয়বস্তু।

সেজান সেন

'জরুরী অবস্থা ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ

'সম্মুখে বসিয়া আছেন রবীন্দ্রঠাকুর।' রবীন্দ্রনাথের আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্মাতা ও মুকুটমণি, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ইতিহাস এবং আত্মার স্পন্দন। বিশ্বের দরবারে আমাদের চিত্তকে উন্মুক্ত করেছেন তিনি, আশা দিয়েছেন, ভাষা দিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন, এবং সর্বোপরি বিশ্বের দুয়ারে বাঙালী জাতিকে গর্ব ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিদিন কথায়, গানে, আলোচনা সভার ভাষণে রবীন্দ্রসাহিত্যের উদ্ধৃতি ছাড়া আমাদের মনের ভাবটুকু প্রকাশ করতে পারিনা। 'রবীন্দ্রনাথ' এই নামটিতেই আমরা সম্মোহিত। রবীন্দ্রনাথ একটি যুগ ও একটি ইতিহাস—বাঙালীর মনে এক মনন-বিপ্লব। রবীন্দ্র সাহিত্য যেন এক গ্রীক ক্লাসিক আর্ট। এর গাম্ভীর্য, বিশালতা ও ব্যাপকতা আমাদের স্তম্ভিত করে। এ-সব উপমা এবং আবেগমথিত বক্তব্য ফাঁকাবুলি নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাঁর কর্মময় বিশাল জীবনের কর্ম নৈপুণ্যের আলোকপাত থেকেই তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের মানুষ। পরাধীনতার তীব্র জ্বালা অহোরাত্র দগ্ধ করেছে তাঁর চিত্ত। তিনি শুধু ভারতের স্বাধীনতা ও সমস্যার কথাই ভাবেননি—সমগ্র বিশ্বের পরাধীন দেশের সমস্যার কথাই ভেবেছেন। বিশ্বমানবের সেবা ও কল্যাণ কামনায় সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গিত ও সমর্পিত।

আমাদের চেতনায়, ভাষায়, ভাবনায় অহরহ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সত্তার গভীরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালীর কোনো পরিচয় নেই। সামগ্রিক দৃষ্টিভংগীতে তিনি আমাদের ওংকার, আমাদের নিঃশ্বাস, আমাদের অভয়, আমাদের প্রাণ; আমাদের চেতনায়, ধমণীতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা। সর্বোপরি তিনি আমাদের বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড। ভাবতে অবাক লাগে এহেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্বের বৃহত্তম স্বাধীনোত্তর গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে স্বৈরাচারের শিকার হয়েছিলেন জরুরী অবস্থার

সময়। তখন রবীন্দ্রসাহিত্যের কণ্ঠরোধ এবং সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিলো।

প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোকমিত্র অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলেছেন : 'দু-দিন আগে যা অকল্পনীয়-অভাবনীয় ছিল, তাই ঘটছে আমাদের দেশে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বৈরাচারের শিকার হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপানো নিষিদ্ধ হয়েছে এ-দেশে, ফতোয়া জারি হয়েছে বেতারে। রবীন্দ্রনাথের অমুক অমুক গান গাওয়া চলবে না। রাষ্ট্রাদেশ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রাষ্ট্রাদেশ যেন বড়ো'।[১]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল আমাদের কাছে পবিত্র অধিকারের মত, পবিত্র অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন ও নিস্ফল। এর চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে ১৯৭৫-৭৬ সালের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার অন্ধকারময় দিনগুলিতে, যার কথা আজও আমরা ভুলতে পারিনি। জরুরী অবস্থা জারির দিন, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন থেকে ১৯৭৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'হাজার ছ'শ'রও বেশী সংবাদপত্রের স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রারের বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সংবাদে দেখা যায় যে ১৯৭৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের মোট ১৬৭২টি পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ২০৮, সাপ্তাহিক ১৪০৪ এবং দ্বি-সাপ্তাহিক ৩৬২ ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৫২৮। অর্থাৎ দৈনিক ও সাপ্তাহিকের সঙ্গে দ্বি-সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা যোগ দিলে সবসুদ্ধ ২৫২২-টি পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে পত্র-পত্রিকার বন্ধ হওয়ার মূল কারণ সেন্সর প্রথার অত্যাচার, সম্পাদক ও তাঁর সহকর্মীদের অহেতুক গ্রেপ্তার, সম্পাদক কর্তৃক সেন্সরের নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে অস্বীকৃতি এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্তকরণ। অধিকন্তু আপত্তিকর পুস্তিকা প্রকাশের অভিযোগে পুলিশ কয়েকটি প্রকাশনী ও প্রেসের ডিক্লারেশন বাতিল করে দিয়েছিল। জরুরী অবস্থা জারির পরে পরেই দিল্লী থেকে টেলিপ্রিন্টার যোগে ১৬ দফা গাইড লাইন এসে গেল বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে। কি ধরণের সংবাদ যাবে, কি যাবে না। তা নিয়েই ঐ নির্দেশিকা। সঙ্গে কিন্তু এই সতর্ক নির্দেশও ছিল যে এই গাইড লাইনের একটি কথাও প্রকাশ করা চলবে

না। গাইড লাইনের নির্দেশগুলো খতিয়ে দেখা যাক। তা থেকে অন্তত বোঝা যাবে তৎকালীন মনন-চর্চার জগত কি ভয়াবহ নিগড়ে বন্দী ছিল।

গাইড লাইনের তালিকা :

১. সংবাদ যদি আপত্তিকর মনে হয়, তবে সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করবেন না। যদি কোন ক্ষেত্রে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে নিকটবর্তী প্রেস এ্যাডভাইসারের পরামর্শ নেবেন।

২. প্রেস এ্যাডভাইসারের পরামর্শ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করবেন।

৩. যখন কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হবে তখন সেই সংবাদের উদ্ধৃতি সেই সংবাদের প্রসঙ্গ টেনে কিছু লেখা যাবে না। চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশের প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে—বিশেষ করে হেডিং-এর ব্যাপারে।

৪. কোন রকম গুজবকে সংবাদ করা চলবে না।

৫. যখন কোন ছবি বা দলিল সরকারীভাবে দেওয়া হবে, তার বর্ণনা বা চিত্র পরিচিতি যেমন লেখা থাকবে, যথাযথভাবে তেমন রাখতে হবে।

৬. কোন আপত্তিকর সংবাদ ভারতের বা বিদেশের কোন পত্রিকায় প্রকাশ হলেও এখানে তার প্রকাশ চলবে না।

৭. যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কে অ-সমর্থিত কোন সংবাদ, বিজ্ঞাপন অথবা চিত্রাংকন প্রকাশ করা চলবে না।

৮. যানবাহন বা যোগাযোগরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছুই প্রকাশ করা চলবে না।

৯. সশস্ত্রবাহিনী এবং সরকারী চাকুরেদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছুই প্রকাশযোগ্য নয়।

১০. আইনের দ্বারা গঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং সরকারের নিন্দাসূচক অথবা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা জাগাতে পারে এমন কিছুই প্রকাশ করা যাবে না।

১১. এমন কিছুই প্রকাশ করা চলবে না যাতে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী বা ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা জাগায় এবং ঘৃণা সৃষ্টি করে।

১২. ক্ষুব্ধ করতে পারে এমন পরিস্থিতি, অথবা প্ররোচনা সৃষ্টি করে—তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-রকমই হোক না কেন, তা প্রকাশ করা চলবে না।

১৩. জাতীয় সঞ্চয়প্রকল্প অথবা সরকারের ঋণপ্রকল্প সম্পর্কে সাধারণের আস্থা নষ্ট করে এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না।

১৪. ট্যাক্স ও খাজনা দিতে অস্বীকার অথবা অনাদায় রাখতে উৎসাহ যোগায় কিংবা প্ররোচনা দেয় এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না।

১৫. সরকারী চাকুরিয়াদের বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রকাশ করা চলবে না, যাহাতে তাদের অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা দেয়।

১৬. আপত্তিকর সংবাদ অর্থে বোঝা যাবে এমন সংবাদ, বিবৃতি, সংবাদচিত্র মন্তব্য যা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক যার দ্বারা অথবা যা প্রকাশ করলে অথবা যার দ্বারা প্ররোচনা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির বিরুদ্ধে।

উপরে বর্ণিত গাইড লাইনগুলি ছাড়াও আর একটি ৯ দফা জেনারেল গাইড লাইন দেয়া হয়েছিল সংবাদপত্র ও প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোকে কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার এই যে, সংবাদপত্রগুলিকে এমন আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধেও সরকার পক্ষ সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা এই মর্মে একটি অদ্ভুত সতর্কনামা জুড়ে দিলেন যে, সেন্সর করা হয়েছে এই অজুহাত চলবে না। কোন প্রকাশিত সংবাদ যদি আপত্তিকর হয়,তবে তার দায়িত্ব বর্তাবে সংবাদপত্রের ওপর। সেন্সর করা হয়েছে এই অজুহাত চলবে না। অর্থাৎ যে-সরকারী-কর্তা সেন্সর করেছেন, তিনি এর জন্য দায়ী হবেন না, দায়ী হবে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র। এর থেকে অনুমেয় কি ভয়ংকর পরিস্থিতি ছিল সেদিন।

এই রকম আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে বিনা সেন্সরে রবীন্দ্রনাথের কোন লাইন ছাপানো এবং আকাশবাণীতে ও দূরদর্শনে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের প্রচারও নিষিদ্ধ হয়েছিল। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সরকার হয়তো তখন ভেবেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান বাতিল করে না দিলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে এবং সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ ফেরানো যাবে না!

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতাকে শৃংখলিত করার বিষয়টি আমাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সংজ্ঞাকে স্তম্ভিত করে।

ডঃ অশোক মিত্রের বক্তব্যদিয়েই পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে: 'অপ-শাসন পর্ব শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথও শাসিত হলেন। কোন বিশেষ বিশেষ

রবীন্দ্রসংগীত 'আকাশবাণীতে' গাওয়া বারণ গেলো। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতাও সেইসঙ্গে পত্রপত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ হলো। এই সব গান গাওয়া হলে, ছেলে-মেয়েরা এই সব কবিতা পাঠ করলে, এখানে ওখানে বিদ্রোহী-বিদ্রোহী ভাব জাগতে পারে, 'আপৎকালীন' অবস্থার শ্মশানশান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ করা হলো, স্তব্ধ করা হলো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাগাড়ম্বর, মানে প্রধান মন্ত্রীই করলেন। অন্য অনেক রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার সঙ্গে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'ও জবাই হলো। ও-সব প্রার্থনা-টার্থনা বড়ো বিপজ্জনক জিনিস। সাধারণ লোকে কী থেকে কী মানে করে ফেলে, দরকার কী। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারীরা রাষ্ট্রদেশ বলে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'-এর সর্বত্র শিরশ্ছেদ করলেন।[২]

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার পর ২৮ জুন দিল্লীর Financial Express-এ সম্পাদকীয়র পরিবর্তে প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রার্থনা' কবিতাটি ইংরাজী অনুবাদে 'Song of the Day' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও যে স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে কত বিপজ্জনক তা তিনি বুঝতে পারলেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করে। স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীরা নিজেদের কথা বলবে না, রবীন্দ্রনাথের কথা ও গানের সাহায্যে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করবে তাই তদানীন্তন Chief Information Officer Dr. Baji-র নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রবীন্দ্রনাথ বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেন, রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ডিং করার ব্যাপারে কলকাতার আকাশবাণীতে চালু হ'ল সেন্সরশিপের রোলার।

যে কোন দেশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেখা গেছে মানুষ যখন বাক্ স্বাধীনতা হারায়, তখন নিজের কথা বলার জন্য বিশিষ্ট লেখকের রচনা ও গানের সাহায্য নেয়।

জরুরী অবস্থার কথা মনে রেখে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম আকাশবাণী, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিল্লী থেকে নির্দেশ পাঠানো হল: রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা প্রচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। একথা লজ্জার সঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, কোনো গানে 'আঁধার,' 'দুঃখ,' 'বেদনা' শব্দ থাকলেই সে গান শিল্পীকে সে সময় আকাশবাণীতে রেকর্ড করতে দেয়া হয়নি। দীর্ঘ উনিশ মাসের আপৎকালীন অবস্থায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে

রবীন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ গানের সংখ্যা অনেক। 'সীমান্ত'[৩] পত্রিকার সৌজন্যে ২৬টি গানের নাম উল্লেখ করা গেল :

১. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
২. আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
৩ আমায় বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে
৪. আমি ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না।
৫. আমরা নূতন যৌবনেরি দূত
৬ উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
৭. এ কি অন্ধকার, এ ভারতভূমি
৮. এবার দুঃখ আমার অসীম পাথর
৯. এখনও আঁধার রয়েছে হে নাথ
১০. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
১১. কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি
১২. জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
১৩. দুঃখের তিমির যদি জ্বলে
১৪. দুঃখের বেশে এসেছ বলে
১৫. দেশ দেশ নন্দিত করি
১৬. বড় বেদনার মত
১৭. বাঁধন ছেঁড়ায় সাধন হবে
১৮. বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই
১৯ বেদনা কি ভাষায় রে
২০. ভয় করব নারে
২১. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
২২. শোন শোন আমাদের ব্যথা
২৩. সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
২৪. হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি
২৫. এ পরবাসে রবে কে
২৬ আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন সে কি এমনি হবে।

রবীন্দ্রভক্তরা তাঁর নানা গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গান রেকর্ডিং এর

ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞা সকলে মেনে নেননি। রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী বাণীঠাকুরকে যে বর্ষার গানটি গাইতে দেয়া হয়নি, সেই গানটি কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ওপর শক্ত দেখে গান রেকর্ড করতে না দেয়ায় সাধারণ শিল্পীদের অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর এই জাতীয় অপমান সহজভাবে মেনে নিতে না পারায় আকাশবাণীর অনেক কর্মী ও কিছু অফিসার বদলি চেয়ে অন্য প্রদেশে চলে যান।

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতার লেখক ও শিল্পীদের একটি সভায় তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিত থাকাকালীন কবি অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের ওপর নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রতিবাদ করেই বিরত থাকেননি। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে যে ভালো পড়া নেই, সে-কথা বলতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের একটি লেখা সেন্সার প্রথা আপাতু করায় তিনি 'কাঁদো প্রিয় দেশ' নামে একটা বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ সে সময় কিভাবে করা হয়েছিল তার নিদর্শন স্বরূপ একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। সেই আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত একটি পত্রিকায়[৪] প্রকাশিত প্রবন্ধে ২২ জুলাইয়ের দৈনিক 'গার্ডিয়ান' থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। সে উদ্ধৃতিতে বলা হয়: With Political arrests running into several thousands and the Indian Press banned from quoting··· · Tagore.[৫]

সেনসারের যূপকাষ্ঠে যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী লেখক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সহজে মেনে নেননি। জরুরী অবস্থায় লেখক ও গায়কদের সংগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য সংগীতশিল্পী গীতা ঘটকের বাড়িতে পুলিশ বারবার হামলা করেছিল প্রতিবাদকারীদের আশ্রয়দেবার অভিযোগে। এ দৃষ্টান্তও আমাদের স্তম্ভিত করে।

ভাবতে অবাক লাগে জরুরী অবস্থায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ১২-৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজানোর প্রোগ্রাম সপ্তাহে ছয়দিন থেকে কমিয়ে তিন দিন করা হয়েছিল। আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রে দিনে আধঘন্টার

বাংলা গানের প্রোগ্রামও তুলে দেওয়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ গান পরিবেশিত হতে পারে এই আশঙ্কায়। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে আকাশবাণীতে রবীন্দ্র সংগীত ঠিকমত প্রচার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

একথা কারো অজানা নয় যে পত্র-পত্রিকায় ছাপোনোর আগে সমস্ত পাণ্ডুলিপিই সেনসারে পাঠাতে হত জরুরী অবস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী। সেনসারের কাজের মানদণ্ড যে কি ধরণের ছিল তার একটি নমুনা নিম্নলিখিত কবিতাটি স্মরণীয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। পুরো কবিতাটি বাতিল হয়েছিল : 'রবীন্দ্রনাথ আজ যদি বেঁচে থাকতেন স্বাধীন ভারতবর্ষে ; / আজ তিনি লিখতেন কি কবিতা? / কি গান? কি ছবি আঁকতেন? / রবীন্দ্রনাথ আজ যদি বেঁচে থাকতেন আরেক ভারতবর্ষে ·· / হেইও হো! হেইও হো! / আমাদের দেশ স্বাধীন ; কি ভাগ্য! / নেই যদি আজ রবীন্দ্রনাথ, নাই থাকুন ; / আজ আমাদের মাথায় চেপেছে ফুর্তির তাজা খুন। / আমরা স্বাধীন, সাতাশ বছর স্বাধীন ; / (ধিন্‌তা তাধিন্! ধিন্‌তা তাধিন্! / ধিন্‌তা তাধিন্!) / রবীন্দ্রনাথ আজ যদি বেঁচে থাকতেন / স্বাধীন ভারতবর্ষে··· / না থাকুন তিনি, আছেন বিষ্ণু দে ; / এদিকে সুভাষ, ওদিকে প্রেমেনদা— / (ট্রালা লালা ; ট্রালা লা!) / দেশ জুড়ে তার উৎসবে, তার হর্ষে / কার হাত ভাঙে, কার যে ভাঙছে পা ; / নেই কুছ পরোয়া! / টুঁটো হাতে আজ লিখবো নতুন দিনের / নতুন কবিতা ; / আমরা মানুষ, স্বাধীন দেশের মানুষ' ··

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে একবার কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন : **Poets are the makers of civilization** অর্থাৎ কবিরাই মানব সভ্যতার স্থপতি, যেহেতু লেখকদের মধ্যে কবিদের স্থান সর্বোচ্চে।

একজন মানুষই হোক, আর দেশশুদ্ধ মানুষই হোক, যখন ক্রোধে ক্ষোভে নৈরাশ্যে বিষাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন দিশারী কবিরাই তাদের মনে নতুন করে আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম সাহসিকতা জাগিয়ে দেয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসে নিরপরাধ আক্রান্ত মনোবল যখনই ভেঙে পড়ে, তখনই দেখা যায় চারণ কবিদের বীররসাত্মক কাব্যগাথার প্রেরণা প্রতিরোধের সংগ্রামে সাহসী হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সব যুগেই কবিতা

গান নির্জীব মনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে সজীব করে তোলে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটির স্পন্দনই কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ কেবল এই উপমহাদেশে স্বাধীনোত্তর কালেই হয়েছিল তা নয়, বৃটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষেও হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে। ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথের বাংলা কোনো বই নিষিদ্ধ করেননি বটে,—তবে ১৯৩৪ সালে জুন মাসে Modern Review পত্রিকায় কবির 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রথম কিস্তিটি (On Russia) প্রকাশিত হওয়ার অনতিকাল পরেই ইংরেজ সরকার তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এই নিষিদ্ধকরণ নিয়ে বিলেতের পার্লামেন্টে যে প্রশ্নোত্তর হয়, সর্বপ্রথম বিলেতের 'Times' পত্রিকা (১৩ নভেম্বর ১৯৩৪) তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। আমাদের দেশেও কয়েকটি পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বয়ং ব্যাপারটাকে কোনো গ্রাহ্য বা আমলই দেননি, যেহেতু তাঁর নীতি এবং মানসিক গঠন-প্রকৃতিও রুচিবিরুদ্ধ ছিল।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে ইংরেজ সরকার যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ঠিক একই নীতি অনুসরণ করে স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীনতার ২৭ বছর পরে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ করলেন। রাজনৈতিক আবর্তে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে স্বৈরাচারের শিকার হতে হল। রবীন্দ্রনাথের গান কবিতাকে শাসকশ্রেণী ভয় পেতে লাগল। তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ করা হলো।

রবীন্দ্রনাথের গান কবিতাকে নিষিদ্ধ করণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক লেখক কলা কুশলী বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁরা এর প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন পাল্টা হিসেবে ঝুকি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সভাসমাবেশ, সেমিনারের আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত একজন সার্বভৌম কবির কণ্ঠরোধে সাধারণ মানুষের চেতনায় কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন ? এ প্রশ্নের কোন মানে নেই। সাধারণ মানুষের কি সত্যি কিছু করার ছিল ? যে স্বৈরশাসনে রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিরাট প্রতিভার কণ্ঠরোধ করা হয় সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতনা জাগাতে সে-রকম কোন আন্দোলন গড়ে উঠেনি। অথচ আমাদের বাঙালীদের অভিজ্ঞতা এ কথাই স্মরণ করায়—সত্তরদশকে এই উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানের জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে। বাংলা দেশের জনগণ মাথা নত করেনি বরং প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্তালিনের একটা মূল্যবান কথা স্মরণ করা যেতে পারে: Writers are the engineers of the tuman soul. এক্ষেত্রে আমাদের সার্থকতা কি ব্যর্থতা, সেকথা বিচার করবে মহাকাল। তবে একথা কি আমরা ভারতীয় তথা বাঙালী, আমাদের সত্তার গভীরে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রতি-নিয়ত বিরাজিত, সে-দিক থেকে আমাদেরও দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। আগামী প্রজন্মের দিকে তাকিয়েই সে-দায়িত্ব পালনের সময় এসেছে।

১. সংকটের স্বরূপ / ডঃ অশোক মিত্র।

২. ঐ।

৩. সীমান্ত সাহিত্য পত্র, নিরঞ্জন হালদার রচিত প্রবন্ধ' কার্তিক মোদক সম্পাদিত, ১৯৭৭।

৪. কলকাতা, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত / রাজনৈতিক সংখ্যা, ১৯৭৫ / এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

৫. Daily gardian, 22nd July, 1975. (Where will opposition next raise its Head ?)

৬. রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত সেন্সারকরা কবিতা।

৭. গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর কর্মীরা। এছাড়া,

ক] পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৮১।

খ] বাবুবৃত্তান্ত / সমর সেন রচিত।

শামসুজ্জামান খান

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিতর্ক ও নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ

সাবেক পূর্ববাংলা এবং বর্তমান বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। কোন পরিশ্রমী গবেষক বা রসজ্ঞ সমালোচক এই মহান লেখকের সাহিত্যকীর্তি বা জীবন প্রবাহের কোন নির্ভরযোগ্য ভাষ্য রচনা করেননি। তার কারণ হয়তো নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বহু আলোচিত, তীব্র বিতর্কিত এবং আশ্চর্য জীবন্ত একটি প্রসঙ্গ। এবং বলা যেতে পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

কারণ কোন কবিকে নিয়ে একটি দেশের ব্যাপক জনগণ ও শাসকগোষ্ঠি দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে এমন নজীর অন্য কোন দেশে আছে বলে মনে হয়না। দেশের মৌলিক রাজনৈতিক দর্শন ও তার বাস্তবতার প্রতি যখন প্রশ্ন তোলা হয়েছে তখনও এই কবি-প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। প্রশ্ন থেকে মৌলিক দ্বন্দ্বের যখন সূত্রপাত, তখনও কবিপ্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে যুক্ত। দ্বন্দ্ব-বিকাশের পর্বে পর্বে কবি কখনও নিষিদ্ধ হয়ে মনের মণিকোঠায় দৃঢ়-আশ্রয়ী, আবার কখনও বাঁধভাঙ্গা বন্যার বেগে মিছিলে, প্ল্যাকার্ডে, গণজমায়েতে উজ্জল থেকে উজ্জলতর। দ্বন্দ্ব-বিকাশের চুড়ান্ত পর্যায়ের পর গুণগত পরিবর্তনের অবস্থায় এসে অর্থাৎ সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধেও কবির উপস্থিত জনগণের পক্ষে এক বিরাট নৈতিক শক্তি।

আবার স্বাধীনতা লাভের পর পরই নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত। এবং সে বিতর্ক থেকে প্রচণ্ড তোলপাড়।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের বিভিন্ন ধারাকেই সামনে রাখা হয়েছে। পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্কের প্রথম সূত্রপাত ১৯৪৮ সালে। সম্ভবত ঢাকা জেলের কম্যুনিষ্ট বন্দীরা নিজেদের মধ্যে এর সূত্রপাত করেছিলেন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে নতুন করে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের প্রয়োজনবোধ করেছিলেন

কোন কোন কমরেড। তাঁদের মত ছিল রবীন্দ্রনাথ মূলতই বুর্জোয়া লেখক। নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও তার সৃজনে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন অবদান নেই। ধনঞ্জয় দাশের 'আমার জন্মভূমি' : স্মৃতিময় বাংলাদেশ[১] গ্রন্থে দেখা যায় বেশীর ভাগ কমরেডই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে উগ্রবামপন্থী ঝোঁকের বশে বাতিল বলে গণ্য করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করে তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকাকে চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের এক মহান উত্তরাধিকার বলে রায় দেন।

জেলের বাইরেও এ বিতর্কের ছোঁয়াচ লেগেছিল। বিশেষ করে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কয়েকজন সদস্য এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী (পরবর্তীকালে অধ্যাপক), আখলাকুর রহমান (বর্তমানে ডক্টর), আবদুল্লাহ আল মুতী ও অধ্যাপক অসিত কুমার গুহ। এঁরা সকলেই সে সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত ছিলেন। অসিত গুহ বাদে অন্য তিনজন সলিমুল্লাহ মুসলীম হলে আয়োজিত এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া লেখক হিসাবে আখ্যাত করেন। এই ক্ষুদ্র উপদলের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে আখলাকুর রহমান রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা থেকে : 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে / আনে উপহার / দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে— / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥' 'এই অংশটি উদ্ধৃত করে বলেন যে কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারত অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন।

আখলাকুর রহমানের এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি অজিত গুহ তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্যান্য উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহও আখলাকুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেন।

সলিমুল্লাহ হলের এই সাহিত্য সভার পর লেখক সংঘের অভ্যন্তরে অজিত গুহের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং লেখক সংঘের সভাপতি হওয়া

সত্ত্বেও জনসাধারণের সামনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল বক্তব্য হাজির করার জন্য তাঁরা তার বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[২]

আখলাকুর রহমান প্রমুখের রবীন্দ্র-মূল্যায়নে অবশ্য কোন মৌলিকতা ছিলনা। এধরণের মূল্যায়নের মূল প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেন, প্রকাশ রায়, বীরেন গুহ, উর্মিলা গুহ প্রমুখ। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' নামক পত্রিকায় সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের তাত্ত্বিক বক্তব্য প্রকাশিত হত। বক্তব্য রাখলেন : 'যে সাহিত্যে শোষিত মানুষের স্বীকৃতি নেই, ভাবী সমাজের ইঙ্গিত নেই তাকে তারা সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষপাতি। ...রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ– সমগ্র শতকের কিছুই একান্তভাবে প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়ার সৃষ্টি সুতরাং বর্জনীয়'।[৩]

মার্কসবাদীর ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত লিখলেন : 'উপনিষদের মায়াবাদ হলো রবীন্দ্র দর্শনের সারমর্ম। এই দর্শনই শ্রেণীসংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার, মজুর শ্রেণীকে শ্রেণীসংগ্রাম ভুলিয়ে দেবার মতো বড় শক্তিশালী হাতিয়ার ধনিকশ্রেণীও আবিস্কার করতে পারেনি। প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত। ...সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন, শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতি শিবিরকে এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে অস্বীকার করেই'।[৪]

রবীন্দ্র গুপ্ত[৬] রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যে উগ্রবামপন্থীর পরিচয় দেন তার পেছনে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতির প্রভাব ছিল। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের মূল্যায়নেও। পূর্ব-বাংলার হবু কম্যুনিষ্টরাও এই ঘাপলার মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল ও অমার্জনীয় বক্তব্য রেখেছিলেন। স্মর্তব্য যে 'মার্কসবাদী' পত্রিকা এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা ভবানী সেন প্রমুখ তাঁদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত উগ্র-বামপন্থী মূল্যায়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে যাঁরা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সমালোচনা করেছিলেন তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এমন মনে করার কারণ আছে। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকারীদের অন্যতম অধ্যাপক মুনীর আলী ইন্সটিট্যুটে অনুষ্ঠিত লেখক শিল্পী মজলিশের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে[৭] বলেছিলেন :

'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে'।[৮] মুনীর চৌধুরীর এই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে বাংলাদেশের তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের উগ্রমার্কসীয় মূল্যায়ন ক্ষতিকর। এই মূল্যায়ন থেকে প্রতিক্রিয়াশীলরাও সুযোগ নেবে। এবং সে কাজটি যে শুরু হয়ে গেছে তা উপলব্ধি করেই মুনীর চৌধুরী সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

[দুই]

এরপরও রবীন্দ্রনাথকে বর্জন এবং অস্বীকার করার কথা এলো। তবে এবারে প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন, আদর্শ এবং সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে হবে এই বক্তব্য রাখলেন সৈয়দ আলী আহসান। আহসান সাহেবের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তখনকার ভাবনায় পাকিস্তান আন্দোলন ও তার দার্শনিক পটভূমিকার প্রভাব ছিল সজীব। তাই মোটামুটি যুক্তিবাদী হয়েও তাঁর বিশ্বাসকে তিনি বেশ অকপটেই প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন : 'মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্য ও কাব্যে। সুতরাং প্রাক্তন বংগের দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আসতে পারেনা—শুধুমাত্র সংস্কৃতিগত বোঝাপড়া হলেও হতে পারে। আমরা আদর্শের ক্ষেত্রে মিলিত হতে চাইনে, কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।······এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ও বৈষ্ণব পদাবলী পড়ানো হয়। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মূলতঃ সংশ্লিষ্ট বলে এগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। বরঞ্চ গ্রহণ করা হয়েছে এই ভেবে যে, বাংলার অতীতের সাহিত্য ধারা মেনে নিয়েই আমাদের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াস পেতে হবে। মুসলমান হিসাবে বিচার না করে, নির্বিশেষ সাহিত্য বিচারে এগুলোর মূল্য নিরূপনের চেষ্টা হয়েছে। প্রাক্তন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষিত হবে না। সেগুলোর ওপর উভয় বাংলারই পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে সেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ করবো। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক

স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী'।[৯]

[তিন]

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাত্রিতে সামরিক জান্তার গুলিতে নিহত ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে আহূত শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী ও ছাত্রদের এক সভায় পূর্ব বাংলার রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ ও ডঃ খান সরওয়ার মুর্শিদ এই কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ধারিত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের কক্ষেও এই কমিটির কয়েকটি সভা হয় এবং তাতে বিস্তৃত কর্মসূচী তৈরি করা হয়। এই কমিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিট্যুটে শত বার্ষিকীর উৎসব উদযাপন করেন।

গত বার্ষিকী উৎসবের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেশে তখন আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসন চলছে। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা সামরিক চক্রের যোগসাজশে শতবার্ষিকী উৎসব পণ্ড করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সরাসরি আঘাত হানা ঠিক হবে না মনে করেই প্রতিক্রিয়াশীলদের দিয়ে পাল্টা সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট খোলা হয়। এরা জেলা বোর্ড হলে একসভা ডেকে রবীন্দ্র কুৎসার এক আসর জমায়। এই ফ্রন্টের কর্মীরা ও তাদের মুরুব্বিরা নামে বেনামে পত্র-পত্রিকায় দেদার লিখতে শুরু করে। আজাদ পত্রিকা রবীন্দ্র বিরোধিতায় সেনাপতির ভূমিকা পালন করে। অন্য দিকে ইত্তেফাক,[১০] সংবাদ[১১] প্রভৃতি পত্রিকায় প্রগতিশীলদের বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। একদিকে আজাদ,[১২] অন্য দিকে ইত্তেফাক সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই রবীন্দ্র বিতর্ক অব্যাহত থাকে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের অধিকাংশ বক্তব্যেই শালীনতা রুচিবোধ, যুক্তি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তাদের তাত্ত্বিক বক্তব্যগুলো ছিল এরকম: 'পাকিস্তান

একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ; ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিই এই আদর্শের মূল। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু হিন্দু (বা ব্রাহ্ম), তাই তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। উপনিষদই তাঁর জীবনদর্শনের মূল। অতএব তিনি পাকিস্তানী মুসলমানদের কাছে অপাংক্তেয়। তিনি বড় কবি হতে পারেন—কিন্তু আমাদের কবি নয়। বরং তাঁর জীবনাদর্শ পাকিস্তানী আদর্শের বিরোধী। সুতরাং তিনি একান্তভাবেই—পরিত্যাজ্য, এই তাত্ত্বিক বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ থেকে সুবিধা-জনকভাবে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছিলো।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেবও মূলতঃ এই দলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর বক্তব্য অন্যদের মত স্থূলভাবে উপস্থাপিত হয়নি। 'সমকাল'[১৩] রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদ ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে সাহিত্যিক বিবেচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন : 'পাকিস্তানী হিসাবে আমরা একটি আলাদা জাতি। আমাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট আছে—এ অনস্বীকার্য।...একটা অভিযোগ উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেন নি। এ অভিযোগ খণ্ডন করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। ...বরঞ্চ এ ব্যাপার নিয়ে যাঁরা আক্ষেপ এবং অভিযোগ করেন তাদের মনোভাবটাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে।...রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের জাতীয় কবি নন, কথাটা সত্যি হলেও নিতান্ত অবান্তর। কারণ, প্রথমত জাতীয় কবি হওয়া কোন বড় কবির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। যাঁরা শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য চর্চায় প্রবৃত্ত হন, জাতি ও কাল নির্মমভাবে তাদের বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তো বটেই, তিনি আরো শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য এই জন্য যে তাঁর জাতীয়তাবোধ, তাঁর স্বজাতিপ্রীতি এর ঊর্ধ্বে রয়েছে তার মানবীয় মূল্যবোধ।

যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ অপরিসীম, এ সত্যটি যেন ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি তাঁর নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন।...... রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের

নিভৃতে হয়তো আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়ায় জাহির করার মত কিছু থাকে না'।[১৪]

রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকীতে প্রতিক্রিয়াশীলরা যে ধরণের অবস্থান গ্রহণ করে তাতে প্রগতিশীলরা বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ রবীন্দ্র মূল্যায়নে অগ্রসর হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের তাৎক্ষণিক নিরিখ তাঁদের ঠিক করে নিতে হয়। পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার একটা তাত্ত্বিক ভিত্তিও খুঁজে বের করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের কতগুলি স্থূল অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে মুসলমানদের সপক্ষে কোথায় তিনি কি বলেছেন তার ওপর নির্ভর করে রচনাদি লেখা হতে থাকে।

এ ধরনের প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও বেশ হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। কারণ লেখকরা নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে পাকিস্তানের মূল প্রবক্তা হলেন আসলে রবীন্দ্রনাথ। কারণ মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনার ও তাকে রূপদানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ সালের দিকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এ ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে আপোষ-কামিতার পরিচয় ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই আপোষ ফর্মুলা পাকিস্তানী শাসকবর্গ গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করেনি শিক্ষিত জনগণের সংগ্রামী অংশও। তাই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মূল্য এখানে নির্ধারিত হয়েছে ইতি-হাসের অগ্রগতির বৈজ্ঞানিক নিয়মেই। যার কোন ভিত্তি নেই, তা টেকেনি। জঞ্জাল দু'দিকে ঠেলে ফেলেই সত্যের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে।

[চার]

এর পরবর্তী পর্যায়ের রবীন্দ্র-বিতর্ক তাই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া যথাযথ অবস্থান নিয়েই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন রকম অন্তরাল সৃষ্টির সুযোগ আর থাকেনি।

এই সরাসরি মোকাবিলার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মরহুম

আবদুল হাই এ ব্যাপারে য ধরণের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা সংগঠনে তিনি যে দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেন তার ফলে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে বাংলাদেশের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটা গর্ববোধ জেগে ওঠে—অনেক পুরানো দ্বিধাদ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটে। ১৯৬৩ সালে বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহও এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই সপ্তাহ যে আলোড়ন তোলে, তাতে এটা বোঝা যাচ্ছিল যে পূর্ব-বাংলার মানুষ তার ভাষা ও সংস্কৃতিগত জাতিসত্তা নিয়ে নতুন সাজে সাজতে শুরু করেছে। আর এখানেই তারা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিস্কার করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন বেড়েছে শিক্ষিত সমাজে, তাঁর সাহিত্যও পঠিত হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী করে—এমনকি তাঁর কবিতার লাইন ব্যবহৃত হয়েছে সুদৃশ্য পোষ্টার আর রাজপথের জঙ্গী মিছিলে প্লাকার্ডে, ফেষ্টুনে। এ যেন এক নতুন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিই ঘাবড়ে দিয়েছে পাকিস্তানী শাসকদের।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। যুদ্ধের পরে জনগণের দাবির ফলে বেতারে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার শুরু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন যে, 'জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়' বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার করা হবে না।

২৪ জুন সংবাদটি প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়: 'কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ-ধরণের অন্যান্য গানের প্রচার কমিয়ে দেওয়া হবে'।[১৩]

২৫ জুন এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়: 'স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৪ জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য'।[১৬]

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন: ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, জনাব এম, এ, বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ, জনাব সিকান্দর আবু জাফর, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, জনাব শামসুর রাহমান, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

উপর্যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পর সরকারের নীতির পক্ষে দুটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। একটি বিবৃতি দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক। তাঁরা বলেন: 'সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কতিপয় বিবৃতিতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং বিবৃতিটি পাকিস্তান বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণার সাথে আমরা একমত নই বলেই আমরা এই বিবৃতি দিচ্ছি'।[১৭]

বিবৃতিটি স্বাক্ষর করেছিলেন: ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, জনাব এম. শাহাবুদ্দীন, ডঃ মোঃ মোহর আলি, জনাব এ, এফ, এম, আবদুর রহমান ও জনাব কে, এম, এ, মুনিম।

দ্বিতীয় বিবৃতিটি দিয়েছিলেন ঢাকার ৪০ জন বুদ্ধিজীবী। বিবৃতির শিরোনাম: '৪০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ২৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক'। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল: 'পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: 'রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

এই উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে,'এই উক্তি স্বীকার করে নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য একথাই মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির মূল কথা হলো : 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। এবং যে-সংস্কৃতি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই প্রথম তার এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন।

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা এর সাথে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে এবং বলা যেতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি'।[১৮]

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন : জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, বিচারপতি জনাব আবদুল মওদুদ, জনাব মুজিবর রহমান খাঁ, জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজির আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, জনাব আ, কা, মু আদমউদ্দিন, কবি তালিম হোসেন, জনাব শাহেদ আলী, জনাব আ, ন, ম বজলুর রশীদ, জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জনাব সানউল্লাহ নূরী, কবি আবদুস সাত্তার, কাজি আবুল কাশেম (শিল্পী), জনাব মুস্তাফাখারুল ইসলাম, জনাব সামসুল হক, জনাব ওসমান গণি, জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ, অনিসুল হক চৌধুরী, জনাব মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, জনাব জহুরুল হক, জনাব ফারুক মাহমুদ, জনাব মোহাম্মদ নাসির আলি, জনাব এ, কে, এম, নুরুল ইসলাম, কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, কাজি আবদুল ওয়াদুদ ও জনাব আখতারুল আলম।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রতিক্রিয়ার

পক্ষভুক্ত দুটো দল ছিল। এক দলের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের প্রবন্ধ থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। ৬১-র বিতর্কে প্রতিক্রিয়ার অংশভুক্ত অন্য দলটি স্থূলভাবে যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেছিল তাদের পুরো ও সুনির্দিষ্ট পরিচয় তখন পাওয়া যায়নি। কারণ দলের কোন কোন ব্যক্তি সোজাসুজি তাদের বক্তব্য রাখলেও অনেকেই আবার ছদ্ম নামের আড়ালে তাদের কুৎসিত বক্তব্য সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ৬৬-৬৭-র বিতর্কে তারা খোলস থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মনের কথা 'খুল্লমখুল্লা' ভাবেই দাখিল করেছেন।

এদের পেছনে যে পাকিস্তানী একনায়ক শাসকসম্প্রদায় ও তাদের তল্পীবাহকরা ছিল, তা স্পষ্ট হয় তৎকালীন জাতীয় পরিষদে খান আবদুল সবুরের ভাষণ থেকে। তিনি এই বিতর্কের সুবাদে জাতীয় পরিষদে বলেছিলেন: 'একথা বলা হচ্ছে যে, ডঃ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রভূতি উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাঁর কাব্য বিহনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এতিম হয়ে পড়েছেন। এই শ্রেণীর মূর্খদের গলাবাজির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই'।[১৯]

খান সবুরের এই ভাষণ থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের আসল উদ্দেশ্য এবং কোন অদৃশ্য হাতের ইশারায় তাঁরা নড়াচড়া করছেন তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৯৬১-র বিতর্কে প্রগতি শিবিরের অবস্থানও আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথ মানবিক উচিত্যবোধ থেকে অসম বিকাশের ফলে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বিবেচনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় না দিলে কি ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তার ওপর আলো ফেলে যেসব প্রবন্ধ বিবৃতি বক্তৃতা তৈরী করেছিলেন—তাকেই সামনে আনতে হয়েছিল। এমনকি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি প্রথম যখন ফজলুল হক মুসলিম হলের রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উৎসবের সভায় পাঠ করা হয়, তাতে প্রগতিশীলরাও তাঁর বক্তব্যে দারুণ খুশী হয়েছিলেন। এমন কি একটি প্রগতিশীল দৈনিকে ওই প্রবন্ধের বক্তব্য হেড লাইন দিয়ে প্রধান সংবাদ হিসাবে ছাপা হয়েছিল।

১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র-বিতর্কে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মেরুকরণ স্পষ্ট আদল নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের যে অংশ চাতুর্যের সঙ্গে বক্তব্য রেখে

১৯৬১ সালে বাহবা পেয়েছিলেন, তাদের রেখে ঢেকে বক্তব্য রাখার সুযোগ এবার কমে গেছে। শাসক-শ্রেণীর আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বভূমিকায় কৌশলগত অংশে পরিবর্তন করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন তাঁর ১৯৬১-র বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে বাংলা সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এর আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকেনা।

১৯৬৭ সালে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উল্লেখ করতে যেয়ে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের উচ্চমান ও ঐশ্বর্যময়তার কথা উল্লেখ করেই তা করেছিলেন। কিন্তু সাজ্জাদ হোসেন ৬৭ সালে এ সম্পর্কে নীরব থেকেই রাষ্ট্রীয় আদর্শগত বক্তব্যটির প্রতিবাদ করেছিলেন। এবং তাঁর এই প্রতিবাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মূল অংশের প্রতিবাদের আর কোন পার্থক্য থাকেনি। অর্থাৎ তৎকালীন গণবিরোধী সরকারের পেছনে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষভুক্ত সকল অংশই একত্রিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের এটা একটা মৌলিক প্রভেদ।

অন্যদিকে প্রগতি শিবিরের ১৯৬১ ও ১৯৬৬-৬৭-এর অবস্থানেও মৌলিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। তাঁরাও তাঁদের বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে এনে সরকার ও তাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের কর্মীদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন এই বক্তব্য: '...রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করেছে।'

এই বিবৃতির খসড়া তৈরী করেছিলেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫১ সালে মাহবুব আলী ইনষ্টিট্যুটে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে মনে হয় বাংলাদেশের রবীন্দ্র পরিস্থিতির চরিত্র সম্পর্কে তিনি তখন থেকেই সচেতন হয়েছিলেন। সচেতন হয়েছিলেন আরো অনেকেই। এই সচেতনা রাজনৈতিক গতিধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা জঙ্গী রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনীতিতে যেমন বাঙালীদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা একটা জঙ্গী রূপ নিয়ে স্বাধিকারের জন্যে তৈরি হচ্ছিল (১৯৬৬-৬৯) সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তার প্রভাবের অন্যতম নজীর প্রগতিশীলদের রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বক্তব্য। তাতে রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে। এবং

সরকারী নীতি নির্ধারণে এই সত্যের স্বীকৃতি শুধু দাবী করা হয়নি—একে 'অপরিহার্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায়......।

এওতো রাজনীতির ভাষায় খুবই কাছাকাছি এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে দুয়ের মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতিতে যেমন বলা হয়েছিল : 'ছয়দফা মানতে হবে, নইলে বাংলা স্বাধীন হবে। এও অনেকটা তেমনি।'

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাশাপাশি চলতে যেয়ে কখনও এ আগে কখনও ও আগে চলেছে। এবং এই দুই আন্দোলনে সহোদরের মতই নিজস্ব কৌশল অনুযায়ী কে কখন কিভাবে চলবে তা ঠিক করে নিয়েছে এবং ঠিক সময় মত একত্রে চলে দুর্বার গতিবেগের সৃষ্টি করে।

আমাদের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলরা চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। তাঁদের পেছনে তদানীন্তন সরকারের দৃঢ় সমর্থন ছিল। অন্যদিকে প্রগতিশীলরাও তখন সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আসল বক্তব্য নিয়ে হাজির। উভয় পক্ষই তখন মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্য তৈরী। আর রাজনীতিতেও তাই। এই সংঘর্ষ ঘটেছে ১৯ ১-এ।

[পাঁচ]

১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র-বিতর্কে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ভেদরেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার পরই প্রগতিশীলরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে মূল্যায়নের তাগিদে প্রগতিশীলরাও আবার ভিন্ন ভিন্ন পক্ষভুক্ত হয়েছেন। যেমন উদার মানবিকতাবাদী ও মার্কসীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ লেখকরা কিছুটা ভিন্ন অবস্থান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেছেন।

তবে এবারের মার্কসীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ লেখকদের রবীন্দ্র মূল্যায়নে ১৯৪৮-৪৯ এর সে ঝাঁজ নেই—অবশ্য তেজ আছে বেশ কিছুটা। মার্কসীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধদেরও আবার এপক্ষ ওপক্ষ আছে। তাঁদের রবীন্দ্র মূল্যায়নের নিরিখেও কিছু পার্থক্য আছে। তবে সে পার্থক্য উনিশ-বিশের পার্থক্য। ১৯৪৮-৪৯ এর মত আকাশ পাতালের পার্থক্য নয়।

১৯৬৮ সাল থেকেই রবীন্দ্র-বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। এ সময়েই 'কণ্ঠস্বর'[২০] পত্রিকায় তরুণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মনসুর মুসার 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধটি বেরয়। প্রবন্ধটি লেখা হয় প্রমথনাথ বিশীর ওই একই শিরোনামে লেখা একটি প্রবন্ধর প্রতিবাদে। বেশ ঝাঁজের সঙ্গে জোরালোভাবে লেখা এ প্রবন্ধ। তবে এতে আবেগের কিছু প্রাধান্য ঘটায়, প্রবন্ধটিতে লেখকের চিন্তার স্ববিরোধের স্বাক্ষর আছে। তাছাড়া মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করতে যেয়ে তিনি যে বক্তব্য হাজির করেছেন অনেক মার্কসবাদীই তাতে সায় দিতে পারবেন না।

বিশীর বক্তব্য ছিল: 'গণতন্ত্রের ভিত্তি উদার শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেরও ভিত্তি উদার-শিক্ষা; গণতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য; গণতন্ত্র ও রবীন্দ্র-সাহিত্য দুই-ই একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণ জীবনোপলব্ধির সাধনায় নিযুক্ত; জীবন সম্বন্ধে দুয়েরই ধারণা ও মূল্যবোধ সমান। কোনো একনায়কতন্ত্রের দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্র লোপ পাইলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার হানিও অপরিহার্য।' বিশীর এই বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। তিনি গণতন্ত্র বলতে যা বোঝেন আমরা তাকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলবো না। এবং যে ধরণের সমাজ ব্যবস্থার আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সকল মানুষের মুক্তি নিহিত একথাও ঠিক। এবং ওই নতুন সমাজে রবীন্দ্রনাথের মূল্য থাকবেনা এবং তাঁর সাহিত্য তখন না পড়লেও চলবে এমন কথার প্রতি মার্কসীয় শাস্ত্রের সায় আছে বলেও আমাদের মনে হয় না। অথচ মনসুর মুসা মার্কসীয় তত্ত্বের বরাত দিয়েই ভাবীসমাজে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবসানের অনিবার্যতার কথা বলেছেন।

মনসুর মুসা লিখেছেন: 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আমরা শর্তান্বিত আছি, এখানে রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তা সর্বোৎকৃষ্ট না হয়ে বরং অস্পৃশ্য ও বিপদজনক বলে পরিগণিত হতে পারে। এতে দুঃখ করার কি আছে! আমাদের কাছে মানবজীবন সবচেয়ে মূল্যবান। আমরা মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারিনা। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য না পড়লেও পারি। আমাদের দেশের যে শর্তান্বিত

যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাশ ও প্রয়োজন, সে শর্তাম্বিত যুগের যদি অবসান ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্য হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যেও অবসান অনিবার্য ধরতে হবে'।[২১]

মুসার এই বক্তব্য মেনে নেওয়া শক্ত। স্বয়ং লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করেই এই বক্তব্যকে নাকচ করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মুসাই তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁর নিজের পূর্ব বক্তব্যকে খণ্ডন করে লিখেছেন: 'আমাদের কাছে একথা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয় যে সাম্যবাদী সমাজে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিত্যক্ত হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভার ব্যাপক প্রসারতাকে এক কথায় নাকচ করা অসম্ভব। তাঁর এক অবদানকে অস্বীকার করলে সংগে সংগে তাঁর অন্য অবদান সে স্থানে এসে প্রশ্নমুখর হয়ে ওঠে। তাঁর বিষয়কে বাদ দিলে আঙ্গিক এসে প্রশ্ন তোলে, দর্শনকে বাদ দিলে ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়ায়। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যবিচারের মানদণ্ড পরিবর্তিত হবে এটা ঠিক। এখন বুর্জোয়া ভাববাদী কলাকৈবল্যবাদী চেতনা অনুসারে যাকে বলা হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তখন বস্তুতান্ত্রিক নাস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শবাদী সমাজে তাকে হয়ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হবে না। অন্তত বিষয়ের দিক থেকে। অন্য কোন কৃতিকে তখন মহৎ বলে গণ্য করা হবে। রক্তকরবী তাসেরদেশ' জুতা আবিষ্কার তখন হয়তো ভিন্নতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। গীতাঞ্জলির বক্তব্য তখন হয়তো বিকৃত হতে পারে [**ভিয়েতনাম এমনকি চীনের লেখকরাও কিন্তু গীতাঞ্জলির মধ্য থেকে প্রগতিশীল অন্তঃসার খুঁজে বের করেছেন তাঁদের কোন কোন রচনায়—লেখক**]। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবদান, তাঁর শিল্প কর্মের গঠন রূপ, তাঁর পরিচর্যার উপযোগিতা, তাঁর সুর-ছন্দ-ভঙ্গি সাধনা, তাঁর শিল্পকৌশলের অন্তর মূল্যের সামগ্রিক অবদান, অবশ্যই স্বীকৃত হবে। কারণ রবীন্দ্র সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্য, তাঁর সাংস্কৃতিক অবদান ও শৈল্পিক মূল্য অস্বীকার করা অসম্ভব। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায় তাঁরা পূর্ববর্তী মহৎ শিল্পীদের রচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মও তেমনি নতুন মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে, পৌণপৌণিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গৃহীত হবে'।[২২]

মনস্থর মুসার এই বক্তব্য বিজ্ঞানভিত্তিক এবং মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৩৭৫ সালে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সংস্কৃতি সংসদের চিরকুট[২৩] সংকলনেও রবীন্দ্রনাথের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যায়। এতে প্রকাশিত আবুল কাশেম ফজলুল হকের 'আমাদের সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' এবং মনস্থর মুসার 'ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে যে মূল্যায়ন উপস্থিত করা হয় তাতে কোথাও কোথাও কিছুটা বিতর্কের সুযোগ থাকলেও উভয় প্রবন্ধকারের বক্তব্য বিজ্ঞানভিত্তিক। ফজলুল হকের প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক ও রবীন্দ্র ভক্তদের অবৈজ্ঞানিক রবীন্দ্র ভাষ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয় এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অসঙ্গতি ও দুর্বলতাগুলিকেও সমাজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যদিকে মুসা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেন।

এ সময়েই আর একটি বহু বিতর্কিত লেখা যতীন সরকারের 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ'[২৪]। শ্রী সরকার তাঁর প্রবন্ধে 'বিপ্লব' কথাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েই রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিপ্লবের উপাদান খুঁজছিলেন। তার রচনায়ও এদেশের সমাজ বিকাশের ধারার কথা এসেছিলো এবং তার পেক্ষাপটেই তিনি তাঁর বক্তব্যের ভিত নির্মাণ করেছিলেন। তবে প্রবন্ধটিতে সামগ্রিক ব্যাখ্যা না থাকায় বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েছিলো প্রতিক্রিয়াশীলরা।

প্রগতিশীলদের নিজেদের মধ্যে এ ধরণের রবীন্দ্র-বিতর্ক হয়তো আরও কিছুদিন চলতো কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা যেভাবে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে তাতে এ ধরণের বিতর্কের সুযোগ কমে আসে। রবীন্দ্রনাথ বরং সম্মিলিত বাঙালী জাতিসত্তার প্রতীক হিসাবেই নতুন তাৎপর্য লাভ করেন।

[ছয়]

স্বাধীনতা লাভের পরই আবার নতুন করে রবীন্দ্র-বিতর্কের শুরু হয়। এই বিতর্ক প্রগতিশীলদের নিজেদের মধ্যে। যে বিতর্ক ১৯৬৭ সালের পরে শুরু হয়ে রাজনৈতিক গতি প্রবাহের একটা বিশেষ চরিত্রের জন্য সাময়িকভাবে

বন্ধ ছিল, আবার তা শুরু হলো স্বাধীনতা লাভের পর পরই। এবার বিতর্কের সূত্রপাত করে সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'।[২৫]

বিচিত্রার পক্ষ থেকে দুজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর কাছে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছিল তা ছিল এরকম: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের সংগ্রামী হাতিয়ার। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ কি আগের মতোনই আমাদের সংগ্রামী প্রেরণার উৎস হতে পারবেন? নাকি তিনি ক্রমশ হারিয়ে যাবেন সংগ্রামী চৈতন্য থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব কবীর চৌধুরী বলেছিলেন: 'না রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংগ্রামী চেতনা থেকে কখনোই বিলুপ্ত হবেন না বরং কল্যাণের বোধকে সকল রকম সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত করার কাজে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অম্লান থাকবেন'।[২৬]

অন্যদিকে বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন: স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে রবীন্দ্রনাথ এই নাম ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মূলমন্ত্র।

সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকেই রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম। এই বিপ্লবের সৈন্যাপত্যও ছিল রবীন্দ্র-সংস্কৃতির। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ও বাংলা সংস্কৃতি মূলতঃ অভিন্ন। স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ বাঙালী জাতীয়তার প্রতিরোধ যুদ্ধ সফল হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র-চেতনা সমষ্টি চেতনা থেকে ব্যক্তি চেতনায় রূপান্তরিত হবে এবং তাঁর সাহিত্যকে চিরায়তকালের কষ্টিপাথরে মূল্যায়ন করার চেষ্টা হবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার গণভিত্তি ধীরে ধীরে ব্যক্তিভিত্তিতে রূপান্তরিত হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে অতিদ্রুত এই জনপ্রিয়তার ভিত্তি পরিবর্তিত হবে না।

জাতীয় মুক্তির পর সমাজদেহে বিভিন্ন শ্রেণী-চরিত্রের দ্রুত বিকাশ শুরু হয়। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন যেহেতু সর্বজনীন তাই বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে তাঁর আবেদন সহসা ফুরিয়ে যাবেনা। বরং নতুন মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ঐক্য ও জাতীয় সত্তার প্রতীক হিসাবে সযত্নে ধরে রাখার চেষ্টা করবে'।[২৭]

'বিচিত্রা'র ওই একই সংখ্যায় প্রখ্যাত কবি ও মননশীল প্রবন্ধকার হাসান

হাফিজুর রহমান 'এখনো অনন্ত উৎস তুমি রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনায় বলেছেন: '·· আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে এবং এর পরিনামী স্বাধীনতার লড়াইয়ে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে কেবল সার্বভৌম হয়ে উঠেছেন, তাই নয় অনেক গভীরে অনেক বিচিত্র তৎপরতায় তাঁর প্রভাব উন্মিলিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যখন আমাদের ভাষার উপর প্রথম আক্রমণ এলো তখনই রবীন্দ্রনাথ নতুন অর্থে জীবন্ত হয়ে উঠলেন আমাদের কাছে। এই পুনঃরুজ্জীবন রাবীন্দ্রিক ভাবনা বা বক্তব্যের গুরুত্বের জন্য নয়, সংগ্রামের কৌশল তাঁর রচনায় আছে এবং সেইজন্যই তাঁকে আমাদের বিশেষ দরকার এমন কথাও কেউ বলবেন না। হয়তো এমন কথাও অবান্তর যে, আমাদের সকল লক্ষের পথদিশা তাঁর মধ্যেই রয়েছে। আসলে আমাদের বাংলা ভাষার সমগ্র মহিমার, একান্ত গৌরবের একটি প্রবল প্রতীক আমরা চেয়েছিলাম। কেবল রবীন্দ্রনাথেই ছিল সেই চাহিদার একমেবাদ্বিতিয়াম দীপ্তি। ফলে আমাদের আত্মসংরক্ষণের সংগ্রাম শুরুর প্রথম দিনেই তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের প্রথম পতাকা।···

আমি একথা বলিনা, প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথ নির্ভুল, সব চিন্তারই শেষ কথা তিনি। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় আপোষ রয়েছে। রাজা, মুক্তধারা; রক্তকরবীতে এই উক্তির সত্যতা মিলবে। এসব রচনায় তাঁর যে বিবর্তন চেতনা প্রতিফলিত তাতে থিসিস এ্যান্টিথিসিসের সংঘর্ষে সিনথিসিসের জন্ম হয় না, থিসিসই মার্জিত ও সংশোধিত হয়ে ফিরে আসে। অর্থাৎ পুরাতনই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খেয়ে থেকে যেতে চায়। নতুনের প্রতিষ্ঠা হয় না। এতে উদার চিন্তা আছে, কিন্তু মৌলিক রক্ষণশীলতা মুক্ত এ নয়। রবীন্দ্রনাথের সৃজন ধারায় নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজের সমর্থক উপাদান পাওয়া যাবেনা, যদিও বুদ্ধিগত সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁর চিন্তামূলক রচনায় রয়েছে'।[২৮]

এক পৃষ্ঠার এই ছোট্ট রচনাটিতে হাসান হাফিজুর রহমান রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যায়ন করেছেন, তাকে যথাযথ বলে আমার মনে হয়।

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিতর্কের ধারায় বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের তিনটি রচনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখাগুলো হলো: রবীন্দ্রনাথ: আজকের

সংগ্রামের পুরোধা' ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সাথী[২৯] জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, 'সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ[৩০] এবং রবীন্দ্রনাথ : 'মূল্যায়ন সম্পর্কে দুটি কথা।'[৩১]

আকরম হোসেন তাঁর 'বাংলাদেশ ও রবীন্দ্র বিচার'[৩২] শীর্ষক রচনায় বাংলাদেশে রবীন্দ্র-চর্চার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন : 'আমরা লক্ষ্য করেছি গত দুদশকে অধ্যাপকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বক্তব্যে, কেবলই পশ্চিমবঙ্গজ প্রৌঢ় বৃদ্ধ ভাববাদী সমালোচকদের দৃষ্টান্ত ও তথ্য পরিবেশন করে তৃপ্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অর্থ অধ্যাত্মজগৎ, সীমা-অসীম , রূপ-অরূপ-জীবন দেবতা, অজ্ঞাত রহস্য, অনাবিষ্কৃত দ্বীপমালা প্রভৃতি বিশেষণ স্রোতে শিক্ষার্থীদের পুণ্যস্নান করিয়েছেন, কৌতুহলী প্রশ্নমুগ্ধ চোখে ছুঁড়ে দিয়েছেন মিষ্টি কবোধের ধূলোবালি। · আজ প্রশ্ন রবীন্দ্র-বিচারে আমরা কোন্ চেতনার আলো জ্বেলে অগ্রসর হব ? আজ যে মহল রবীন্দ্র-বিচারে আবেগের স্থান দাবী করবেন সে সম্পর্কে কি আমরা নির্বিচারী হব ? আমরা কি আশঙ্কা করবনা যে রবীন্দ্র বর্জনের মতই নির্বিচারে ঋষি রবীন্দ্রনাথকে জীবন গ্রহণের মধ্যেও অনেকের উৎসাহ থাকতে পারে, আমরা ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার করব'।

সবশেষ প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। গত বছর[৩৩] রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রচারিত একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তিনি এই আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সীমিত প্রচার মাধ্যমের একটি পণ্ডিতী আলোচনায় যে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে এটা প্রথমত আশা করা যায়নি।

ডঃ শরীফের বক্তব্যের পুরো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু তবু সমালোচনার কী প্রচণ্ড ঝড। এতে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তা-চেতনায় এবং আবেগ অনুভূতিতে কত গভীর ভাবে মিশে আছেন। তাঁকে বর্জনের কথা এলে আমরা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হই। অতএব তিনি যে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং দীর্ঘদিন থাকবেন এ সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ দেখি না।

ডঃ আহমদ শরীফের যে বক্তব্যের কথা বলছিলাম তার যে বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে তাতে দেখা যায় তাঁর মূল বক্তব্য হল : 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন। এবং তাঁর সাহিত্য আমাদের জন্য বর্তমানে আর অনুপ্রেরণার

উৎস হতে পারে না। সম্ভবত তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি এই কথা-গুলোকেই চাঁছাছোলা এবং কিছুটা কটুভাবে পরিবেশন করে থাকবেন। এর ফলেই সম্ভবত আলোড়ন একটু বেশীই হয়েছে।

অবশ্য শুধু আলোড়নই হয়নি, যোগ্য ব্যক্তিরা দক্ষতার সঙ্গেই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ডঃ শরীফের বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে 'বিচিত্রা'[৩৪] প্রকাশিত জনাব আসহাবুর রহমানের আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীত ও পুরানোর মূল্যায়নের মার্কসীয় নীতিকে তিনি বহু উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সঙ্গে রাশিয়ার প্রলেৎকুল্ট আন্দোলন এবং সে সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য তুলে এনে মার্কসবাদ যে বুর্জোয়াযুগের মূল্যবান সুকৃতিকে বাতিল করে না, তা ব্যাখ্যা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য অবশ্য মার্কসীয় পদ্ধতিতে তাঁর সমালোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি মার্কসবাদী নন এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণাও স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্র-বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই আমি একথাগুলো বললাম এবং আমার বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ শরীফের 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ'[৩৫] প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে চাই। এখানে তিনি মার্কসীয় চিন্তার মূলকথা : ইতিপূর্বে বিরাজমান সমাজসমূহের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, (মার্কস) -কে প্রত্যাখান করেছেন।

ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন : '...হজরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে তুং অবধি সবাই একই লক্ষে কাজ করে এসেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও পদ্ধতির। সবাই মানব দরদী ও মানবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথও মানবতাবাদী। তিনি মুখ্যত কবি-মনীষী-কর্মী নন। তাঁর কর্তব্য ছিল মানুষকে, আত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করা—বাস্তবে রূপায়ন নয়। আবহমান কালের ধারায় তিনি যুগ প্রতিনিধি। তাঁর আবেদন মানুষের সুবুদ্ধি ও বিবেকের কাছে। কম্যুনিষ্টদের আবেদনের লক্ষ্যও তাই। কম্যুনিষ্ট বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী। মানবতাবাদী কবি স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-বুদ্ধির বিকাশে আস্থাবান। সামন্তবাদী, ঔপনিবেশিকতাবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, অধ্যাত্মবাদী প্রভৃতি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে কোন মানবতাবাদীকে বিচার করা অবিচারের নামান্তর। নিজের মত পথকেই কেবল একমাত্র ও অভ্রান্ত ভাবা অসহিষ্ণুতা ও মানব মনীষীর প্রতি অশ্রদ্ধা তথা ব্যক্তিক সত্তার অবমাননার নামান্তর'।[৩৬]

এই প্রবন্ধের আরো কিছু কৌতুহোলোদ্দীপক অংশ : 'রবীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তিনটিই স্বচক্ষে দেখেছেন—বুঝবার শক্তিও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন আত্মিকবোধ না জন্মালে বাহুবলে আর্থিক সাম্য স্থায়ী হতে পারে না। স্বেচ্ছাসম্মতি আর জবরদস্তি 'সায়' এক বস্তু নয়।

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার ধারণাই করেছেন, কল্যাণ ও সমৃদ্ধ প্রসূত স্বেচ্ছাসম্মতি দানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানব কল্যাণকামী স্বেচ্ছাসৈনিক। তাঁর এই জীবন-দৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য।

গল্পে-প্রবন্ধে-নাটকে কাব্যে কতভাবে তিনি দ্বেষবদ্ধ বিভেদে-বিরোধ, শোষণ-পীডন অপ্রেম-অশ্রদ্ধামুক্ত সমাজ চিন্তা জাগানোর চেষ্টা করেছেন। ন্যায় যুদ্ধে কত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তবু তা কারো (ism) সম্মত হল না বলে তাদের কাছে তা অকেজো অশ্রদ্ধেয়। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ তাদের কাছে না ঘরকা 'না ঘাটকা মানুষকে ভালোবাসার এ এক অভিনব বিড়ম্বনা'। ৩৭

ডঃ আহমদ শরীফের এই বক্তব্য মার্কসবাদীর বক্তব্য নয়। বরং মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতি এতে বিরূপতা আছে, স্ববিরোধও কিছু কম নেই। তা ছাড়া এ বক্তব্যে বুর্জোয়া মানবতার প্রতি তাঁর গভীর আস্থাই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী বক্তব্যএর সম্পূর্ণ বিরোধী। এবং পরবর্তী বক্তব্য ও মার্কসীয় সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতে গ্রাহ্য নয়।

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের ধারায় আহমেদ হুমায়ুনের বক্তব্যকেও বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। তিনি তাঁর 'বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের ওপরও আলোকপাত করেছেন এবং মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। তাঁর বক্তব্যে পরিণত বিবেচনার পরিচয় আছে। তিনি বলেছেন : পৃথিবীর কোন সাহিত্য বিচার পদ্ধতিই অবশ্য রাজনৈতিক তাৎপর্য রহিত নয়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত যখন শুধু সংখ্যালঘিষ্ট সম্পন্ন ও অভিজাত শ্রেণীই উপভোগ করতে সক্ষম তখন কার সংস্কৃতি এবং কার জন্যে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়ে পারে

না। কোন সাহিত্যই তা যত রাজনীতি বিমুখ হোক, সামাজিক ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে, কোন কালে ও কোন রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন, সামগ্রিক ভাবে তাঁর সৃষ্টির বক্তব্য কি, চূড়ান্ত বিচারে তিনি কোন্ পক্ষে এবং নিজস্ব শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা থেকে তাঁর জীবনদর্শন অগ্রসর কিনা। টলস্টয় আর গোর্কির সাহিত্য অভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত নয়, কিন্তু তাই বলে টলস্টয় পরিত্যক্ত হননি। ভোলতের আর সার্তের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কিন্তু বিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে দুজনেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতি। কারণ সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি কাল নিরপেক্ষ নয়। মানুষের ইতিহাস যেখানে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস, সেখানে ঐতিহ্য বর্জনের প্রশ্ন ওঠেনা।······

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল জীবন অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময়ের উপর বিস্তৃত। এই সময়ের মধ্যে বাঙালী সমাজে বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, নতুন চিন্তা বিকাশ লাভ করেছে, সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে এবং পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের গোটা সাহিত্য অবশ্যই রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান নয়। কিন্তু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব, তিনি সামগ্রিকভাবে মানবতার সপক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধিতা খুঁজে পাওয়া যাবে, শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তাঁকে সরাসরি বৈপ্লবিক বা বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেয়নি। আধ্যাত্মিক ও ভাববাদ কখনও তাঁর চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এক ঋজু সত্তার সংগে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর অপূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন।····

কিন্তু এই স্বীকারোক্তির চাইতেও বড় কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে তুলনামূলক ভাবে প্রগতিশীলতার সপক্ষেই মত পরিবর্তন করেছেন। অন্ধ-সংস্কারকে তিনি মেনে নেননি। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে চলতে প্রয়াস পেয়েছেন। যা কিছু তাঁর কাছে অন্যায় ও অশুভ বলে মনে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন অকুতোভয়ে।······

ভাবীকাল তাঁর কাছে রাজনৈতিক পথনির্দেশ আশা করবে না; রাজনৈতিক প্রেরণায় উৎসরূপেও আর হয়ত চিহ্নিত হবে না তাঁর সাহিত্য। কারণ

আমাদের সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিমধ্যে নিশ্চিত পরিবর্তিত হবে। কিন্তু যেখানে তিনি আমাদের চিত্তকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন, মানবিক মূল্যবোধের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, দেশকে ভালবাসার মন্ত্র এবং আমাদের উপহার দিয়েছেন সংবেদনশীলতা সেখানে তিনি সাধারণের কাছের মানুষ বলে পরিগণিত হবেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রধান স্রষ্টা ও মূল স্তম্ভরূপে নন্দিত হবেন ভাবীকালেও। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসেই লুপ্ত হয়ে যায়নি, নতুন যুগের জন্য নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি ন্যস্ত হয়েছে তাঁর পরবর্তীকালের স্রষ্টাদের উপর, অখ্যাত জনের, নির্বাক মনের কবিকে এ যুগে উদ্ধার করতে হবে নিপীড়িত মানুষের মর্মের যত বেদনা; সৃষ্ট ঐতিহ্য, যে অনুপ্রেরণাই রাখে আমাদের সামনে।[৩৮]

বাংলা একাডেমিতে কর্মরত শামসুজ্জামান খানের বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্ক ও তার কিছু টীকা-ভাষ্য শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমী [ঢাকা] থেকে প্রকাশিত সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাধিকার-এর [তৎকালীন সম্পাদক ডঃ মযহারুল ইসলাম] শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৭৪ [দ্বিতীয় বর্ষ / প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা; পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৮০; জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৪]-র ছাপা হয়েছিল, পৃ: ২৬৫-২৭৮। কিন্তু এখানে সংকলনের সময় অনিবার্য কারনেই শিরোনাম বদল করে 'বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিতর্ক ও নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ' নাম রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহুবার বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম-বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ফের বিতর্কের সূচনা হয়েছে। 'উত্তরাধিকার' ত্রৈমাসিকের নববর্ষ ১৩৯৩ সংখ্যা রবীন্দ্রবিষয়ক এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ দিয়ে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র বিতর্ক। ডঃ মহম্মদ শরীফ তাঁর ঐ প্রবন্ধে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কৃপণ ও প্রজাপীড়ক জমিদার এবং সাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। ঐ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পজগতের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই তথ্যহীন উক্তির প্রবর্তনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূচনা হয়েছে ফের। ডঃ হায়াৎ মামুদ তাঁর

১৩. সমকাল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে ১৯৫৭ সাল হতে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সরকার যখন ইসলাম সংস্কৃতির নামে উন্মত্ত, তখনো সমকাল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকীতে সমকালের সাড়ে সাতশ' পৃষ্ঠার বিপুলায়তন রবীন্দ্র-সংখ্যা একটি ইতিহাস।

১৪. সমকাল, চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৮।

১৫. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ জুন, ১৯৬৭।

১৬. দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জুন, ১৯৬৭।

১৭. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জুন, ১৯৬৭।

১৮. ঐ।

১৯. আবদুস সবুরের ভাষণ, জাতীয় পরিষদের কার্যবিবরণী, ১৯৬৬ ৬৭।

২০. আবদুল্লা আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর তরুণসমাজের বলিষ্ঠ মুখপত্র। ষাটের দশকে এর কালোপাহাড়ী ভূমিকার দিকে তাকিয়ে অনেকে একে যুবরাজ নামে চিহ্নিত করেছেন।

২১. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভবিষ্যত, আবদুল্লা আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর।

২২. ঐ।

২৩. সংস্কৃতি সংসদের মুখপত্র চিরকুট' হুমায়ুন কবির সম্পাদিত, ১৩৭৫।

২৪. সাপ্তাহিক সিনেমা পত্র চিত্রালীতে প্রকাশিত।

২৫. দৈনিক বাংলার [পূর্বনাম দৈনিক পাকিস্তান] সাংস্কৃতিক মুখপত্র যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। যে মাসের প্রথম সংখ্যাতেই এই বিতর্কের সূচনা।

২৬. ঐ। ১৯৭২।

২৭. ঐ। ১৯৭২।

২৮. বিচিত্রা, ৬ মে, ১৯৭২

২৯. পূর্বদেশ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৭৯।

৩০. ঐ

৩১. ইত্তেফাক, ২০ শ্রাবণ ১৩৮০

৩২. দৈনিক বাংলা' ২৫ বৈশাখ, ১৩৭৯।

৩৩. ১৯৭৩।

৩৪. বিচিত্রা', ২০ আগস্ট, ১৯৭৩।

৩৫. সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, আহমদ শরীফ, পৃ: ৭৫-৭৬।

৩৬. ঐ। পৃ: ৭৭।

৩৭. মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ, আহমদ শরীফ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা', পৃ: ৭৭।

৩৮. বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ: আহমেদ হুমায়ুন, পৃ: ৯৩-৯৬।

রবীন্দ্রনাথ বনাম সাধারণ মানুষ/৪

রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ মানুষও চায় রবীন্দ্রনাথকে জানতে, বুঝতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছেন, বিশেষতঃ তিনি শেষজীবনে অন্তর থেকে তাদেরই লোক হয়ে যাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনের সৃষ্টিতে সে ছাপ রয়েছে। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ আজও 'অধিকতর মানুষের' কাছে পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু কেন? বাধাটাই বা কোথায়? সত্যি কি অনন্তকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ড্রয়িং রুমের বন্দি হয়েই থাকবেন? সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়ার এই রাবীন্দ্রিক বাসনার চিত্র এবং জীবন সংগ্রামী মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথের চেহারাটাই বা কেমন, এবং সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না? এমনি ধরনের একটি জটিল বিষয় নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা এবং তারই পাশাপাশি কতগুলো প্রস্তাবনা রেখে এই পর্যায়ের বিষয়বস্তু নির্মাণ করা হয়েছে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনে রবীন্দ্রনাথ

এক

এক এক জন মানুষের জন্মে চিরকালীন মানবপ্রবাহের ঋণ থেকে যায়। সর্বসময়ের মানুষেরই থাকে উত্তরাধিকার। এমনই এক মানুষ রবীন্দ্রনাথ। পার্থিব কোন্ বিশাল বস্তুর দ্বারা রবীন্দ্র প্রতিভা উপমিত করা সম্ভব আমাদের জানা নেই। শুধু বলা চলে 'গগন নহিলে তোমায় ধরিবে কেবা'। জীর্ণ পুরাতন গ্লানিময় সব কিছু দূরে সরিয়ে চির নতুনের সাধনা মহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ভাষা ভাষীদের ঋণ মাতৃঋণের মতোই অপরিশোধ্য। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুব চেষ্টা করেও কৃপণের মতো কম কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টির সব পরিপূর্ণতা, সর্বাধুনিকতা, সর্ব ব্যাপ্তি ঘটেছে তো একা রবীন্দ্রনাথেই। চিরদিনই উগ্র স্বাজাত্যবোধের দাপট অস্বীকার করেছেন, নিন্দা করেছেন অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন বিশ্ব মানবের আন্তর্জাতিকতা। তাই সর্ব মানবীয় আস্বাদনে সর্ব মানবের অন্তরেই তাঁর অধিকারের আসন পাতা। নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন: 'আমি এসেছি এই ধরনীর মহাতীর্থে-এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি, সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষলন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। এই উক্তি জীবনাবসানের মাত্র দশ বছর আগের। ব্যক্তির দম্ভ অহংকার, ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি, জাত-পাত, অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মের বন্ধ্যা গোঁড়ামি ইত্যাকার সম্বলিত মানুষের 'ছোট আমি' কে সব সময়েই পিছনে সরিয়ে রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলার সাধনায় মানুষকে উজ্জীবিত করার দীক্ষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রজীবনের ষাট বছরেরও বেশি সৃষ্টিকাল প্রবাহের মধ্যে

এই সার্বভৌম নরদেবতার জয়গানই উচ্চারিত ধ্বনিত— প্রতিধ্বনিত হয়েছে সর্বক্ষণ। এই নরদেবতার পদতলেই শুধু মাথা নত করার কথা বলেছেন। মানুষের চেতনার 'বড়আমির' অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন, তার উদ্বোধন করেছেন। ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়েও সারা বিশ্বের হৃদয়ের যে চিরস্থায়ী প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তা এই আভূমি-সমুদ্র-হিমাচল মানবীয়তার কারণেই। কবিকে বলতে শুনি 'আমি সত্যি বুঝতে পারিনে সুখ দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা প্রবল' এই বোঝা না বোঝার দোলাচলতার টানাপোড়েন কবির জীবনে স্পষ্টতই লক্ষণীয় হয়। বলাকা পর্ব থেকে সমগ্র বিশ্ব মানবের শুধু সুখ-দুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ ভালবাসার টান নয় বৃহৎ মানব সংসারের উপর ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর আক্রমণ-লাঞ্ছনা-অপমান-শোষণ-শাসন-ত্রাসন কবিকে প্রবলতরভাবে বিশ্বসমাজের নব দেবতার সাথেই সংলগ্ন করে রয়েছে চিরদিন।

সৌন্দর্যের সুদূরাভিসার থেকে কবির জীবন-সাধনা-তরী ব্যাপক মূঢ়-ম্লান মূক মুখের মানবধারার ঘাটে এসে ভিড়েছে। আর জীবনের অন্তিমক্ষণের মাত্র তিনমাস আগে মৃত্যুদ্বারলগ্ন মহাকবি উচ্চারণ করলেন: রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম / জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়, / রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ / চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় / সত্য যে কঠিন; কঠিনেরে ভালবাসিলাম / সে কখনো করে না বঞ্চনা'। পৃথিবীর রূপের জগৎ, সৌন্দর্যের জগৎ বেশ কিছুদিন থেকেই রক্তপ্লাবিত, কলঙ্কিত ও বারুদ ঝলসিত দেখেছেন বারবার। ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়' লোভীর নিষ্ঠুর লোভ এবং বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ এসবই কবি বেদনায়-যন্ত্রণায়, ক্রোধে-প্রেমে-অভিমানে উদ্বেগে অবলোকন করেছেন। ভয়ানক-রুদ্র-কঠোর-কঠিন সত্যের মুখোমুখি না হয়ে গত্যন্তর থাকে নি। অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিতে হয়েছে কবিকে, যে দায়-দায়িত্ব সশ্রমে পালন না করলে মহৎ সৃষ্টির কলম-তুলি বেশিদিন ধরে রাখা যায় না। এই বোধ বোধিতে সজাগ থেকেছেন আজীবন।

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে'তে দুঃখ-ব্যথা ভরা কষ্টের সংসারে দারিদ্র্য শূণ্যতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকারে অন্ন-প্রাণ ও আলোর প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কবির আবাহন, শেষ পর্বে জন্মদিনের ঐকতান কবিতাতেও সেই যুগান্তকারী প্রান্তিকারী কবির

পথচেয়েই থেকেছেন। এই কবি সম্বিৎসা এই পরিবর্তন মনস্কতায় ধারাবাহিকতা রবীন্দ্র মহাজীবনের গতিমুখ। উপনিষদের শান্ত সমাহিত তপোবনাশ্রমের নিরুপদ্রব গৃহকোণের জীবনদেবতার অর্চনা কোথায় হারিয়ে গেল! অসীম এসে মানব সমাজ-সংসারের 'সীমানায় বাঁধা পড়লো। সমগ্র জীবনে এক রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেকে ভেঙে ভেঙে নতুন নতুন রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন বা গড়ে তুলেছেন। এমন ভাঙা-গড়ার মধ্যে উপনিষদের কবির জীবনদেবতা কবে বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার মূল কথা হল মানবিক শ্রেয়বোধের ভিত্তিতে ভারতের সংগে আধুনিক বিশ্ব, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগে প্রাচ্যের সংযোগ সাধন। বিশ্বের খণ্ড খণ্ড স্বরূপকে সমগ্রের দৃষ্টিতে তুলে ধরার সাধনা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশ্বভারতীর সৃষ্টি। বিশ্ব মানব দেবতার ভাল-মন্দ 'মান অপমান' লাঞ্ছনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মহাকবিকে আমরা প্রতিদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছি। তাঁর মানবতাবাদ ছিল মানুষের বিজ্ঞান-চেতনা, বস্তু-বিশ্বাস ও আত্মিক শক্তিভিত্তিক পরমত-সহিষ্ণু বিশিষ্ট এক প্রতীতি। এই গতিশীল মানবতাবাদ তাঁকে সারাজীবনকাল ধরে সাধারণ মানুষের কর্মের মধ্যে, শ্রম শক্তির মূল্যবোধের মধ্যে নিমগ্ন রেখেছে। এই গতিবাদের মধ্যে সামাজিক-রাষ্ট্রীক-আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ের একটা সামগ্রিক সামঞ্জস্যবোধ ছিল দীর্ঘদিন পর্যন্ত। কিন্তু শেষ জীবনে এসে এই সামঞ্জস্যবোধের বাঁধন নিতান্তই শিথিল হতে দেখা গেছে, গ্রন্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সাধনার প্রতীক, 'বড়ো ইংরেজের' থেকে বেনিয়া সাম্রাজ্য লোভী, পশু শক্তি-দাম্ভিক 'ছোট ইংরেজের' দাপট দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ধনবাদের অবক্ষয়ী পরিনাম দেখে শংকিত হয়েছেন। আধ্যাত্মিক আবেগের চেয়ে যুক্তিবাদ ক্রমশই রবীন্দ্র ভাবনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেছে। নিজের ব্যক্তি সত্তার খোলস ভেঙে বিশ্বের সংগে যুক্ত হবার মধ্যেই নিজের জীবনের সার্থকতাবোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ, অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস, মানুষকে একারণে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য এবং বিপদের দিনে মানবিক শক্তির প্রতি আস্থাহীন হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা ইত্যাকার বিষয় কোনদিনই মাথা তুলতে পারেনি। তাঁর পারিবারিক জীবনচর্যা, জীবনাদর্শ, ধর্মপ্রাণতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠাগত

অবস্থান, পরশ্রম নির্ভর জমিদারীর আয় ইত্যাদির সাথে সারাজীবনের রবীন্দ্রনাথের অমিল কম নয়।

উনিশ শতকী নবজাগরণের গতিশীলতা মহাকবিকে এক কথায় কালজয়ী মহানায়কের প্রতিষ্ঠা দান করেছে। প্রাচীনের গর্ভে নতুনের আবির্ভাবকে বারংবার সম্বর্ধিত করে সমাজের সচলতায় গভীর বিশ্বাস রেখে মানুষের কর্ম সাধনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। কবির ভাষায়, 'পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎ প্রবাহের সংগে সমগতিতে যদি না চলতে পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিকীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পেঅল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবন চর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো, বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এইরকম নিয়ম' এই চির চলিষ্ণু মানব গতিধারার জয়গান সমগ্র রবীন্দ্রজীবন সৃষ্টিভাবনার মধ্যে বিধৃত হয়ে থেকেছে।

দুই

মহাকবির সৃষ্টি সাধনার পর্যায়ক্রমিক এবং কালানুক্রমিক বিচার করলে তার জীবন ধারার লক্ষ্য যে গণমানসের মুক্তিতেই নির্দিষ্ট হয়েছিল তা নিয়ে দ্বিধা সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আর্যসভ্যতার প্রাচীনভূমি ভারতবর্ষের সব মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সাম্যের স্বপ্ন, যুগযুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানবমুক্তির বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন সাধ লালন করেছেন। শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন যে মহারবীন্দ্রনাথ তিনিই আজকের ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর শ্রেণী বিসম সমাজ বদলাকাঙ্খী ও শৃঙ্খল মোচনাকাঙ্খী সংগ্রামে আপাদমস্তক নিমগ্ন মানুষের রক্তের আত্মীয়। রবীন্দ্রজীবন, রবীন্দ্রসৃষ্টি, রবীন্দ্রজীবনদর্শন তাঁর সমগ্র জীবনের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সংগে যুক্ত করেই আমাদের ভাবতে হবে। আর তাতেই স্পষ্ট হবে যে অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর তাগিদ, নিরক্ষর ও দরিদ্র স্বদেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয় যোগকরার ব্যাকুলতাই তাঁকে সারাজীবন একটা উপযুক্ত শিল্প মাধ্যমের সন্ধানে নিযুক্ত রাখতে

পেরেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরকালের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক ও উপাদান সমূহকে আত্মস্থ করে সেসবকে নবলব্ধ আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বজনীন সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশের সাথে একান্তভাবে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন বলেই নিজের অন্তর্নিহিত শ্রেণী অবস্থানের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে নিরবধিকাল এক অন্তর্মনা সংগ্রাম চালাতে পেরেছেন। কখনও দারুণ উদ্দীপ্ত হয়েছেন, কখনও ক্লিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কখনই নিরপেক্ষতার ভানকে প্রশ্রয় দেননি। এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিরকালীন পুরোধা প্রাণ-পুরুষ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই কবি সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধ ও তার পরিণতি দেখে অন্তর্গহীনতা ছেড়ে অনেকাংশে বহির্জগৎমুখী পরিক্রমনে সামিল হচ্ছিলেন। তারপর থেকে দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং হিজলী জেলে রাজবন্দী হত্যার মতো নারকীয় ঘটনা দেখে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের বীভৎস চেহারায় কবি আতঙ্কিত হয়েছেন। আবিসিনিয়া স্পেন-জাপান-জার্মান ইত্যাদি দেশে দেশে হিটলার-মুসোলিনী-ফ্রাঙ্কোদের-ফ্যাসিবাদী বর্বরতায় মহাকবির কবিজনসুলভ নিরপেক্ষতা অতি দ্রুত দূরে সরে যায়। অপরপক্ষে সমগ্র বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত-অপমানিত-মানবতার প্রতি কবির পক্ষপাত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। তখন দেশের মধ্যে সাম্যবাদী দলের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে এবং সাম্যবাদী মতাদর্শের কাজকর্ম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। দেশের মধ্যেকার গান্ধীজীর অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশ কিছুদিন থেকে ভাটার টান আবার নানা মত নানা পথের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তখন জোয়ারের কল্লোল। অহিংসা আন্দোলনের পা থেকে ক্রমশ মাটি সরে যেতে দেখা গেছে। অহিংসা আর ক্ষমা যখন ভীরুতা আর হীন দুর্বলতার নামান্তর হয়ে ওঠে তখন আপোষহীন কবি কঠোর হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রত হওয়ার পরামর্শই বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন কবি।

১৯৩০ সালে বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখে উপলব্ধি করেছেন যে না দেখলে তাঁর আজীবন তীর্থ পরিক্রমা অসমাপ্ত থাকতো। যা দেখেছেন তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন যা অন্য কোন দেশের মতোই নয় একেবারে মূলে যার প্রভেদ রয়েছে। যা দেখে নিজের দেশের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মানুষদের কথা মনে

হয়েছে যারা চিরকালই মানুষের সভ্যতার অখ্যাত অজ্ঞাত থেকে যায়, সংখ্যায় তারাই অনেক অনেক বেশি। 'সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান…তারা সভ্যতার পিলসুজ। মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে'। পৃথিবীর আর কোন মানবতাবাদী-সাহিত্যিক শিল্পী-স্রষ্টা শোষিত -বঞ্চিত মানবতার চরম দুঃখ দুর্দশার এমন বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ দিতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার দমন পীড়ন অপমান লাঞ্ছনার যে কোন দিন অবসান ঘটতে পারে এবং সমগ্র দুনিয়ার সকল প্রত্যন্তেই যে একদিন এই শোষণ ব্যবস্থার অবসান মানুষ ঘটাবেই, এই আমোঘ প্রক্রিয়ার মধ্যেই যে মানুষ প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়েই চলেছে এই বিশ্বাস রাশিয়া ভ্রমণের আগে পর্যন্ত কবির ছিল না। ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ অবসানের পরে জনগণসাধারণের বিপুল অবারিত আত্মমর্যাদা কবিকে এক সম্পূর্ণ নতুন সমাজ বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্দীপিত করেছিল। তাবৎকালের সংস্কারে, দূর থেকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বসবাস করে কবির যে উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব ছিল রাশিয়ার নির্ধনের শক্তি সাধনা দেখে অকম্পিত কণ্ঠে কবি বলতে চেয়েছেন: 'আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের। যদি কেউ বলে দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তা হলে অমরা কোন্ মুখে বলব যে তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই' সে সময়ে পরাধীন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি, সমাজ ভাবনা, পারিবারিক সীমাবদ্ধতার হাজারো পিছুটান ও সংস্কার কাটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এমন পক্ষপাতী বক্তব্য প্রকাশের পরমউদার মানসিকতা রবীন্দ্রসমকালে খুববেশী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সম্প্রদায়, বহুজাতিকতা এবং ধর্মের ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। যারা রবীন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মিক তপোবনাশ্রম ভারতের উপনিষদের কবির বাইরে অন্য পরিচয় দেখতে চান না বা ভাবীকালের মানুষের সামনে এমন এক ভারতীয় ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাদানে অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক প্রতিবেদন সৃষ্টি করেন তাদের বারবার 'অচলায়তন' এবং 'রক্তকরবীর' মর্মবাণী অনুধাবনের পরামর্শই দিতে হয়। আচার অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্ম যে সমাজেতিহাসের মানুষের শোষণের কতবড

রাশিয়ার রক্তকরবীর গোঁসাই ঠাকুর আর সর্দারতন্ত্রের অশুভ আঁতাতের মধ্যে তার নগ্ন স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে।

রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে কবির ভাষায়: 'এ বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।' সত্তরোর্ধ বয়সে জীবনে খ্যাতি আর স্বীকৃতির শিখরে পৌঁছেও কবির এই বিপ্লবকে অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলে মেনে নেওয়া তাঁর অনিবার্য মানবতাবোধ ও অনিবার্য অমোঘ এক আগামী বিশ্বের মানবেতিহাসের পূর্ব লিখন সূচিত করলো। আমাদের অস্তিত্বের জগৎ থেকে অনেক দূরের মহাকাশে একটা নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও আমাদের দৈনন্দিন সংসারের তেমন হানি হয়না। কিন্তু পূবের দিকে তাকিয়ে ঘাসের যে প্রতিটি মাথা রোজ হেসে ওঠে সেখানে প্রকৃতির অসীম হৃদয়ের সকল যত্ন ও কৌশল যুক্ত না থাকলে তো চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা স্রষ্টাদের কয়েকজনের সারির প্রথম দিকেই বসানো সমীচীন। রবীন্দ্র কবির যুগ-দেশ পরিবেশ-পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার বিচারে তো নিশ্চয়ই মনে হবে যে তদনুপাতে তাঁর সৃষ্টির আন্তরিকতা তীব্রতা ও গভীরতা সত্যিই অন্তহীন। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ আমাদের দেশীয় জীবনে যে স্থবিরতা যে পঙ্গুতা এনে দিয়েছিল, সচল সমাজের সাবলীল সঞ্চরণে যে প্রচণ্ড প্রতিবদ্ধতা সৃষ্টি করেছিল একা রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদী সৃষ্টি আর বিশ্ব মানচিত্রের সকল প্রত্যন্তের সকল রকমের ইতিবাচক ধারাস্রোত ও মালিন্যমুক্ত সর্বচারী মানবীয় দৃষ্টিভংগী সকল পিছুটানের বাঁধ কেটে মুক্ত জলধারায় প্লাবিত করল আমাদের দেশ-কাল-সমাজ আর সংস্কৃতির গতিমুখ।

তিন

আজ এমন সময় এসেছে, যখন আমাদের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিচার করে দেখা দরকার যে কবির উত্তরাধিকারের মহা সম্পদ নিয়ে আমরা কতটুকু

এগোতে পারি, আমাদের বর্তমানের কঠিন-কঠোর-শোষণ কবলিত শ্রেণীসমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্ব কতখানি ধারালো করতে পারি। সমাজ পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্খিত ফল কতটুকু বা আমরা পেতে পারি। অন্যায় ও শোষণের নিগড় বদ্ধমূল অচলায়তন ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করে স্বার্থ-হীনভাবে বারবার প্রকাশ করেছেন নিঃসন্দেহে। বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁর পারিপার্শ্বিক পটপরিবর্তনের অপরিহার্যতায় নিতান্ত নিঃশঙ্ক ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর নিজের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে যোগ্য নেতৃত্বের আহ্বানে সচকিত করে তুলতে চেয়েছেন তেমন এক কবিকে, তেমন এক স্রষ্টাকে, যিনি কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে মাটির মানুষের একান্ত কাছাকাছি থাকবেন। কি ভাবে সমাজ ও শাসনকাঠামো গড়লে সর্ব মানুষের কল্যাণ স্থির নিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে তা নিয়ে বিধি ও বিহিতের উদ্ভব। কিন্তু এক মহাপ্রবল মানবিক বোধ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-চিন্তা উৎসে অক্ষুণ্ণ ছিল তাইই সবচেয়ে বড় কথা। এক সদা সক্রিয় প্রত্যক্ষ মানবিক ও সামাজিক কল্যাণভাবনার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করেছি। তাঁর এই চিন্তাশক্তি আমাদের ভাঙনের আবশ্যকতা বুঝিয়েছে, সর্বজনীন কল্যাণ আর্তির অপরিহার্যতার সমূলে আভূমি নাড়া দিয়েছে। কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কবি-ভাবনা স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ অনুযায়ী টিকলো কিনা তা খুব বড় কথা নয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার তাগিদে তিনি যে উত্তর-কালের মানুষকে সংগ্রামে উদ্যোগী হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন তাইই তো অনেক বড় সত্য। তাঁর আসমুদ্র-হিমাচল মানবীয়তা দিয়েই আমাদের স্থবির পায়ে গতির সঞ্চার করেছেন, স্তব্ধ হাতে অচলায়তনকে আঘাত করার যোগ্যতা এনে দিয়েছেন। তাঁর মানবিক কল্যাণ ধারণা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে—আমাদের অবচেতনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে—এ সবই তো তাঁর কাছে আমাদের ঋণ, অপরিশোধনীয় ঋণ।

নির্মোহ মুক্ত বুদ্ধির শিক্ষা আমাদের আর এক ঋণ। কোথাও বদ্ধমূলকতার পথ রোধ করে সামনে দাঁড়াননি। তাঁর বিশাল ছায়া আমাদের মধ্যে প্রশান্তি দিয়েছে, আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। নিজের ধ্যান ধারণায় একভাবে নিজেকে কখনও বন্দী রাখেননি এমন নির্মোহ বদ্ধমূলকতামুক্ত কল্যাণ বুদ্ধি আমাদের সম্মুখের যাত্রায় সবচেয়ে বড় পাথেয়। আত্মাভিমান সংশোধনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা-যে শিক্ষা আমাদের নির্ভুল পা ফেলবার যোগ্য করে তুলবে।

পরিণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন অনেকখানি 'আমি' বোধের দ্বারা পরিচালিত হন, নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত মানুষের সামনে বড় ক'রে তুলতে প্রবৃত্ত হন, নিজের কর্মকাণ্ডকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার কাজে নিজেকে কম-বেশী মগ্ন রাখেন এমন বয়সে আমরা এক মহা কর্মী মানুষকে পেলাম যিনি তাঁর তাবৎ কালের অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, নানা পিছুটান জনিত অক্ষমতার কথা বার বার যন্ত্রণা কাতর হৃদয়ে আমাদের সামনে অকপটে প্রকাশ করেছেন। নানা কারণে নিজের সাধ আর সাধ্যের মধ্যকার ফারাক্ সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। অথচ সমগ্র রবীন্দ্র সৃষ্টি কর্মের সহস্রভাগের এক ভাগও করতে না পারা মানুষকেও আত্মশ্লাঘা বোধে আস্ফালন করতে আমরা দেখছি স্বদেশে ও বিদেশে। বিদ্যার এমন বিনয় যা মানুষকে সমৃদ্ধতর করবে তা তো আমরা এই মহাকবির কাছেই শিখেছি।

বাঁধন ছেঁড়ার মন্ত্র তার মতো আর কে তেমন ভাবে জানেন? অজ্ঞানতা, ক্ষুদ্রতা, জগদ্দল পাথরের মতো মৌলবাদিতার শিকড় উপড়ানোর শিক্ষা তাঁর চেয়ে ভালো আর কে দিতে পারেন! আমাদের জীবনে শুধু তাত্ত্বিক ঐতিহ্য মাত্র নন বরং আমাদের চিরদিনের জীবনযাপনের সাথে সর্বাংশে বিজড়িত রবীন্দ্রনাথ সমূলে তাঁর সুবিপুল অস্তিত্ব নিয়ে পুরোপুরি সজীব হয়ে আছেন। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অবিনাশী নির্যাস ফল্গুধারার মতো আমাদের রক্তের শিরা উপশিরায় বয়ে চলবে। ব্যাপ্তি আর বিস্তারের এমন মহীরুহ কীর্তি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে নিতান্তই অতুলন।

রবীন্দ্রজীবনে প্রত্যক্ষ করা দু'দুটো বিশ্ব যুদ্ধের কুৎসিত বীভৎস এবং ফ্যাসিবাদী দানবীয়তার পরেও চিরকালের জন্য যুদ্ধ আর ফ্যাসিষ্ট আস্ফালন ব্যাপারটা দুনিয়া থেকে লুপ্ততো হয়ইনি বরং প্রতিদিনই সাম্রাজ্য লোভী, ক্ষমতা মদমত্ততাপুষ্ট আগ্রাসী যুদ্ধের দাপটে আমরা ক্লিষ্ট হয়ে আছি। অশুভ ঘাতক শক্তি মানব সভ্যতা ধ্বংস করার আন্দোলনে মেতে আছে। হিংসার উন্মত্ত দামামা বেজে চলেছে আমাদের বসতিতে, আমাদের প্রিয় পৃথিবীর চারদিকে। অন্ধ তীব্র বর্ণবিদ্বেষী শক্তির আক্রমণে দক্ষিণ আফ্রিকার বেঞ্জামিন মোলাইজের মতো কবির ফাঁসির মৃত্যু আমরা এখনও রদ করতে পারি না। জাত-পাত-বর্ণ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদ বুদ্ধির কারণে পৃথিবীর মানচিত্রের নানা প্রত্যন্তে প্রতিদিন লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছেন মানুষ। পৃথিবীর বাতাস-শস্যক্ষেত-

জলাশয়ে বিদ্বেষ বারুদের বিষ মেশাচ্ছে একদল কুচক্রী মানুষ। এ সবের পাশাপাশি শ্রেণী বোধ এবং শ্রেণী বোধ সৃষ্ট শ্রেণী ঘৃণা ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রত্যেক দিনই অধিক থেকে অধিকতর ভাবে ধারালো হয়ে উঠছে। বৃহত্তর মানবসমাজ-সভ্যতার শত্রু একদল ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীকে ব্যাপক মানব প্রবাহের শত্রু বলে চিহ্নিত করে পৃথকীকরণের কাজ সারা দুনিয়ায় অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ের শোষণ শাসন ত্রাসন সৃষ্ট বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-অবমাননার জগদ্দলটাকে দুহাতের সবল শক্তিতে সরিয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিত্য নৈমিত্তিক সংগ্রামে সামিল আছেন সমগ্র দুনিয়ার লক্ষ কোটি সাধারণ নাম গোত্রহীন মানুষ। কিছুতেই তাঁদের পা টলেনি কোনদিন। আর একজন বিশ্ব বিবেকবান মানুষ রোঁমা রোঁলার ভাষাতে বলতে হয় পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ব্যাপারটাকে চিরদিনের মতো লুপ্ত করার প্রয়োজনে বিশ্ববাসীকে আর এক অমোঘ শ্রেণীযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে, এর কোন অন্যথা নেই। দুনিয়ার সর্বত্রই তারই জন্যে মানুষ নিজেদের যোগ্য থেকে যোগ্যতর ভাবে প্রস্তুত করে চলেছেন। এমন সার্বিক মানবিক মূল্যবোধের প্রস্তুতির সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সাথে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভূমি নির্ভর অভিজাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক কারণেই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ঐতিহ্য সম্পর্কে কবি নিতান্তই নির্মোহ ছিলেন। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ জনিত সময়ানুগ আধুনিকতা এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া উনিশ শতকী নবজাগরণ স্নদ্ধ মানব ধর্ম মানবিক মূল্যবোধ এবং ইউরোপের শিল্প বিপ্লব সৃষ্ট বিজ্ঞান ভাবনা সব মিলিয়ে কবির মধ্যে যুক্তিবাদের বীজ উপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। যার ফলে সম্পূর্ণ একজন গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা তাঁকে পেলাম। তাই তাঁর মানবিকতা কখনই জীবন প্রবাহ বিচ্ছিন্ন অর্থহীন নয়। নানা পথে নানা দলে যুগ যুগান্তর হতে মানব সংসার প্রবাহের নিত্য প্রয়োজনে যাঁরা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, নতুন নতুন সৃষ্টিরপণ্য নিয়ে নতুন নতুন ঘাটে পেশীতোলা হাতে দাঁড় টেনে চলে, শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে যে মানবশ্রেণী কাজ করে চলেছে তাদের জয়পতাকা আকাশে অনেক উঁচুতে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে পতাকাকে মাটিতে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা কোন শক্তিরই নেই সেই মহাশক্তিধর মানবশ্রেণী যা অমারাত্রির দুর্গ তোরণ

ধূলিতলে মিশিয়ে দিয়ে নবজীবনের আশ্বাস নিয়ে আসছে সেই মানব অভ্যুদয়ের নান্দী উচ্চারণ করে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও কবি ফ্যাসিষ্ট হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর সুনিশ্চিত জয় ঘোষণা করে ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে 'পারবে ওরাই পারবে'। এই বিশ্বাসের উত্তরাধিকার আমাদের। আমাদের অজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা-ভীরুতা-আত্মপরায়ণতা, অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিকতা মূঢ় অহংবোধ থেকে মুক্ত হবার প্রক্রিয়ায় মগ্ন হবার উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। সেই শিক্ষার উত্তরাধিকার আমরা প্রজন্ম পরম্পরায় বহন করেই চলবো।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চোখে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী

রবীন্দ্র গবেষক, রবীন্দ্রভক্ত বা রবীন্দ্র সাহিত্যের যেকোনো সাধারণ পাঠকই জানেন সাধারণ মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিল্পী ও চিন্তানায়ক কোনোদিনই তাদের চিন্তা, চেতনা, দুঃখ-যন্ত্রনা আবেগ বা সংগ্রামের যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি নিজেও এই সত্যটুকু কখনো গোপন করেন নি। তথাপি এই মহৎ মানুষটির সাহিত্য বা জীবন চর্যা আলোচনায় বারবার এই প্রসঙ্গটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এতবড মাপের একজন শিল্পী, সুদীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করতে করতে যিনি তাঁর বিশাল সাহিত্য সম্ভারে বিশ্বসংসারের অসংখ্য আশ্চর্য, রমনীয়, মায়াময়, বেদনার্ত জটিল মানুষ ও মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, সমকালে দেশ ও বিশ্বের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনায়, আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৎ ও নির্মোহ অবস্থান থেকে, সবসময়ই চেষ্টা করেছেন স্বার্থপ্রনোদিত না হতে যখনই বুঝতে পেরেছেন নিজেকে শুধরে নিতে তিলমাত্র দ্বিধা করেননি। সেই আকাশছোঁয়া পুরুষ এই বিশাল দেশ বা বিশ্বের সংখ্যাতীত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, জীবন ও চিন্তার প্রতিনিধি হোন বা না হোন, তাদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা, দৃষ্টি-ভঙ্গী কি ছিল, তা জানতে চাওয়ার কৌতূহল স্বাভাবিক।

প্রশ্নটা সরাসরি করলে এরকম দাঁড়ায়—রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক ভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে? সমাজ যে শ্রেণী বিভক্ত তা তাঁর অজানা ছিল না, যদি এই বিভক্ত সমাজে তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষের মানুষ হন তাহলে তা কি তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক চরিত্র ছিল' না আরোপিত? মানুষের দুঃখ যন্ত্রনার নিবৃত্তির যে বৈজ্ঞানিক পথ ও বীক্ষণ আজ প্রশ্নাতীত ও বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে তার মত কি? তিনি নিজে এ ব্যাপারে কোনো মত দিয়েছেন কিনা? মানুষের জীবনের যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রনা, নিজেদের মধ্যে নিরন্তর ভেদাভেদ, হানাহানির জন্য কাকে বা কাদের তিনি দায়ী করেছেন?

যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান কি ছিল ? এই রকম নানা জটিল ও গুরুতর প্রশ্ন এই উপলক্ষে ওঠা একান্তই স্বাভাবিক। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ করে এই সব প্রশ্নের নিষ্পত্তিকরা এক বিশাল গবেষনা ও অপরিসীম অধ্যবসায়ের কাজ। এই প্রবন্ধে সূত্রাকারে শুধু কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করার প্রয়াস পাবো।

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের নানা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে যত আলোচনা, সমালোচনা ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে তার কোনো তুলনা সম্ভবত নেই। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুই অর্ধ জুড়ে বিশাল হিমালয়ের মতো তিনি বিশ্বে বিরাজ করছেন। জীবন ব্যাপী অখণ্ড কর্মসাধনায় সম্ভবত ভারতবর্ষে আর কোনো একজন মানুষ একই সঙ্গে আপন স্বদেশকে এত মহীয়ান আর নিজেকে এত গৌরবান্বিত করতে পারেননি। তার সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন তাৎপর্য ও গুণাবলীর দিকে সচেতন নজর রেখে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার। রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রচেতনার এই মহৎ বৈশিষ্ট্য হল তার নিরন্তর বিবর্তন।

এ তাঁর মানস লক্ষণেরও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। চিন্তা ও তার প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্যকার রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর বিবর্তিত হয়েছেন, নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর মানস গঠনের সুগভীর ব্যাপ্তি ও প্রসার এর আভ্যন্তরীন কারণ, সমকালীন বিশ্ব পরিবেশ, পরিস্থিতি ও তার প্রভাব হল তার বহিরঙ্গের কারণ। রবীন্দ্রনাথের বড় হয়ে ওঠার কাল ও বড় রবীন্দ্রনাথের কর্ম সাধনার কাল, অর্থাৎ বিকাশমান ও বিকশিত রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতিটি মানব ইতিহাসের বহু যুগান্তকারী ও মহৎ ঘটনায় ভরপুর। উনবিংশ শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠিত হয়ে ওঠার প্রাথমিক যুগ। এরমাত্র কয়েক দশক আগে সমাজ বিকাশের ধারায় সবচেয়ে আগুয়ান এই শ্রেণীটির জন্ম। অষ্টাদশ থেকে বিংশ এই প্রায় তিন শতাব্দী ধনবাদী সভ্যতার সংহতি এবং বিকাশ, চরম বিকাশ ও পতনের কাল। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়গুলির বিস্মিত, হতবাক ও শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী এবং সচেতন অনুধাবনকারী ও দর্শক। তাঁর সময়েই নিষ্ঠুর যুদ্ধের বর্বরতা, দুনিয়ার প্রথম মহত্তম প্রকৃত মানব মুক্তি, ফ্যাসীবাদের উন্মাদ দাপাদাপি। প্রেম,

উদারতা, জীবন এবং হিংসা, নৃশংসতা ও ধ্বংস তিনি পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করেছেন। লক্ষ্য করেছেন ধনবাদী সভ্যতার উত্থান, অঙ্গীকার, সংকট, স্খলন ও পতনের অনিবার্যতা। ধনবাদী ও সমাজতান্ত্রিক—পরস্পর বিরোধী দুই বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর তুলনামূলক রূপায়ন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর আজন্ম লালিত উপনিষদিক বিশ্বাস ও শিক্ষা বারবার আহত ও রক্তাক্ত হয়েছে সমকালীন ঘটনাবলীর কঠিন আঘাতে। যার প্রতি তিনি প্রথমাবধি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাতে স্থিতধী থাকতে পারেননি, কিন্তু অন্তহীন বিশ্বাস রেখেছিলেন মানুষের প্রতি। জীবনের সায়াহ্নে এসে ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধের ভয়াবহ মানবতা বিরোধী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে বঞ্চিত মানব-শিশুর মতো, কিন্তু সন্ন্যাসীর মতো তিনি উচ্চারণ করেছেন : 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।' কিন্তু তখনো অমিত শক্তিতে যাকে 'পরিত্রানকর্তার' আসনে বসিয়েছেন সে হল মানুষ—বিচ্ছিন্নতাকামী ধনবাদী সমাজ তিল তিল করে বিষ পান করানোর মতো যাকে আমাদের অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে, বিপরীতমুখী যে কথাকে সে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছে গভীর উপলব্ধিতে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের শেখানোর জন্যই, হুঁশিয়ার করার জন্যই শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্তিমউচ্চারণটি করেছেন : 'আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে......মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

এ তাঁর চরম পরিণত মননের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। স্বাভাবিকভাবেই এখানে পৌঁছতে তাঁকে ভেঙে আসতে হয়েছে দুস্তর পথ। ৩০ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ মানসী, সোনার তরী ও অন্যান্য বহু রচনার পর বলেছেন : 'এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে হে কল্পনে, রঙ্গময়ী...'

আরও ৫০ বছর পথ পরিক্রমার পর তাঁরই বয়স্ক অভিজ্ঞতার উচ্চারণ : 'যে আছে মাটির কাছাকাছি সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।'

মধ্যযৌবনে তিনি ব্রাত্যজনের দিকে তাকাতে চেয়েছেন। আবেগকে বাদ দিলে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে এই পর্যায়ে সে ইচ্ছা

শুধু তাঁর সহানুভূতি ও রুচিশীলতার পরিচায়ক। সার্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজে বড় হওয়া এক, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের কাজে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা অন্য কথা। রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন ধনাত্মক সন্দেহ নেই, তাঁর ভাবনার এই গতি পায়ে পায়ে বহুদূর পথ অতিক্রম করেছে এবং শেষ জীবনে তিনি এই নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি করেছেন। গায়ে মাটি লাগাতে তিনি পারেননি। এই সীমাবদ্ধতার সহজ স্বীকৃতিতেই তিনি মহৎ শিল্পী। সত্যকে চিনেছেন তিনি অভিজ্ঞতার পরতে পরতে, সেই নিষ্ঠুর সত্য কঠিন আঘাত করেছে তাঁকে বারে বারে। এই সততা থেকেই নির্গত হতে পারে এমন প্রাজ্ঞ উচ্চারণ, তিনি অসংকোচে বলতে পারেন—প্রিয় হয়ে ওঠার নয়, এখন আমার সত্যকে মেনে নেবার এবং তাকে ঘোষনা করার কাল।

রবীন্দ্রচিন্তার এই পরিবর্তনশীলতা পরিমানগতভাবে গভীর ও ব্যাপক এবং নানা পর্যায়ে তাঁর এই নিজেকে বারবার ছাড়িয়ে যাওয়া এত বিস্ময়কর, যে এমন কি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার নতুন গুনগত ধর্মের জন্মাভাসও তাঁর চিন্তা ও সাহিত্যে হঠাৎ কোথাও কোথাও আশ্চর্য ভাবে উঁকি দিয়ে গেছে। উপনিষদিক প্রভাব ও ভাববাদী পরিমণ্ডলে আজন্মলালিত রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত মন দার্শনিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েও বহু সময়ে এমন বহু উক্তি করেছে যার সঙ্গে, নব যুগের বৈজ্ঞানিক বীক্ষনের আশ্চর্য মিল। সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথ যেখানে পৌছতে পারেননি, শিল্পী ও রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সেখানে কখনো পৌছতে চান নি, সংবেদনশীল সচেতন দ্রষ্টা সেই রবীন্দ্রনাথই অভিজ্ঞতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে আজন্মলালিত সংস্কার ও বিশ্বাসকে দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করতে শংকিত হন নি।

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাণ্ডার এত বিশাল ও বহুমুখী যে তার বিস্তার গভীরতা ও ব্যপকতা সমস্টা মনে রেখে একটি বিশেষ প্রসঙ্গে মতামত গঠন করা একটি প্রায় অসম্ভব কাজ। কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ চিঠিপত্র ও আরও নানা ধরণের বিচিত্র রচনা সবেতেই তার অনবদ্য প্রকাশ। জীবন রসিক সাহিত্যিক সব ধারাতেই উজ্জ্বল, ভগীরথের মতো তিনি গঙ্গা প্রবাহের অগ্রদূত। চিত্রশিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ, আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসাবে তিনি অনন্য রূপময়। আবার সংগঠক, চিন্তাবিদ বা বাগ্মী রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও

আকাশ ছোঁয়া। এসবের দীর্ঘ তালিকায় আমরা যাব না। দু'তিনটি প্রসঙ্গ এনে আমরা দেখাতে চাইবো—তাঁর বিপুল সৃষ্টিতে সমকালের মানুষ কিভাবে এসেছে, রবীন্দ্রভাবনায় বা গল্প-উপন্যাস-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বা পাত্রপাত্রীর পাশাপাশি সেই ব্রাত্যজনেরা কিভাবে কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে, তাদের বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মধারা কেমন এবং সর্বোপরি এই মানুষের প্রতি তাদের স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীটি কি।

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য হবে যে স্বভাব ধর্ম অনুয়ায়ী এক্ষেত্রেও অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চরিত্র অঙ্কনের সময়ে বা বিশ্বের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধ বা বক্তৃতার আকারে রাখার সময়েও রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-অনুযায়ী অর্থাৎ গতিশীল ও ক্রমবিবর্তিত। এই বিবর্তনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে আমরা তার সুনিশ্চিত ও এক ইতিবাচক পরিনতি দেখতে পাবো। বলে নেয়া ভালো, প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্দ্রচর্চা, পূজো বা গবেষনার ধারায় এই আলোচনা অবশ্য তেমন গুরুত্ব পায়নি। সাধারণ মানুষের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনন ও ভাবনা, বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গীটি কি, যতটুকু পরিমানে তা আমরা অনুধাবন ও প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে পারবো ততটুকুই যে সমাজের হিত সাধন করা যাবে—এই সহজ সত্যটুকু কখনো সম্ভবত তাঁদের মনেও হয়নি। এই 'মানুষকে' তাঁদের ভয় কিনা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে সহজ সত্যকে মেনে নেয়া জীবনের অগ্রগতির সহায়ক। অগ্রগতিকে কেউ থামিয়ে রাখতে চাইলে অবশ্য তার পক্ষে সেই সত্য স্বীকার করে নেয়া প্রায় আত্মঘাতের সমান। রবীন্দ্র সাহিত্য ভাবনার সমস্ত বিশেষত্বকে মনে রেখে আপাতত আমরা এইটুকু বলতে চাই যে সাধারণ মানুষের চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বা তাদের সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে গতিময় রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, বিজ্ঞান ও তাঁর নিজেরও স্বভাবধর্ম অনুযায়ী যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই খানেই থেমে থাকেন নি।

একটা খুব দরকারী কথা বোধ হয় আগেই বলা উচিত ছিল। আমাদেব বর্তমান কেন্দ্রবিন্দু হল তিন অক্ষরের খুবই নিরীহ একটি সাধারণ শব্দ -- 'মানুষ' অর্থাৎ জনসাধারণ। বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা হল এই বিশ্বজগৎ, প্রাণ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত বস্তু নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এমন কি ধারণা

অবস্থা বা গুণাবলীও। প্রধানতঃ আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের কারণে এবং কিছুটা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে বস্তু বা অবস্তুর এই গতিময়তা। এই পরিবর্তন পরিমান ও গুণ—দুয়েই। এমনকি মানুষের মনোজগৎ কিংবা দয়া মায়া প্রেম ঘৃণা বা ভালবাসাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। শব্দ অর্থ বা ভাষার ক্ষেত্রেও নিয়মটা আলাদা নয়। আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়তো সব সময় লক্ষ করি না, কিন্তু শব্দ চর্চার বিশেষজ্ঞরা জানেন নিয়মিত ব্যবহৃত হতে হতে কিছু শব্দ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পালটে ফেলছে ক্রমাগত। বড় হতে হতে নিজেকে ছাড়িয়ে অথবা ক্ষয় হতে হতে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে এবং কোনো আশ্চর্য যাদুতে নয়, বিজ্ঞানের অনিবার্য নিয়মেই এক সময়ে তার গুনগত ধর্মও যাচ্ছে পালটে। শব্দটা নতুন নতুন ব্যঞ্জনা পাচ্ছে, হয়ে উঠছে আরও শক্তিমান।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে সবেমাত্র উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে পুঁজিবাদী সভ্যতার ঊষালোক, সেই সময়ে সর্বকালের নাট্য জগতের চিরন্তন ব্যক্তিত্ব উইলিয়ম শেক্সপিয়ারের আবির্ভাব (১৫৬৪)। সেই যুগ পৃথিবী ব্যাপী সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের যুগ। তাঁর নাটকের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা সাধারণ মানুষের যে চেহারা দেখেছি, শ্রেণী সচেতন দৃষ্টিকোন থেকে তাকে বিচার করলে সেই মানুষ সেখানে নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রাধান্য পায়নি। শেক্শপিয়ারের নাট্যবৈভবে সম্রাট, রাজকুমার রাজকুমারী, ধর্মযাজক, বণিক বা আমলার সাড়ম্বর আনাগোনা। সাধারণ মানুষ শেক্শপিয়ারের মঞ্চে ঢুকেছে ভীরু পায়ে, দলবেঁধে, যা ইচ্ছে বলেছে—নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। নাটকে সে কোনো দায়িত্ব নেয়নি। কারণ সমাজেও সে অপাংক্তেয়। সে সংখ্যায় বহু, কিন্তু সংঘবদ্ধ নয়, তাই পৌরুষহীন, বীর্যহীন ও তাচ্ছিল্যের। তার বহু নাটকের চরিত্রলিপিতে একটি চরিত্রের নাম Crowd। আলাদা ভাবে কোনো ব্যক্তির নাম তাতে নেই।

সবাই মিলেই ওরা এক দায়িত্বহীন, অধিকারহীন ব্রাত্য চরিত্র এবং তার নাম জনতা। অবশ্যই এই জনতার প্রতি নাট্যকারের মনোভাব করুণা ও সমবেদনা মিশ্রিত। তাদের শক্তিহীনতাকে শেক্শপিয়ার বস্তুগতভাবেই এঁকেছেন। এ হল পেছিয়ে পড়া অজ্ঞ সামন্ত সমাজের মানুষ। এ মানুষ নিজেকে চেনে না। জমিদারতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কোনো বিকাশ ঘটায় না, তাকে

সে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। ব্যক্তিরই যেখানে কোনো মর্যাদা নেই, স্বভাবতই, ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা, অনুভূতি বা স্বপ্ন কল্পনার কোনো সম্মানই সেই সমাজে থাকতে পারে না। অন্তহীন দুঃখ বেদনা, লাঞ্ছনা আর অবমাননার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মানুষ শুধু আপন ভাগ্যকে ধিক্কার জানাতে শেখে। তবু অনেকের হয়ে কেউ কেউ জনসাধারণের এই দুঃখ বেদনা অপমানে বিচলিত হয়ে কখনো কখনো দুঃসাহসী কিন্তু অপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদেব কথা উচ্চাবণ কবে ফেলে: '...The leanness that afflicts us, the object of our misery, is an inventory to particularize their abundance , Our Sufferance is a gain to them. Let us revenge this with our pikes, ere we become rakes ; for the gods know. I speak this in hunger for bread, not in thirst for revenge (Coriolenus page 1/Act 1, Scenc 1 : Rome. A Street). শেক্স-পিয়ারের সৃষ্ট অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে কৃষক বিপ্লবী জ্যাক্ কেড খ্রীস্টোফার, স্লাই, ফুল চরিত্রগুলি, হ্যামলেটের কবর খোঁড়া শ্রমিক বা পেবিক্লিসের জেলেদেব চরিত্রগুলিকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ কবলে আমবা দেখবে৷ প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচকরা যাই বলুন, এগুলি বস্তুনিষ্ঠ বলেই বিপ্লবী নয়, কিন্তু নাট্যকাবেব অপরিসীম মমতা ও স্বপ্ন এই চরিত্রগুলিতে শিল্পোত্তীর্ণভাবে মাখানো।

সামন্ত সমাজ ব্যক্তির বিকাশে কোনো পবিকল্পিত উদ্যোগ নেয় না, কারণ তার সমাজ অর্থনীতিক কাঠামোই তাকে তা নিতে দেয় না। ব্যক্তিকে মর্যাদা দানের এই তাৎপর্য পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে ইউবোপেব শিল্প বিপ্লবের পর অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের সময় কালের অন্তত ১৫০ বছবেব ব্যবধানে।

মোটামুটিভাবে সব দেশে সব কালেই কাব্যে বা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তার প্রথম নাম আমরা দিতে পারি জনতা। 'জনতা' মানে এক জায়গায় ভিড করা অনেক মানুষ। কিন্তু এই শব্দের কোনো জোর নেই, নিজস্ব মত নেই, মতাদর্শ তো নেই-ই। এ হল শক্তিহীন Mob বা Crowd। এরা চরিত্রগত ভাবে idiot বা fool এবং এরা সংগঠিত হতে শেখেনি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই এই জনতার পরিচয় মোটা-মুটি একই। সভ্যতার যে নির্দিষ্ট স্তরে সাহিত্যের যাত্রা শুরু, তখন থেকে সামন্ত সমাজ পর্যন্ত নাটক, কাব্যে বা সাহিত্যের যে সাধারণ মানুষ তার পরিচয়

মোটামুটি একই। কোথাও কোথাও এক আধটা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আমাদের বক্তব্যকেই আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই জনতা ক্রমে পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষে। 'জনতা' আর 'সাধারণ মানুষ' কথা দুটো আপাত অর্থে সমার্থক হলেও আমরা এর মধ্যে একটা গভীর পার্থক্য নির্দেশ করতে চাই। সাধারণ মানুষ হল সেই—সাংবিধানিক-ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যার অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত। আনুষ্ঠানিকভাবে তার সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতামতকে রাষ্ট্র মেনে নেয়। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিশ্চয়ই প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণ অধিকার লাভ নয়, কিন্তু তবু আগেকার অবস্থার তুলনায় এ হল এক বিরাট গুণগত অগ্রগতি। এবং এই কারণেই শিল্প বিপ্লবের যুগে সাধারণ মানুষের কোনো কোনো ব্যাপারে মতামত গড়েও উঠেছে। রাষ্ট্র কাঠামোর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে চেনে, অনুভব করে এবং দেশ, সমাজ ও নিজের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ক্রমে সচেতন হয়। সে জোট বাঁধে এবং প্রতিবাদ করে। উপরি কাঠামোর ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে সব দেশেই। সাহিত্য শিল্পে এই নবযুগের মানুষ এসেছে নতুন চেহারায়। সে তখন আর দায়িত্ব ও অধিকারহীন 'জনতা' নয় নিজস্ব অর্থকে ছাড়িয়ে জনতা এখন দায়িত্ববান ব্যক্তিতে রূপান্তরিত।

বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে 'তুচ্ছ' জনতার এই সাধারণ মানুষে রূপান্তর। অন্য অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথও ভিন্ন কোটি থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। কালান্তরের বিভিন্ন লেখায়, চিঠি পত্রে আর অসংখ্য ভাষণে তিনি এই নবজাগত ক্রমদায়িত্ববান ও অধিকারপ্রাপ্ত মানুষের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বা নাটকে সে মানুষ রবীন্দ্রিক ঢঙে তার অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে, প্রতিবাদ করেছে, নানা সুরের গানে মাতিয়ে দিয়েছে পারিপার্শ্বিক আর মানুষের মুক্তি কামনা করেছে, বা বলা ভাল অর্জন করতে চেয়েছে আত্মশক্তির জাগরণে। ঐতিহাসিক কারণেই এই সাধারণ মানুষ ইউরোপে যে প্রাণশক্তিতে জেগে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তা হয়নি। পশ্চিমের নবজাগরণের সঙ্গে তুলনায় এদেশে নবজাগরণ প্রায় স্তিমিত। কিন্তু অনেক আকাশে যদি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি জ্বালিয়ে দেয়া যায় কোথাও, তার রোশনাই ছড়িয়ে পড়েই দেশ দেশান্তর পেরিয়ে। এ হল সত্য ও নতুনত্বের

জোর, নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার। বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথের লেখায়—বস্তুত উনবিংশ শতকের শেষ থেকে (এবার ফিরাও মোরে / ১৮৯১) সমস্ত পরিণত পর্ব জুড়ে সাহিত্য সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত তাই সাধারণ মানুষের অনেকটা ইঙ্গিতময়, ও এমনকি গুরুত্বপূর্ণ আনাগোনা। রবীন্দ্রনাটক, গল্প, উপন্যাস বা কাব্যের এই মানুষ কখনোই যথার্থ অর্থে সংগঠিত শক্তি নয়। তাদের স্বপ্ন ছন্দ ও আবেগ কোনোদিন বৈজ্ঞানিক বীক্ষণের হাত ধরে নি। সে মুক্তির কথা শুনিয়েছে, গান গেয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে—কিন্তু দিকদর্শনের মতো নির্ভুল পথ দেখাতে পারেনি। পথ দেখাতে পারেননি এই সাধারণ মানুষের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও।

জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'ঐকতান' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে আর একবার স্মরণ করা যাক। ২১ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। মৃত্যুপথযাত্রী মনীষী তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টির পর্যালোচনা করে এ কবিতায় কঠিন আত্ম-সমীক্ষা করেছেন। শিল্প সাহিত্যের আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে বহুকাল ধরে তিনি যা বলে আসছিলেন তা থেকে তিনি যেন অনেকটাই সরে এলেন। সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ভিত্তি যে টলছিল তা আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি। কঠিন বাস্তবের নির্মম সত্য তাঁর চিন্তাকে করেছে জনমুখী, নিজেকে চিনেছেন নতুন ভাবে এবং সাহিত্যাদর্শও পালটেছে। 'ঐকতান' রচনার আগে প্রায় ২ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের সমালোচনা হচ্ছিল নানা ভাবে। তিনি নিজের মতো করেই সে সবের জবাবও দিচ্ছিলেন। প্রবাক্ত অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল আর কল্লোলের লেখককুল এই সমালোচনার ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রবাসী সবুজপত্র বঙ্গদর্শন বা কল্লোলে এই ধরণের প্রতিটি লেখার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নানা উদাহরণ উপমায় এইটুকু বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন, জনগণের জীবন যাত্রার বাস্তব চিত্র অঙ্কন অথবা লোকহিত বা লোকশিক্ষার কোনো বিশেষ দায় সাহিত্যের নেই। 'লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাস্টারির ভার লয় নাই।' একই সময়ে ইতিহাস কিন্তু

সুস্পষ্টভাবেই রবীন্দ্রচিন্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও বিশ্বাসের জমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বরাবর যা তিনি বিশ্বাস করে এসেছেন, সাহিত্য শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তখনো বাস্তবতার চেয়ে সেই রসতত্ত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশী। ইতিহাসের গতি বুঝেছেন, সমকালীন পৃথিবীতে নতুন শক্তির আশ্চর্য জাগরণ দেখে শিহরিত হচ্ছেন—তবু এই ক্রান্তদর্শী কবি তখনো সাহিত্য বিচারে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্য-রসতত্ত্বের মুখ্য ভিত্তি ছিল উপনিষদিক আনন্দতত্ত্ব—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি...।' এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যের নান্দনিক দৃষ্টি। সাহিত্য বিচারে যিনি ১৯৪১ এ-ও এই বিশ্বাসে থাকতে চাইছেন বাস্তবে বা সাহিত্যসৃষ্টিতে কিন্তু বহু আগে থেকেই তিনি নতুন পথের সন্ধানী। মানুষের লাঞ্ছনা ও দুঃখ তার নিজের আর্তনাদে পরিণত হয়েছিল: '...ওরে ওঠ তুই আজি। / আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি / জাগাতে জগৎ জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে / শূন্য তল।...'

নাগরিক, দেশপ্রেমিক, মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিতে চেয়েছেন, আত্মদীক্ষার কঠিন সংকল্পে বলেছেন: '...এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে / দিতে হবে ভাষ, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে / ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা / ডাকিয়া বলিতে হবে- /মুহূর্ত তুলিয়া শির, একত্র দাঁড়াও দেখি সবে...।' রবীন্দ্রনাথের মানস দ্বন্দ্ব এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তাঁকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছে: সাহিত্যের কোনো দায় নেই। সুদীর্ঘ ৭ বা ৫০ বছর ধরে তাঁর স্ববিরোধী দ্বন্দ্বমুখর মনমন্থনের অসংখ্য চিত্র ছড়িয়ে আছে গানে কবিতায়। এবং ইতিহাস যেহেতু পেছনের দিকে হাঁটে না, তাই শেষ পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথকে পাই মহামানবের নবজাতকের আগমনী গানের বাউল হিসাবে, তিনি বড় কাছের, বড় আপনার।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প, কবিতা আর নাটকের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির উপেন, বা ছড়ার ছবির কয়েকটি কবিতার কথা সবারই মনে পড়বে। ১৮৯৫ সালে লেখা প্রথম কবিতাটিতে শুধু ছিন্নমূল অত্যাচারিত গরীব কৃষকের মর্মান্তিক জীবন বেদনার কথাই সব নয়, তাতেই

শোষক জমিদারের প্রতি তীব্র শ্লেষে তিনি বিদ্রূপ করেছেন : 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে।' 'শাস্তি'-র ছিদাম চন্দরা ও দুঃখীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন, সমস্যা পূরণের আছিমদ্দি কিংবা ছুটির ছবির গোষ্ঠ, সামরু কিংবা নাম গোত্রহীন সেই যুবক বন্যার জলে যে হয়ে গেছে সর্বস্বান্ত—এইসব চরিত্র সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের ওপাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে পৌছনোর আন্তরিক প্রয়াস। এই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর সামান্যই—এ ক্ষেত্রে তিনি হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধির আশ্রয়ই নিয়েছিলেন বেশী।

রবীন্দ্রনাট্য ধারার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ক্রমবিবর্তন ও পদচারনা অনেক স্পষ্ট। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র নাটকে গুনগতভাবে কোন নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু পরিমানগত ভাবে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম উদ্দীপনার ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য ভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

'রাজা ও রানী'র (১৮৮৯) অসংগঠিত জনতা বলেছে : 'ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুট করবো।' এই জনতার ক্ষোভে রানী সুমিত্রাকে ব্যাকুল হতে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পরিশীলিত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিক ও মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথই সমবেদনা ও করুণায় আপ্লুত হয়েছেন। 'চিত্রা'র কবিতায় এই মনই মূঢ় ম্লান, মূক মুখে ভাষা দিতে চেয়েছিল। 'প্রায়শ্চিত্ত'র (১৯০৯) মন্ত্রী রাজাকে সাবধান করেছেন এই বলে : 'রাজকার্যে' ছোটদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ। অসহ্য হলেই ছোটরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটরা বড় হয়ে ওঠে।' নবযুগের ইউরোপে এই ছোটদের জোট বাঁধতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, কালান্তরের পাতায় পাতায় তার উল্লেখ করেছেন। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তাঁর তখনও অনেক দেরী। আর আজকের মানুষ জানেন শুধু জোট বাঁধলেই ছোটরা বড় হয় না—শক্তিমান হতে হলে ঐক্যবদ্ধ তো হতেই হবে, কিন্তু তাতেই হবে না, আরও কিছু চাই আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু -রবীন্দ্রনাথ জানতেন সেই অতিরিক্ত জিনিসের নাম চেতনা। 'বাঙ্গা'র (১৯১০) সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত ঘোষণা হল : 'আমরা মরতে পারি।' 'অচলায়তনে (১৯১২) এই মানুষের রূপ আরও পরিণত, সে বহুকালের ঘুম ভেঙে জাগছে : কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন/ ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে।'

'অচলাযতন' রচনার সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে শ্রমিকদের সংগ্রাম সবেমাত্র যুক্ত হয়েছে। এই প্রথম মধ্যবিত্ত দর দৃষ্টি-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর কাছে শ্রমজীবী মানুষেরা একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে হাজির হতে শুরু করে। নিজেকে সে ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসাবে। বুদ্ধিজীবী সহানুভূতির তুচ্ছ অনুভূত পাল্টে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বিবেচনাবোধ, অচলাযতনের গণ্ডীবদ্ধ, অন্ধকার, কূপমণ্ডুক হিন্দু সমাজকে বাইরে থেকে আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ সমাজের বাইরের জানলা সূর্যালোকের ভয়ে কখনো খোলা হয় না। এক বছর আগের লেখা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই নাটকের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ আগেই প্রকাশ করেছেন। 'আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে।' এই অন্ধকারের প্রাচীর ভাঙার নাটক অচলাযতন। এ নাটকের অচলাযতন নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র পঞ্চক বর্তমান ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ। সে বাইরের ডাক শোনে অন্যকে শোনায় না এবং কেমন করে বেরোতে হবে পরিবর্তনের পথে তাও সে জানে না। শ্রমজীবী শোনপাংশুরা থাকে বাইরে, তারা শ্রমজীবী শ্রমিক অথবা কৃষক। পঞ্চক তাদের সঙ্গে যেতে চায়, কিন্তু পারে না—সে অনুসরণ করতে চায়, দাদা ঠাকুরকে। দাদা ঠাকুর শোনপাংশু অর্থাৎ শ্রমজীবীদের নেতা, কিন্তু তিনি নিজে শ্রমজীবী নন। শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে অচলায়তনের দীর্ঘকালের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলা হয়।

'রক্ত করবী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। পুঁজিবাদের সংকটগ্রস্ত ও ক্রুর চেহারাটিকে এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন উদার মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে। সে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে কবির চোখে ধরা দেয়নি। কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে এখানে তিনি সভ্যতার শত্রু হিসাবে পশ্চিমী সভ্যতা অর্থাৎ পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করেন। রক্ত করবী এই শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নাটক। শোষিত শ্রমিকরা এ নাটকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু সে বিদ্রোহ বিবর্তিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অনুযায়ী। বিশু,

কিশোর, গোকুল, ফাগুলাল, চণ্ডী এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমজীবী মানুষ বা তাদের সহযোগী। রক্তকরবীর অধ্যাপক চরিত্রটিকে মনে রেখে আমরা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ২টি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই: 'মানুষের যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনজ্ঞ, পুরোহিত, কবি বা বৈজ্ঞানিক সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরীভোগী শ্রমজীবীরূপে।' বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বোধ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, যে মানুষ জ্ঞানী সে অসহায়ের মতো অবমানিত দাসে পরিণত হচ্ছে এই সমাজে—রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর হতভাগ্য অধ্যাপক তার জীবন্ত ছবি।

নন্দিনী বা রঞ্জন কেউই বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, অগাধ মমতায়, শিল্পীর তুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই কিশোর কিশোরীকে সৃষ্টি করেছেন। এ তার রূপস্রষ্টা মনের ফসল, আবেগের সম্পদ। কিন্তু নাটকের অন্তিম পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বে তিনি রঞ্জনকে অধিষ্ঠিত করেন নি, এইখানে ইতিহাসবিদ রবীন্দ্রনাথ আবেগকে বর্জন করে বিদ্রোহের পতাকা তুলে দিয়েছেন শ্রমজীবী বিশুর হাতে।

'মুক্তধারা' (১৯২২) বা 'রথের রশি'তে (১৯৩২) এই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চরিত্র আরও পরিণত। তাদের মধ্যে চেতনার গুণগত পরিবর্তনের আভাস। রথের রশি লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থ দর্শনে'র পরে। নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস সত্ত্বেও রাশিয়া যে একটি উন্নত সমাজ গড়েছে, ওপর আর নীচকে আশ্চর্য কৌশলে এক করেছে, সভ্যতার পিলসুজরা যে আমূল পালটে দিতে পারে সমাজ—বিপ্লবোত্তর রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে এ বিশ্বাস এনে দিয়েছিল। তাঁর এই বিশ্বাসের ছবিই রথের রশি। এ নাটকে কবির দৃঢ় সিদ্ধান্ত—শ্রমজীবী মানুষই মহাকালের রথ চালাবে, আর কেউ তা পারে না। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন। কবির কথায়: 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন / যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, / যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।' কবির মহৎ কামনায় এ নাটকের যবনিকা—'যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে / যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক / মাথা তুলে।'

রবীন্দ্রনাথের নাটকের এত কালের জনতা এইভাবে বিকশিত হতে হতে

ক্রমে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে এ নাটকে এসে নিজেকে আরও মহৎ আখ্যায় ভূষিত করেছে। এ নাটকে সে প্রায় পরিণত হয়েছে সচেতন জনগণ। এই মানুষই রবীন্দ্র-উত্তর কালে সমাজ ও সাহিত্য নিজেকে সুনিশ্চিতভাবে অতিক্রম করে গেছে। তখন তার নাম জনগণ। এই শব্দটির সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে সচেতনতা। এরা একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, সংগঠিত এবং শক্তি-মান। অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতন জনগণকেই এই যুগ অভিনন্দিত করেছে অমিত শক্তির উৎস বলে। শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধারণ মানুষ তারই পূর্বাভাস।

এই ক্রমবিবর্তনটুকু অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে এইখানে সাহিত্যিক বা চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের সূত্র লুকিয়ে আছে। আগেই উল্লেখ করেছি প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্দ্রচর্চা ভিন্নপথে পদচারণা করেছে। বিভ্রান্ত আত্মনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ইতিহাস বা রবীন্দ্রনাথও সঠিক ভাবে চিত্রিত হন নি। আমরা রথের রশি নাটক থেকেই একটি উদাহরণ দেব। এই নাটকের আখ্যানভাগে সরাসরি বলা হয়েছে—মহাকালের রথ পুরোহিত, রাজা, যোদ্ধা, বণিক বা ধণিক কারুর হাতেই চলেনি। অথচ ধনপতিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'আজকাল চলছে যা কিছু, তা ধনপতিদের হাতেই চলছে।' শেষ পর্যন্ত শূদ্রেরা এসে ধরে রথের দড়ি, রথ চলে। শূদ্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে 'আমরাই তো যোগাই অন্ন, তাই তোমাদের বাঁচা—/ আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।'

সমালোচকরা বলেছেন, মানুষে মানুষে বর্ণে বর্ণে যে সম্বন্ধ সেটাই হল রথের রশি। রশির গ্রন্থি শিথিল হলে, সমাজ বন্ধন আলগা হলে ইতিহাসের রথ চলে না। মেহনতী মানুষের টানে রথ চলেছে, এ হল ইতিহাসের দিক নির্দেশ।

এ নাটক যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখনো তাঁর দ্বিধা কাটেনি। নতুন কাল, নতুন মানুষ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিলই। 'রাশিয়ার চিঠি'-তে তাঁর সে সংশয়ের কথা তিনি ব্যক্তও করেছেন। এবং সেই সংশয় ও দ্বিধাই অন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে রথের রশির কবির কথায়। তাই শূদ্রের টানে রথ চলার পরও কবির মনে হয়েছে: 'আসবে উল্টোরথের পালা / তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া—।' কিন্তু নতুন যুগে যে উঁচুনীচু থাকবে না

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি রাশিয়ার চিঠিতে সেই সমাজসত্যের ইঙ্গিত করেন নি? বলেন নি—এরা একেবারে গোড়া থেকে পাল্টে দিয়েছে। উঁচু বা নীচুতে কেউ নেই। সবাই একই জায়গায়। রথের রশিতে যে নতুন সমাজের ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই মানুষের সমাজে তাল কাটবে না। এটুকু না বোঝাই কবির সীমাবদ্ধতা। আমাদের দুঃখ এই—রবীন্দ্রনাথের যেখানে সংশয় বা সীমাবদ্ধতা, রবীন্দ্রভক্ত সমালোচকরা সেইখানেই আশ্বস্ত।

সাহিত্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবী কালের নায়কের আবির্ভাবকে যেমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে সমাজ রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে তাদের আবির্ভাবকে তিনি স্বাগতও জানিয়েছেন। ১৯১৯ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: 'সম্প্রতি য়ুরোপে লোক সাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে দেখা দিয়েছে।...ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান-ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।... ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপজ্জনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।...এখনও দেশে লোক সাধারণ কেবল সেন্সাস রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে, সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না—দাবী করে।'

এই পরিবর্তনটুকু সঠিক ভাবে বোঝাই রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের পরিচায়ক। 'সমবায়নীতি'-তে বলেছেন: 'এই জন্য য়ুরোপে যারা কেবল গরীবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন—যে, যাঁরা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরীব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন...গরীবের সংগতি লাভের উপায়, এই যে মিলনের রাস্তা য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো উপার্জনের রাস্তা হইবে।' মার্কস-এঙ্গেলস্ দুনিয়ার মজুরকে এক হতে আহ্বান

জানিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা অন্যরকম, তবু তাঁর বিশ্বাস এই আহ্বানের চেয়ে বহু দূরে নয়। বহু ভাষণে, প্রবন্ধে বা বিবৃতিতে সমকালীন ঘটনা-স্রোতকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভবিষ্যতের নায়ক, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অমিত শক্তি ও দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন বারবার। বুঝেছেন সেই জনতাই বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে হতে আজ মহান বীর্যের অধিকারী সচেতন শক্তিতে পরিণত। নির্দ্বিধায় তাই বলতে পেরেছেন: 'আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান।'

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৩৭ সালে লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের পক্ষে তাঁদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির আর কোনো অস্বচ্ছতা থাকে না। ঐ বছরের ৩০ এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বললেন: গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ধর্মঘটের ফলে শত সহস্র শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার খবর জেনে আমি গভীর ভাবে ব্যথিত।... তাদের উচ্চতর বেতন ও কাজের অধিকতর মানবিক পরিবেশের দাবী ন্যায্য ও যুক্তিসংগত।...যারা সমাজের বোঝা বয়, সমাজ তাদের প্রতিপালন করবে এটাই মানবিকতার দাবী।'

এই ভাব বিবর্তনের অন্তিম পর্যায়। নতুন কালের দুয়ারে এসে করাঘাত করেছেন একজন প্রধান ক্রান্তদর্শী। বহুকাল ধরে সযত্নে যে বিশ্বাসকে অন্তরে লালন করছিলেন, সেই সমস্ত কিছু হারিয়ে দেউলিয়া মানবপ্রেমিক মানুষের ওপরে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে এলেন এ পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। আহ্বান জানালেন নতুন কালের কথাকোবিদের উদাত্ত নির্দ্বিধ কণ্ঠে—জয়গান গাইলেন নবজাতকের, মহামানবের। এইখানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার

জীবন-সংগ্রামী মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথ

কথামুখ

চাষী, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের নিয়েই সমাজের বারোআনা। এরাই সভ্যতার পিলসুজ। তারা মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—ওপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। ঘাম ঝরে। এদের হাড়-ভাঙা শ্রমে সমাজের ধনবৃদ্ধি পায়, সভ্যতার আলো বিচ্ছুরিত হয়। অথচ যার সারভাগ যায় অন্যদের ভোগে। এই হলো রবীন্দ্রনাথের ঋদ্ধ-উপলব্ধি। এই মর্ম সত্য অনুভবের স্পষ্ট অভিরেখ মেলে তাঁর সৃষ্টি-কর্মে।

মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্য লক্ষ করেই তিনি বিচলিত। সেজন্য তিনি উপেক্ষিত দেশ, উপেক্ষিত ভাষা, অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করার কথা বলেছেন। শুধু মাত্র বলা নয়। কাজে আত্মনিয়োগ করেই দেখালেন। ফলে তিনি স্বদেশী সমাজ ও সমবায় নীতির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তুললেনও পল্লীগ্রামে, গ্রামের মানুষের জন্যই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি বললেন: 'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে / দিতে হবে ভাষা; এই সব-শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে / ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে— / মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও সবে; / যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে, / যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। / যখনি দাঁড়বে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে / পথ কুক্কুরের মতো সংকোচ সত্রাসে যাবে মিশে।...'

সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভালবাসা। অথচ দুঃখের অবসান করতে না পারার জন্যে তাঁর বেদনাবোধও ছিল অন্তহীন। তাই তিনি 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' বলেছেন। অবশ্য মানুষের চিত্র এখানে আর খণ্ড নেই, একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে নিহিত।

শুধু দেশের মানুষের কথা নয়। বিশ্বের সব মানুষের জন্য ছিল তাঁর তীব্র অনুভূতি। যে কোন দেশের পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের জন্য বেদনা অনুভব করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন। সমস্ত জগতটাই যেন তাঁর আপনজন। কবি কণ্ঠে ওঠে মানবপ্রেমের ধ্বনি। কবি তাঁর 'প্রবাসী' কবিতায় বলেছেন: 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি / সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। / দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি। সেই দেশ লব বুঝিয়া।'

সব মানুষের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে দেখা তাঁর বৈশিষ্ট্য। কবি তাই বলেন: 'সর্ব মানুষের মাঝে / এক চিরমানবের আনন্দকিরণ / চিত্তে মোর হোক বিকরিত।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এশিয়া ইউরোপের দুর্গতির পটভূমিকায়, সভ্যতার সংকটে কবির মানববোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তবুও তিনি বিশ্বাস হারান নি। এর একটাই কারণ, 'রবীন্দ্রনাথের মানবেতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একটি প্রখর বোধ—সভ্যতা ধ্বংস হয়, সাম্রাজ্য মুছে যায়, কিন্তু মানুষ মরে না। সে কোন্ মানুষ? যে মানুষ তুচ্ছ, বীরত্বহীন, বৈভবমুক্ত—যে মানুষ কাজ করে (পবিত্র সরকার, নিবন্ধ, 'পশ্চিমবঙ্গ', ১৩৮৬)।' তাই বলা যায়, কবির ভাবনায় একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে, 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান' কবিতায়: 'চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল, / তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল— / বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার / তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।'

কবি আরো স্পষ্ট হয়েছেন 'আরোগ্য'-র 'ওরা কাজ করে' কবিতায়। কবি শ্রমকিণাঙ্ক মানুষের কথা-ই বলেছেন: 'ওরা চিরকাল / টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল; / ওরা মাঠে মাঠে / বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে / ওরা কাজ করে / নগরে প্রান্তরে।'

কবির মানুষপ্রীতি কত আন্তরিক এবং নীচের তলার মানুষের প্রতি তাঁর কী অনুরাগ ও মমত্ব তা 'পল্লীপ্রকৃতি'-র মধ্যে এই অভিব্যক্তি থেকেও বোঝা সম্ভব।

'শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি

আমরা নীচের লোকদের কাছে থেকে আদায় করব, একথা আমরা ভুলতে পারিনে।'

['পল্লীপ্রকৃতি'র মধ্যে নিবন্ধ 'পল্লীর উন্নতি ২৮।৩।১৯১৫।দ্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড (বিশ্বভারতী সং ১৩৮১)]

মানুষের কবি তিনি। মানুষের সুখ দুঃখেই তাঁর 'চির অধিবাস।' তাই তাঁর মনে প্রশ্ন, সভ্যতার পিলসুজ যারা জ্বালিয়ে রেখেছে; তারা কেন আলোক বঞ্চিত হবে! 'উপেক্ষিতা পল্লী'-তে তিনি সেই ক্ষোভের মাত্রা যুক্ত করেছেন। 'বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর -এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেইরকম।' (উপেক্ষিতা পল্লী, ১৩৪০)।

কিন্তু এটা ঠিক। এরাই বেশিসংখ্যক মানুষ, নীচুতলার মানুষ। উৎপাদন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মার্কস এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর জয় ঘোষণা করেছেন। এই মেহনতী মানুষই সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ামক। অথচ এরা অবহেলিত, 'অনুজ্জ্বল'। কবি এদের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছেন; সংগ্রামী মানুষদের অভিনন্দন জানিয়েছেন; 'সেঁজুতি'-র 'পরিচয়' কবিতাটিতে: 'সেতারেতে বাঁধিলাম তার, / গাহিলাম আরবার, / 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, / আমি তোমাদেরি লোক, / আর কিছু নয়— / এই হোক শেষ পরিচয়।'

একটি প্রচলিত অভিযোগ আছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিজেও দুঃখ করে বলেছেন, হয়তো একদিন তাঁর লেখা বর্জিত হবে বুর্জোয়া লেখকের লেখা বলে। কিন্তু তা হয়নি। সেটাই সৌভাগ্যের। 'কিন্তু একথাও সত্য যে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে পদক্ষেপও করেননি।' (শিশির দাশ, বাংলা ছোটগল্প, ১৯৬৩, পৃ, ১১০)

অমল হোম বলেছেন: 'বক্তব্যটা আমার এই—রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তাঁর গল্পে, উপন্যাসে তিনি রাজরাজড়া নিয়ে কারবার করেন নি। অতি সামান্য, সাধারণ লোক, যারা খেটে খায়, আপিসে চাকরি করে, তাদের কথাই বলেছেন; তার চাইতে একটুও কম বলেননি, দুঃখে পীড়িত, অভাবক্লিষ্ট পরমসহিষ্ণু বাঙলার

পল্লিবাসিদের কথা ; তাদেরই তিনি রূপে ও রসে মূর্তি দিয়েছেন অপরূপ ; সে মূর্তি মানুষের চিরন্তনী মূর্তি, দেশ ও কালের পাত্র ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা সকলকালের, সকল মানবের মর্মস্থলে।' (সৃজনী, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, ১৯৬১ পৃ, ১২৯)

॥ সমীক্ষণ ॥

মানুষের 'বীজমন্ত্রের' যিনি গুরু। যিনি বলতেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাঁর একশত পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে জীবনসংগ্রামী সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন ? সত্যিই কি আমরা রবীন্দ্রনাথের মহৎ-উত্তরাধিকার হিসাবে গর্ব করতে পারি ? তাই, কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা বিভিন্ন পেশার[১] মানুষের কাছে হাজির হয়েছিলাম। বিচিত্র কথার মালা স্বকীয় অনুভব, অনুপম-উচ্ছ্বাস ; অবিমিশ্র শ্রদ্ধা। আবার কিছু মানুষের কথায় হতাশও হতে হয়। যাই হোক, আমরা সাজিয়ে দিই ; তাঁদের গভীর মর্মানুভূতি।

সমীক্ষা ১ □ [কৃষক, তাঁতি, জেলে, কুমোর কারখানার শ্রমিক]

ক □ প্রশ্ন : ১. আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন ?

২. আপনি কি জানেন এ বৎসর রবিঠাকুরের জন্মোৎসব কি কারণে উল্লেখযোগ্য ?

৩. রবিঠাকুরের লেখা আপনি কি কিছু পড়েছেন ?

৪. তাঁর গান কেমন লাগে ?

৫. রবিঠাকুরকে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

একটি চিত্র □ ক □ প্রশ্ন

১.	উত্তর দিয়েছেন	হ্যাঁ	:	শতকরা	:	৫৯ জন
	,,	না	:	,,	:	৪১ ,,
২.	,,	হ্যাঁ	:	,,	:	৩৮ ,,
		না	:	,,	:	৬২ ,,
৩.	,,	হ্যাঁ	:	,,	:	৩৪ ,,
		না	:	,,	:	৬৬ ,,

৪.	উত্তর ভাল লাগে	: শতকরা	:	৫৬ ,,
	,, ভাল লাগে না :	,,	:	৩১ ,,
	শুনি না :	,,	:	.৩ ,,
৫.	,, হ্যাঁ :	,,	:	৪৩ ,,
	নীরব থেকেছেন ,,		:	৫৭ ,,

কিছু মতামত □

সাহেব আলি সর্দার, ক্ষেতমজুর,

উত্তর কলস, মগরা ॥ ২৪ পরগনা

১. নাম শুনেছি। মস্ত কবি। ছেলেরা বইপত্তর পড়ে।
২. না, জানি না।
৩. না।
৪. গান শুনি না। ভাল লাগে না।
৫. বুঝি না।

---

১. রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিভিন্ন পেশার মানুষের পরিচয় মেলে: অধ্যাপক, উকীল, এজেন্ট, কবিরাজ, কায়স্থ, কুলীন, কৈবর্ত, খাজাঞ্চী, খানসামা, খালাসী, গণক, গোমস্তা, গোয়ালা, ঘাসিয়াড়া, চাষী, জেলে, তাঁতি, দারোয়ান, দারোগা, দালাল, দেওয়ান, ধোপা, নাজীর, নাপিত, নায়েব, ডাক্তার, ডোম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পণ্ডিত মশাই, পাইক, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী, পুলিশ, বরকন্দাজ, বাউল, ব্রাহ্ম, বেদে, বোষ্টমী, বৈষ্ণব, ভালুক নাচওয়ালা, ভৈরবী, ময়রা, মাষ্টার, ম্যাজিস্ট্রেট' ম্যানেজার, মেছুনি, মেথর, মুটে, মুদী, মুন্সেফ, যাত্রাওয়ালা যোগী, রাখাল, রানার, রায়বাহাদুর, সিপাহী, সিরিস্তাদার, স্যাকরা, সোফার, হরকরা, হাঁড়ি, —এই তালিকা থেকে জাতি বর্ণ, বৃত্তি, উপাধি প্রভৃতি বোঝা যায়। দ্র, শিশির দাশ, বাংলা ছোটগল্প, ১৯৬৩, পৃ, ১১১

অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের গল্পে শ্রমজীবী মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাহলো এই,—

১.	চাষী ও ক্ষেতমজুর,	শাস্তি, সমস্যাপূরণ, ম্যানেজারবাবু, দুর্বুদ্ধি (সামান্যত)
২.	জেলে,	মেঘ-রৌদ্র, হালদারগোষ্ঠী
৩.	তাঁতি	পণরক্ষা
৪.	কুমোর	নতুন পুতুল
৫.	ডোম ও মেথর	অনধিকার প্রবেশ (গৌণত)
৬.	মোটর মিস্ত্রি	রবিবার
	জাহাজের খালাসি	—দ্র, যুবমানস, মে, '৮৬, পৃ, ১১২

বাঁশী মণ্ডল, মুটে মজুর,

ক্যানিং। ২৪ পরগনা

১. নাম জানি। নোবেল পেইয়েছেন।

২. হ' শুনছি।

৩. ছেইলা বেলায় কবিতা পড়েছি।

৪ গান তা বাবু ভালই গান।

৫. হ' প্রয়োজন থাকবেকনি!

নিমাই চন্দ্র মণ্ডল, জেলে

চম্পাহাটি। ২৪ পরগনা

১. রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছি! তিনি লিখেছেন ঢের।

২. জন্ম-বার্ষিক পালন হচ্চে। সরকার করচেন।

৩. আমার অনেক করিতা মুখস্থ। শুন্‌বেন? 'ভগবান তুমি যুগে যুগে…'

৪. গান খুউব ভাল লাগে।

৫. এতবড়ো মনীষী। জানার প্রয়োজন নেই!

বীরেন্দ্রনাথ বর, কৃষক

গাবাপোতা। নদীয়া

১. নাম শুনব না কেন, তিনি বিশ্বকবি।

২. সরকারি ও ক্লাবে ক্লাবে অনুষ্ঠান হচ্ছে।

৩. সঞ্চয়িতা পড়ি। কিছু গল্পও পড়েছি।

৪ গান ভাল লাগে। তবে সব নয়।

৫ রবীন্দ্র-আরাধনার প্রয়োজন বইকি!

সুরেশ রায়, কৃষক

মন্তেশ্বর। বর্ধমান

১. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি।

২. হ্যা জানি। তবে বর্ধমানের গ্রাম গাঁয়ে কিছুই নেই।

৩. স্কুলের পাঠ্য কবিতা জানি।

৪. গান খুবই ভালো লাগে।

৫. এই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা কিছুই জানলাম না। সাহিত্য বুঝলাম না, আক্ষেপ থেকে গেল। তাই ছেলেরা যখন পড়াশোনা করে ভাল লাগে।

নিরঞ্জন দাস, শ্রমিক বার্নস্ট্যাণ্ড কোং, হাওড়া।

গ্রাম ও ডাক ॥ জঙ্গল পাড়া। জেলা, হুগলী

১. হ্যাঁ তিনি কবি ছিলেন। নোবেল পেয়েছেন।

২. না, জানি না।

৩. লেখা বিশেষ পড়িনি। যখন স্কুলে ছিলাম, কিছু পড়েছি।

৪. তাঁর গান ভাল লাগে না। এমন কেউ আছে নাকি?

৫. তিনি এত বড়ো কবি অবশ্য তাঁকে জানার প্রয়োজন আছে।

এবাকুদ নস্কর, মুটে মজুর

জয়নগর, ২৪ পরগনা

১. নাম শুনেছি। বই লিখেছেন।

২. অত জানি না।

৩. আমার ছেলে পড়ে। তাই শুনি।

৪. গান শুনি। বাবু ফেইন গান করেন।

৫. কী বলব?

সমীক্ষা ☐ ২

খ ☐ প্রশ্ন : ১. আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন এবছর রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আজকের দিনে এমন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি?

২. বর্তমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের প্রভাবিত করতে পারে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে কতখানি অনিবার্য?

৩. রবীন্দ্র সৃষ্টির কোন্ শাখা আপনার ভাল লাগে? কেনই বা লাগে?

৪. রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রতিবছরই পালিত হয়। এবারের আয়োজন ও উৎসাহ সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? আপনি কি মনে করেন কোন আড়ম্বর হচ্ছে?

৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনার চেতনাকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করে?

রমানাথ রায়, শিক্ষক

নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশান। কলিকাতা-৪০

১. ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালন বিশেষিত কিছু নয়। আলাদা কিছু নয়। বেশি কিছু মনে হচ্ছেনা। এর মধ্যে নোতুন কোন চিন্তা ভাবনা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। চোখেও পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সভা-সমিতি, বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নীরব-পঠন পাঠনের মধ্যে জানতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে। .এতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা অনুষ্ঠান করেন তাঁদেরই প্রচার হয়, রবীন্দ্রনাথের নয়।

২. আমার ধারণা, আমরা অন্ধকার যুগের মধ্যে চলেছি। শিক্ষা, রাজনৈতিক জীবনে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাঁচবার প্রেরণা নেই, এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র লেখক কবি, যিনি আমাদের প্রেরণা দিতে পারেন, বাঁচতে সাহায্য করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথই আমাদের বিশ্বাস, চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারেন, সুস্থ জীবনের পথ দেখাতে পারেন। তিনিই শেখাতে পারেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

৩. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস ভাল লাগে। এক কথায় গদ্য সাহিত্য। গদ্যসাহিত্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, চিন্তিত করে, তার মানে অন্য শাখা যে করে না; তা নয়।

৪. এবারে কোন আড়ম্বর আমার চোখে পড়ছে না। এবং আমার মতে বেশি আড়ম্বর না হওয়াই ভাল, বাঞ্ছনীয় নয়।

৫. রবীন্দ্রসঙ্গীত এক সময় ভাল লাগত। এখন লাগেনা। এর কারণ যে অস্থিরতার মধ্যে চলেছি বা বাস করি তা তাঁর গানের মধ্যে, কথা ও সুরের মধ্যে প্রশমন লক্ষ্য করি না। তাঁর গান অতীত ধূসর স্মৃতি হিসাবে বেঁচে আছে।

মৃত্যুঞ্জয় সমাজদার, করণিক

সি. আর. এ্যাভেনিউ পোস্ট অফিস। কলিকাতা-৭৩

১. প্রয়োজন আছে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করার। মহানকবি স্মরণ ও শ্রদ্ধা এই জন্যই।
২. আমরা যেহেতু বাঙালী, তাই তাঁকে ভাববার দরকার। তাঁর সাহিত্য চলার পথ দেখাতে পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান সংকটে বিশেষভাবে বাঙলা ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চিন্তার প্রসার দরকার।
৩. গল্প আমাকে মুগ্ধ করে।
৪. আড়ম্বর কিছু হচ্ছে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন।
৫. রবীন্দ্র-গানে আমি বেশি মুগ্ধ হই।

শশধর সাঁতরা, সাব-ইনস্‌পেক্‌টর

হাওড়া—জি. আর. পি।

১. জন্মবার্ষিকী পালনের প্রয়োজন আছে। তিনি বিশ্বকবি বলেই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা উচিত।
২. রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন প্রভাবিত করতে পারেন, তার কারণটি হলো এই, তাঁর সাহিত্যকর্মে যে বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে চলতে পারছি। এইজন্যই তিনি আমাদের জীবনে অনিবার্য।
৩. ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' আমাকে ভাবিয়ে তোলে। 'বিসর্জন' নাটক আমার মনে রেখাপাত করে।
৪. মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য আর তিনি তো আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই আমাদের কর্তব্য; এতে আড়ম্বর কোথায়?

৫. রবীন্দ্র সংগীত আমার ভীষণ পছন্দ। এই গান আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

বি. পি. রায়, মুখ্যলেখ্যাগারিক

রাজ্য অভিলেখ্যাগার, ভবাণীদত্ত লেন। কলিকাতা-৭৩

১. ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

২. আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো বাঙালীদের শালীনতা বোধ, এটা রবীন্দ্রনাথেরই দান। তাঁর সাহিত্য থেকে এই বোধটা আমাদের প্রভাবিত করে। আরো অনেক প্রতিভাবান নারীপুরুষ আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন; তাঁর প্রতিভা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে।

৩. রবীন্দ্রনাথের সব শাখায় আমার পরিচয় আছে দাবি করি না। তবে গল্প আমার ভাল লাগে।

৪. আড়ম্বর হচ্ছে না। এ হেন বার্ষিকী পালনে আয়োজন ও উৎসাহ থাকা উচিত ছিল যতটা; হচ্ছে তার থেকে অনেক কম।

৫. রবীন্দ্রসংগীত ভালো লাগে প্রেরণা পাই।

রজনীকান্ত মণ্ডল, ল্যাবোরেটরি এ্যাটেণ্ডান্ট

১১৩/২, আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলিকাতা-৯

১. প্রয়োজন আছে। শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁকে স্মরণ করার মধ্যে গৌরব আছে।

২. রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিচয়ে আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যতের বংশধরেরা উদ্বুদ্ধ হবে। ভাষার সমস্যা, জাতীয় সংহতির প্রশ্নে, বিচ্ছিন্নতা-বাদের হলাহলের দিনে, রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। তিনি আমাদের জীবনে অনিবার্য।

৩. রবীন্দ্র কবিতা আমার ভাল লাগে। পড়েছিও কিছু।

৪. কোন আড়ম্বর তো দেখছিনা।

৫. গান শুনি। ভীষণ ভালো লাগে।

আর. সি. কর্মকার, এ্যাড্‌ভোকেট

শিয়ালদহ পুলিশকোর্ট।

ইনি মনে করেন না যে, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালনের প্রয়োজন আছে এমন ভাবে। তাঁর মতে আড়ম্বর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিন

ছুটি ঘোষণা করেনি, এবার করেছে। আড়ম্বরের এটাই 'গ্রেটার ইনস্ট্যান্স'। শ্রী কর্মকার বলেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্য আমার ভাল লাগেনা। 'মাইকেল' আমার কাছে অনেক বড়ো প্রতিভা মনে হয়। আবার এ-ও হতে পারে আমি কিছু বুঝিনা। কম বুঝি। আমার আইডিয়া নেই।'

জগদীশ সান্যাল, উকিল

আসানসোল কোর্ট, বর্ধমান।

১. অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজন আছে বই কি! এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আসানসোলে একটি রবীন্দ্র-ভবন নির্মাণ হচ্ছে।

২. রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত পথে চললে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। আজ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যা জাতীয় সংহতির ওপর আঘাত স্বরূপ কিংবা মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হবে কি হবে না নিয়ে যে বিতর্ক; এসব প্রশ্নে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। তাঁকে স্মরণ করতেই হবে।

৩. রবীন্দ্র সৃষ্টির সব শাখা আমাকে মুগ্ধ করে, তবে বিশেষ করে ছোটগল্প। রবীন্দ্রগল্পে উকিলদের নিয়ে গল্প আছে। আমার ভাল লাগে।

৪. আড়ম্বরটা কোথায়?

৫. গানে আমার ইন্টারেস্ট নেই। তবে শুনি।

দীপান্বিতা দাশগুপ্ত, এম ফিল কোর্সের ছাত্রী

জনকল্যাণ ডাকঘর, নিমতা / কলিকাতা-৪৯

১. আমাদের সামাজিক জীবনে, মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে; অবক্ষয়ের মধ্যে চলেছি, তারজন্য বলতে চাই, আজকের দিনে এই জন্ম শতবার্ষিকী পালনের প্রয়োজন আছে। হোকনা কেন একটা বিশেষ দিনে বিশেষ মানুষকে স্মরণ করা। তাতে আড়ম্বর হলেও কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

২. রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবনে স্মরণ করার, শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন আছে ঠিকই তবে আমার মনে হয় এটাই আমাদের ট্রাজেডি যে তিনি এমন

একজন পরিপূর্ণ মানুষ যার সাহিত্যকর্ম ১২৫ পরও আমাদের ভাবতে হচ্ছে ; উত্তরণ ঘটছেনা। যেন এখানেই থেমে যাচ্ছি। সেই যুগ কাটিয়ে উঠতে পারছিনা।

৩. রবীন্দ্র সাহিত্য আমি সব পড়িনি। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কেও মন্তব্য করছিনা। আমার একটি নাটক 'রক্তকরবী' এতো ভাল লাগে যে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেন। যদিও এটা আংশিক মন্তব্য হয়ে গেল। তাছাড়া, ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

৪. আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের মতো এক সম্পূর্ণ মানুষকে স্মরণ করা বা তাঁর শতবার্ষিকী পালন করা মহাজাতি সদন বা রবীন্দ্র সদনের মতো জায়গায় কিংবা শহর কেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যখন আমাদের প্রশাসনিক ইউনিট হাতে রয়েছে, তার মাধ্যমে উদ্যোগ ও প্রসার হওয়া উচিত।

৫. মানসিক স্তরের কোন্ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পৌছননি যে তাঁর গান সুখ বহন করে না! রবীন্দ্রনাথের মহত্তম প্রকাশ তাঁর গান ; সেটাই আমার মনে হয়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন : সাম্প্রতিক সমস্যায় রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষ-মনে করার কারণ আছে ?

উত্তর : মূল্যবোধের অসুখটা আমাদের পেয়ে বসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে সামনে রাখলে হয়তো সংকটের ক্ষেত্রে সুরাহা হতে পারে। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি কতটা 'এফেকটিভ' হবেন, তাতে আমার সন্দেহ থেকে গেল।

কল্যাণ রায়

৩২ / ডি, ধীরেন্দ্রনাথ বসু রোড। কলিকাতা-২৫

১. রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালনের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ দেশ। সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনিবার্য এই কারণে যে, আধুনিক মানসিকতা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে

পেয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথ ১২৫-বছর আগে জন্মালেও তিনি অনুভূত হচ্ছেন আধুনিক মানুষ হিসাবে। কারণ ইউরোপীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতি ; অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা এই দুয়ের মিল তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয় আশ্চর্যজনকভাবে। রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা, আমাদের কাছে নিজস্বতার প্রশ্নেই। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় চিন্তা যার মূল শিকড় রামমোহনের কালে ; আমাদের পথ দেখাতে পারে।

২. পশ্চিমী সংস্কৃতি ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির এই দুই ধারার সমন্বয় এবং এসবের ভাল দিকগুলি রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে ছড়িয়ে আছে। যদিও ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারার ভাঙন-গড়ন চলছে, একটি নির্দিষ্ট 'শেপ' নেই। তাই বলা যায়, আস্তিক্যবোধ, সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বা মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য হয়ে ওঠেন। তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে প্রতিভাত।

৩. এ উত্তর দেওয়া মুশকিল। এমনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিনি।

৪. আড়ম্বর হচ্ছেনা। এ বৎসর নতুন কিছু ঘটলো বলেও আমার মনে হচ্ছে না। তবে কি হলে ভাল হতো, এ যাঁরা চিন্তা করেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন।

৫. রবীন্দ্রসংগীত আমাকে মুগ্ধ করে। সাধারণ মানুষ হিসেবে বলতে পারি, তাঁর যে ভাব ও ভাবনা আমাকে নতুন করে ভাবায়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সমস্যায় রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষ-ভাবে মনে করার কারণ আছে ?

বিচ্ছিন্নতাবাদ এখন আমাদের দেশে জটিল সমস্যা। এই সমস্যা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সৃষ্ট। অথচ আমাদের দেশে বিভিন্নভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিতে রয়েছে একটা ঐক্য-মিলন ; যেন শতপুষ্পের মতোই বিকশিত। এই জিনিস পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীয় বৈচিত্র্য ও ঐক্য রবীন্দ্রনাথ, বোধহয় গভীর-ভাবে ভেবেছিলেন। এবং সমন্বয়ের কথা, মিলনবোধ রবীন্দ্র সাহিত্যে তার আশ্চর্যরূপ লাভ করেছে। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনশীল ধারায় সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে থাকবেন। এবং আজ বিচ্ছিন্নতার দিনে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা আমাদের দরকার।

সমীক্ষা □ ৩

গ □ প্রশ্ন

১. এই বছর রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এর মধ্যে আপনি কি কোন 'হুজুগ' লক্ষ্য করেছেন?

২. রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? বর্তমান সাহিত্য কি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার?

৩. ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ আছে বা রবীন্দ্র ট্রাডিশন কি চিরন্তন হবে?

৪. রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিকযুগের তফাৎ কি খুব উল্লেখযোগ্য? এবং আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন কি যথাযথ?

৫. রবীন্দ্রসৃষ্টির কোন্ শাখায় আপনি মুগ্ধ হন বেশি?

৬. সাম্প্রতিক সমস্যায় রবীন্দ্রনাথকে কি আমাদের বিশেষভাবে মনে করার কারণ আছে?

ড. আর. পি উপাধ্যায়

রিডার, হিন্দী ডিপার্টমেণ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১ রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালন হচ্ছে বটে। তবে যতটা পালনের জন্য প্রস্তুতি ও ঘটা থাকা উচিত ছিল; তা হচ্ছে না। এর মধ্যে কোন 'হুজুগ' নেই

২. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় চল্লিশ শতাংশ। কিন্তু বলার থাকে যে, রবীন্দ্র সাহিত্য এখনো একটি বিশেষ শ্রেণীর স্তরে। তাঁর ভাববাদ, আস্তিকতা এখনও সীমিত স্তরে বিরাজ করছে।

৩. এটা বলা শক্ত। কেননা কোন কিছু চিরন্তন নয়। চিরন্তন থাকেনা। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর প্রভাব কতখানি তা নিয়ে বিতর্ক এখনও আছে। যদিও তাঁর নৈতিক মূল্যের অবক্ষয় নেই। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হিন্দী লেখকদেরও প্রভাবিত করেছেন। একথা আমি বলেছিও আমার গ্রন্থে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কা ছায়াবাদী কবিয়োঁপর প্রভাব'

(The Impact of Rabindranath Tagore on Modern Hindi poetry.)

৪. বস্তুগত তফাৎ থাকবে। এবং এটা আছে। সাহিত্যের মূল্যায়নও বেশ হচ্ছে।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাকে টানে বেশি। তবে তাঁর গানও ভাল লাগে।

৬. বর্তমান সমস্যার ক্ষেত্রে, জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পথ দেখাতে পারে। সর্বহারাদের ক্ষেত্রে এক নতুন ভাষা বহন করে।

ড. ধীরেন বিশ্বাস

প্রফেসরস্‌-ইনচার্জ, চারুচন্দ্র কলেজ। কলিকাতা-২৯

১. রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী যেভাবে পালিত হওয়ার দরকার ছিল, তেমন হচ্ছে না। এর মধ্যে কোন হুজুগ নেই।

২. রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা সর্বকালীন এবং যতদিন যাবে ততই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব হবে বেশি। বর্তমান সাহিত্য রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরাধিকারতো নিশ্চয়ই।

৩. রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এ সাহিত্য চিরন্তন।

৪. তফাৎ এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে আধুনিক সাহিত্য যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে তফাতটা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এবং এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন বর্তমান সাহিত্যে যথাযথ নয়।

৫. সংগীত আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এতেই মুগ্ধ হই বেশি।

৬. সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জট খোলা যেতে পারে।

সত্য বসু

অফিস সেক্রেটারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সংসদ

১. ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী পালনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। এবং বিশেষ বৎসর বিশেষভাবে চিহ্নিত হলে আড়ম্বর একটু হবে। তবে

যতটা আশা করা গেছে, ততটা হচ্ছে না। এর মধ্যে কোন হুজুগও নেই।

২. রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে যে নিবিড় মনঃসংযোগ দরকার বা যে জ্ঞানের প্রয়োজন, বর্তমান অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীদের মধ্যে তার অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথেকে শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই নয় তাঁর সমাজ সচেতনতারও মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। বর্তমান সাহিত্যের কাল-সচেতনতাই রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার।

৩. রবীন্দ্রনাথ যত পুরনো হবেন ততই নতুন করে আমাদের দেখা দেবেন। তাই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

[এই পর্যন্ত উত্তর দেওযার সুযোগ হয়েছে]

স্বপন মুখার্জী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় স হতি সংসদ

১. রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন ও মাতামাতি করছি কিছু লেখাপড়া জানা মানুষ। এটা ঠিক নয়। নিপীড়িত, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দরকার। শহরের অনুষ্ঠান, নামজাদা শিল্পী, বিশিষ্ট নাট্য গোষ্ঠী হয়তো বা 'রক্তকরবী' করলেন; কিছু মানুষ খুশি হলেন তাতে সাধারণ মানুষ খুববেশি উপকৃত হয় বলে মনে করি না।

২. রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই আছে। এবং আমাদের বর্তমান সাহিত্যিকরাও রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত নন। তবে বর্তমান সাহিত্যের বন্ধ্যা দিক রয়েছে। তাই বলি, কালজয়ী সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এখনও অনন্ত।

৩ আমাদের স্ফুরণ যত হবে, যত জানতে চাইবো এবং জানার আগ্রহ হবে এবং যত সচেতন হবো ততই রবীন্দ্রসাহিত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে এবং বেশি করে রবীন্দ্র-অস্তিত্ব অনুভব করবো; চিরকালীন হবে তাঁর অস্তিত্ব আবেদন।

৪. বর্তমান সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত নন। তবুও তফাৎ আছে। তাঁদের সাহিত্য কর্মে সর্বজনীনতা, বহুমুখিনতা নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের তফাতটা এখানেই।

[৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দেওযার সুযোগ হয়নি]

বামাপদ দাস, প্রধান শিক্ষক
শালকিয়া হিন্দু হাইস্কুল। হাওড়া।

১. কোন ভাল বিষয় নিয়ে ছেলারা হৈ-হুল্লোড করে এবং তার পেছনে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় থাকলে তা অবশ্যই সুখকর। তাই বলি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি, এ যদি হুজুগ হয় তবুও ভাল।

২. রবীন্দ্রসাহিত্যের চিন্তাভাবনা আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে কিন্তু পারেনি। এখনও আমরা পারি না। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনার স্তরে সর্বদাই থাকছেন। তাই যত দিন যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ততই আমাদের ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠছেন।

৩. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারা কালের গণ্ডীতো পেরিয়েছে, তেমনি পেরিয়েছে ভৌগোলিক সীমা। তাই, তাঁর অস্তিত্ব শেষ হবার নয়। সর্বকালিক তাঁর আবেদন এবং তিনি সর্বজনীন।

৪. রবীন্দ্রযুগের উত্তরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্তমান যুগের সাহিত্যে। রবীন্দ্রযুগেরই অনুশীলন লক্ষ্য করা যায় বর্তমানে। তবে তাঁর সৃজনশীলতার ধার ও ভার বর্তমান সাহিত্যে অনুপস্থিত। যে আবেদন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী, তা আজকের সাহিত্যে মেলে না। এবং রবীন্দ্রমূল্যায়নও যথার্থ নয়। অথচ তাঁকে আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

৫. রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য আমার ভাল লাগে।

৬. বিচ্ছিন্নতাবাদ আসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ থেকে। সে কথা ভাবতে গেলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তা শুধু এপার-ওপার বংলায় অলোচিত হচ্ছে না। প্রদেশ ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রদেশের কবি ও সাহিত্যকরা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে ভাষা সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন। আবার রাজনৈতিক প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথকে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 'ন্যাশনালিজম' বলতে আমরা যেরকম ভাবি, রবীন্দ্রনাথ তা ভাবেননি। আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছেন তাঁর ভাবনা। তাই সাম্প্রতিক সমস্যার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করতে হবে।

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক

আনন্দবাজার

১. রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী প্রতিবছর পালিত হয়, এবার একটু হৈ-চৈ হচ্ছে বটে তবে যতটা আলোড়ন হওয়া উচিত ছিল; ততটা হচ্ছে না। কী আর এমন উৎসব হচ্ছে। সর্বাধুনিক কবির ক্ষেত্রে সাড়া পড়ছে কই।

২. রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন। স্থানীয় সমস্যা ও সাময়িক সমস্যা নিয়েই শুধু তাঁর শিল্প কর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যে সমস্যা তার আবেদন চিরকালীন। শরৎবাবু, মানিকবাবু বলুন, ম্যাক্সিম গোর্কি কিংবা নজরুলের কথা ধরলেই এই কথা বলা যায়, তাঁরা চিরকালীন হতে পারলেন না। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে তার উত্তরণ রয়েছে। আমরা তাঁর উত্তরাধিকারতো বটেই। আমার মনে হয় আগামীদিন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার দাবি করবো। একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার পরবশকে কেন্দ্র-করে লিখেছেন 'গোরা' এবং শরৎবাবু লিখেছেন 'পথের দাবী'। 'পথের দাবী' সে সময়কে চিহ্নিত করেছে; তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেই সময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে ও সাহিত্যকর্ম পুরোনো হয়ে গেছে। অথচ, 'গোরা'র আবেদন যেন এখনও ফুরোয়নি; সর্বজনীন, সর্বকালিক।

৩. সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন হবেন। বরং যতদিন যাবে মানুষের কাছে ততই তিনি আধুনিক হয়ে উঠবেন।

৪. আমরা বলি বটে আধুনিক যুগ কিন্তু অধুনিক যুগ এখনও রবীন্দ্রযুগের বাইরে যেতে পারিনি। বুদ্ধদেব বসুর কথাই স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই সর্বাধুনিক কবি। রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়ন এখনও যথাযথ নয়। তবে যতদিন যাবে এর মূল্যায়ন হবে। কারণ মানুষ যত শিক্ষিত হবে, সচেতন হবে, ততই রবীন্দ্রনাথ পঠিত হবে বেশি। এবং যথার্থ মূল্যায়ন তখনই সম্ভবপর হবে।

৫. রবীন্দ্রসংগীতই আমাকে মুগ্ধ করে বেশি।

৬. রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন জাতীয় চিন্তা এসেছিল আমরা সেভাবে চিন্তা করি না, তাই বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মধ্যে আমরা পড়ছি। গোরার মধ্যে আমরা যে 'ভারতচিন্তা' লক্ষ্য করি; সেভাবে আমরা ভাবতে পারছি কই!

ডাঃ সুবীর দাশগুপ্ত

মেডিক্যাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ হোম। কলিকাতা-১৪

১, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্যে কোন হুজুগ নেই। আমি তা বলছিও না। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন, আলোচনা করেন তাঁরা অনেককিছু বলতে পারেন। তবুও ঠিক, হুজুগ বলা ঠিক হবে না।

২. রবীন্দ্রনাথকে গুণগত ঐতিহ্যে স্বীকার করলেই আমরা তাঁর উত্তরাধিকার বাংলাসাহিত্যিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন, তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারলেই আমরা তার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

৩. কোন কিছু চিরন্তন নয়। সাহিত্য যুগোপযুগী হয় তা আবার যুগকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই যুগকে শ্রদ্ধাকরতে না পারলে সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করা যায় না।

৪. রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিক যুগের তফাতটা উল্লেখযোগ্যতো বটেই এবং তফাতটা বিরাট। মূল্যায়ন হতে পারে না। আধুনিক যুগও মনন 'কম্পিট্যুরাইজড'। সুতরাং যুগকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে সেই সাহিত্যের মূল্যায়ন হবে কী করে?

৫. আমি নাটকে মুগ্ধ হই বেশি। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটা এখনও অবহেলিত। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি নাট্যসাহিত্য না লিখতেন; তবে বাংলা সাহিত্য এর উল্লেখ করার মতো কিছু থাকতো কিনা সন্দেহ।

৬, সাম্প্রতিক সমস্যা ও জাতীয় সংহতির সংকটে রবীন্দ্রসাহিত্য দিশারী হতে পারে।

মজহারুল ইসলাম

প্রকাশক ॥ কলেজস্ট্রীট

১. রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান হুজুগের পর্যায়ে চলে গেছে। যেভাবে উদ্‌যাপন হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হচ্ছে না। রবীন্দ্র-অনুধ্যান, পঠন-পাঠন ও সংগীতচর্চা যেভাবে হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে কই! আড়ম্বরের মাত্রাটাই বেশি। আসল উদ্দেশ্য কতটা সাধিত আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

২. রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন বাংলা সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথই সব, সেটা ঠিক নয়। মাইকেল, শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, বিভূতি ভূষণ, সুকান্ত ভট্টাচার্য-র অবদান কম নয়। বর্তমান সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অনেকখানি। অবশ্য ব্যাতিক্রমও আছে।

৩. ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে সীমাবদ্ধতা তো থাকবেই। রবীন্দ্রনাথতো ভগবান নন, আমাদের মতই মানুষ।

৪. রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিকযুগের তফাতটা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এবং আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন যথাযথও নয়। যখন ব্যাপক মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছতে পারবেনা তখনই যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব। আমাদের শিক্ষার হারই এর অন্যতম কারণ।

৫. রবীন্দ্র সংগীতেই আমি মুগ্ধ হই বেশি। একটি কথা অপকটে স্বীকার করি, যত পরিণতি লাভ করছি বয়সের দিক থেকে ততই রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়ছে। শিক্ষা, রুচির ক্ষেত্রে, মানসিক পর্যায়ে এ যেন এক পরিণত-উপলব্ধি।

৬. প্রকৃত শিক্ষা পেলে কি কেউ বিভেদকামী বা সাম্প্রদায়িক হতে পারে? পারে না। যারা এই শক্তিকে মদত দেয়, পুষ্ট করে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক ভূমিকা নেই। তাদের জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সেটাই প্রথম প্রয়াস হওয়া উচিত।

□ ভাবনা চিন্তা[১]

প্রেমেন্দ্র মিত্র : যাঁদের মধ্যে ক্ষমতা নেই, তাঁরা পঁচিশ বছরে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে যান অথচ ক্ষমতাবানেরা ১২৫ কেন ৩০০০ বছরেও বেঁচে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ চিন্তা, ভাবনায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ চেতন-অবচেতন মনে সর্বত্রই বিরাজ করছেন।

শান্তিদেব ঘোষ : যাঁরা লেখাপড়া জানেন না সংবাদপত্র পাঠকরেন তাঁদের মধ্যে গুরুদেব সম্পর্কে জ্ঞান ও আগ্রহ বেড়েছে। তবে

গ্রামের মানুষ যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, তাঁদের মধ্যে গুরুদেব কতটা পৌঁছতে পেরেছেন বলতে পারি না।

ডঃ সুকুমার সেন ঃ ভারতবর্ষে বিশেষকরে বাঙালীদের মধ্যে মাতামাতি করার প্রবণতা আছে। উর্দুতে কথা আছে 'হুজুগে বাঙালী'। তা ধর্ম হোক, ফুটবল খেলাতেই হোক সর্বত্রই মাতামাতি যা, অত্যন্ত অসাড়। টিন বাজনার মত। রবীন্দ্রনাথকে গোড়া থেকে খুব কমজনই বোঝে, পড়ে। জন মনে রবীন্দ্রপ্রভাব কম। '১২৫ বছরে উৎসব, কোনও মানে হয় না। মূল ব্যাপার পড়া। সর্বদা তিনি রবির মতই উদিত হয়ে আছেন। চোখ মেললেই দেখতে পাব। ১ বছর বা ৫০০ বছর নয়, যতদিন বাঙলা ভাষা থাকবে ততদিন তিনি থাকবেন।'

রাধারাণীদেবী ঃ 'রবীন্দ্রনাথকে আমরা পরিপাক করে চলেছি—ভবিষ্যতেও চলবে।'
'আধুনিক সাহিত্যের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের বিচার ঠিক হচ্ছে না। তিনি অত্যন্ত গতিশীল, দৌড়রাজ কবি।'

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ইনি স্বীকার করেন ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনের সার্থকতা। আর রবীন্দ্র ট্রাডিশন সম্পর্কে বলেন; 'কোন ট্রাডিশন একই রকম স্থায়ী হয় না।' রবীন্দ্র যুগ এটা নয় তবে তাঁর প্রভাব ছাড়িয়ে আজকের সমাজ অনেক খানি এগিয়ে গেলেও তাঁর মত বড়ো মাপের কবি আমাদের পথপ্রদর্শক।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ঃ 'আমি মনে করি রবীন্দ্র সাহিত্যের সমাদর হবে ততদিন, যতদিন মানুষ উপনিষদকে ভালোবাসবে, যতদিন মানুষ তার নিজের সত্তা তার পরিচয় পাবার চেষ্টা করবে, যতদিন মানুষ সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা করবে।

…রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিক ও দার্শনিক তাই নয় তিনি পল্লীসংগঠন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তাও আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ রাখব।'

মতামত ❑

সমরেশ বসু : 'রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসেরই মূলকথা হল ব্যক্তির নিজেকে খুঁজে ফেরা। আত্মানুসন্ধান।…আধুনিক মানুষের একটা বড় সঙ্কট হল নিজেকে আবিষ্কার করা।'
(আনন্দবাজার, ৯মে, ১৯৮৬)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চিনতে আমাদের আরও অনেকদিন লাগবে মনে হয়।' (তদেব)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাগল্পের অনেক বিবর্তন ঘটেছে। পার হয়ে গেছে কয়েকটি প্রজন্মের সাহিত্য-চর্চা। গল্পের রূপান্তর ঘটে গেছে অনেক। আজও যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বহুল পরিমাণে পঠিত হয় তার কারণ এইসব গল্পের বিশ্বজনীনতা, কালাতিক্রমীগুণ। পরবর্তী ছোট গল্পে যতই বিবর্তন ঘটুক, তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাতিল হয়নি, হবেও না।' (তদেব)

কমলকুমার সান্যাল : 'বর্তমান দেশের গভীর সংকটের কালে এবং বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একশো পঁচিশ বছরের আলোকে কবিকে বিচার করলে দেখি, সকলের আগে কবির প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি নতুন করে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিশেষ করে আজকের দিনে কবির প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশ আজ

১. **কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** কলেজ স্ট্রীট, ১৩৯৩ বৈশাখ, পৃঃ, ১৪-১৭

গভীর সংকটের মুখে। দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি বিপন্ন, হতাশা আর নৈরাশ্যে মানুষ জর্জরিত, দেশপ্রেম মানুষের মন থেকে মুছে যেতে বসেছে। আজ তাই কবির বাণী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে দেশ ও জাতি নতুন বলে বলীয়ান হতে পারে।'
(দৈনিক বসুমতী, ৪মে, ১৯৮৬)

এক প্রতিবেশী □

ভিন্ রাজ্য, ত্রিপুরা থেকে অধ্যাপক সমীরকান্তি দাশ কলিকাতায় এসেছিলেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। সঙ্গে ছিল তাঁর বাঙালী ও ত্রিপুরার উপজাতীয় কিছু যুবক যুবতী। এদের নিয়ে ত্রিপুরী ভাষায় 'কক্‌বরক'-মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন করে গেলেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথের ঋতু পর্যায়ের গান কক্‌বরক' ভাষায় সংকলন করে এই অনুষ্ঠান। তিনি এর জনপ্রিয়তার কথাও বললেন। সেই সঙ্গে জানালেন, রবীন্দ্রচর্চা ত্রিপুরাতে বেশ ভাল ভাবেই হচ্ছে। সেখানে রবীন্দ্র পরিষদ আছে। তিনিও তাতে যুক্ত। রবীন্দ্রসংগীত চর্চা এখন বেশ এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরা পিছিয়েও নেই। তিনি ও সংগীত বিদ্যালয় চালান একটি। এই প্রসঙ্গে বললেন, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজবাড়ির শিল্প-আঙ্গিক দেখেছিলেন। কিন্তু উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হননি। যদি তাই হতেন তাঁর গীতি ও নৃত্যনাট্যে ত্রিপুরী প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো। আমরা চেষ্টা করছি, রবীন্দ্রসংগীত ভার-পর্যায় উপজাতীয় ছন্দে সংগীতে কতটা আনা যায়।

প্রশ্ন □ গ □ পর্যায় :

উত্তর : ১. ১২৫-তম পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনের প্রয়োজন আছে। তিনি বিশ্বকবি বলেই নয়। সকল মানব মনে তাঁর

প্রকাশ, তাঁর নাম ছড়িয়ে আছে। আড়ম্বর বা হুজুগ ত্রিপুরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

২. সত্যিকারের সাহিত্য প্রেমিক যাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করবেন না। আগর তলার কবি সাহিত্যিকরা কখনই অস্বীকার করেন না। আমার মনে হয় ঐ যে সূর্য আছেন মাথার ওপরে, তাঁকে অস্বীকার করা যায় কী করে!

৩, অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। কিছু মানুষের মধ্যে অদল বদল করার স্পৃহা থাকবে তবু ও তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হবার নয়।

৪. বর্তমান সাহিত্যে যদি কিছু অগ্রগতি হয়ে থাকে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন মেনেই এবং রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বজননীতা এখনকার মধ্যে নেই। 'পুণশ্চ' কাব্যের 'ছেলেটা' এবং এর প্রকাশভঙ্গি ও চরিত্র-বর্ণনার তুলনা কই। ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-চর্চা যত করি অন্যচর্চা আমরা তত করি না। পরাধীনতার আমলে নজরুল চর্চা যতটা হয়েছে এখন আর ততটা হয় না, হয় রবীন্দ্রচর্চা। ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথ পৌছে দেবার আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।

৫. রবীন্দ্রসংগীতই আমার পছন্দ ও চর্চা এবং প্রশিক্ষণও দিচ্ছি।

৬. জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ত্রিপুরায় অনেক সেমিনার হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ ত্রিপুরার সাম্প্রতিক জটিল সমস্যা। এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে আমরা সামনে আনছি; আনছি তাঁর গান ও শিল্প-কর্ম।

সমীরকান্তি দাশ

রামনগর: রাস্তা নং ৩ ডাক রামনগর। আগরতলা।

নেপাল মজুমদার : 'যাঁহারা সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজচেতনার কথা বলেন তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, রবীন্দ্রনাথ জমিদার মহাজনদের শোষণ—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী সুতীব্র ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন · প্রতিটি ছড়ায় কাব্যে। তাঁহারা এও দেখিতে পাইবেন, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতাকে কবি কতখানি মহিমান্বিত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।'

[—ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭১, পৃ, ২০৯]

'মানুষ অপরাজেয়, কোনো প্রতিকূল অবস্থার নিকট সে হার মানে নাই। সমস্ত রকমের বাধা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং এতখানি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া তবে আজ সে মানুষে পরিণত হইয়াছে। কবি চিরদিনই মানুষের এই বৃহত্তর ও মহত্তর—তাহার অপরাজেয় সংগ্রামী-সত্তার জয়গান করিয়াছেন।'

[—তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৮০, পৃ, ৪২৮]

ক্ষুদিরাম দাস : 'কবির উপলব্ধি হলো, ধনতন্ত্রের নিষ্ঠুর উন্মত্ততা, মানুষের রক্তের বিনিময়ে পণ্য উদ্‌গার সৃষ্টির পক্ষে কাদচ স্বাভাবিক নয়, এ আপনা থেকেই অভিশপ্ত, কিন্তু ধ্বংসের জন্য শ্রমিক পক্ষেও আত্মদানের প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। কবিসত্তার সঙ্গে কবির রাজ-নৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগের ফলে তাঁকে এই সত্য পরিস্ফুট করতে হলো যে, মেহনতী মানুষছাড়া আজ রাষ্ট্র,বাণিজ্য,পণ্য, সভ্যতা সংস্কৃতির আস্ফালন সহ যে রথযাত্রা দিগ্‌বিদিকে চালু করা হয়েছে তার চাকা অচল হয়ে পড়বে।'

[—গণশক্তি, ৪-ঠা মে, ১৯৮৬]

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'আধ্যাত্মিকতা নয়, মোক্ষ নয়, বিজ্ঞানের শক্তিতে সমাজের আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের দৈন্য ও কুসংস্কার মুক্ত করতে হবে, এই কথা বলেছেন তিনি।...তিনি মনে করতেন শিক্ষা ও সমৃদ্ধির ব্যাপ্তি হলে মানুষ নিজে থেকেই সর্বগ্রাসের মনোভাব মুক্ত হবে।'

[পশ্চিমবঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৯১]

অমুনয় চট্টোপাধ্যায় 'অনেকেই তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী বলে খণ্ডিত করে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদ ছিল মানুষের বিজ্ঞান চেতনা, বস্তু বিশ্বাস ও আত্মিক শক্তি ভিত্তিক পরমতসহিষ্ণু বিশিষ্ট প্রতীতি। তা সমাজবাদী মানবতাবাদ নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ধনবাদী মনেবতাবাদও পুরোপুরি নয়—অতিরিক্ত কিছু। তাঁর আধ্যাত্মিকতা পরপর বিম্বিত হয়েছে, কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল চির অবিচল।'

[পশ্চিমবঙ্গ, ৯মে, ১৯৮৬]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'আজ এই সাম্রাজ্যবাদী নক্ষত্র যুদ্ধের যুগে, দেশব্যাপী দারিদ্র্য-অশিক্ষা-শোষণ-বঞ্চণার ক্রমবর্ধমান পঙ্কিলতার যুগে, জাতীয়সংহতির সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা বিশ্বমানবতার বোধ এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসের আর্তি সংগ্রামী প্রতিটি মানুষের কাছে অন্যতম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা তাদেরই ঘরে।'

(—যুবমানস, মে, ১৯৮৬)

॥ কথাসাঙ্গ ॥

'সমীক্ষণ' পর্যায়ে 'ক' 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীতে জীবনসংগ্রামী মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেছি। বক্তব্য একান্তই তাদের নিজস্ব।

সংযোজন, সম্প্রসারণের সুযোগ নেওয়া হয় নি। কিছু মতামতে আড়ষ্টতা আছে আবার আতিশয্যও আছে। তবুও সেসব সাজিয়ে দিলাম। 'ক' শ্রেণীতে অতি সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে হাজির হয়েছি। শতেক মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাতে হিসেব পেতে সুবিধে হয়েছে। এর ফলে যে ধারণা হয়েছে, তাহলো এই; এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেননা, তাঁদের অজ্ঞতা আছে আবার কিছু ধরিয়ে দিলে কৌতূহলতার অন্ত থাকে না। আমাদের 'গড' উপস্থাপনার থেকে চিত্রটি বোঝা যাবে। এবং বেশ কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ আছেন (যাঁরা স্কুল বা কলেজ গণ্ডী পার হয়েছেন) তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আশ্চর্য উদাসীনতা আছে, পড়াশুনা বিশেষ কিছু নেই। 'কলেজস্ট্রীট' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সুনীলময় ঘোষ বর্তমান লেখককে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন; রবীন্দ্রজয়ন্তী মানে ছবি, কিছু ফুল আর পোশাক। অথচ মন-প্রাণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানার চেষ্টা নেই। কী ঐশ্বর্য তিনি রেখে গেছেন; তার গ্রহণ নেই। মন্তব্যটি যথার্থ। জনৈক লেখক লিখেছেন: 'কবির প্রতি আমাদের অন্তরের টান থাকলে বিভেদকামী শক্তি ও সংহতির পরিপন্থী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না। জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসতনা। দেশের এবং মানুষের ভালবাসায় চিড় ধরত না।' বিকৃত রুচির সাহিত্য সৃষ্টি হোত না। নারী-প্রগতি পিছিয়ে পড়ত না।'

(দ্র. দৈনিক বসুমতী ৪ঠা মে, ১৯৮৬)

একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথের গান প্রায় সকলেরই ভাল লাগে। শিয়ালদহ স্টেশন, সাউথসেকশনের মুটে-মজুর এবারুদ্দ নস্কর। সবে ঝাঁকা নামিয়ে গামছা দুলিয়ে হাওয়া করছেন নিজেকে। জিজ্ঞেস করলাম রবীন্দ্রনাথের কথা। তদ্গত হয়ে বললেন অনেক কথা। সবশেষে গানের কথায় একঝলক হাসি: 'বাবু কেইন গান করেন।'

কবি নিজেও বলেছেন জীবনের শেষ-বছরে। রাণীচন্দকে একদিন বললেন: 'এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি। ...জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে। তবুও বাকি থাকবে

কিছু। জোর করে কিছু বলা যায় না ; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুইতো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি।'

এখানে এইমাত্র বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বাস্তবিকই বিস্ময়। আগামীদিনের মানুষের কাছেও বোধকরি বিস্ময় হয়েই থাকবেন। কবির সৃষ্টির আনন্দ ও ঐশ্বর্যে আমরা গর্ব করি বটে তবে আত্মমগ্ন হলাম কই ! কথাটি ক্ষোভের, আবার বলছি কিন্তু সত্য। কবি বলেছেন : 'মানুষকে ঠিক ধরার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোন, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ।' (ভানুসিংহের পত্রাবলী। বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃঃ ১২৩)। আমরা তার কোনটাই খোঁজ করিনা। কিংবা ঐ যে, 'মানুষের মধ্যে একটি আইডিয়াল মানুষ আছে, তাকে কেবলমাত্র ভক্তি-প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়।' (ছিন্নপত্র : পত্রসংখ্যা ১৩৯, ২৮।২।১৮৯৫)। সেই নাগালের সন্ধানে আমাদের অনেকেরই বিভ্রম থেকে গেল। পরিণতি ও কল্যাণের সূত্র ধরলাম না ; তাই আমাদের চিত্তে তাঁর অধিষ্ঠানের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই জাগে।

তবুও শেষ কথায় বলি। মানুষের প্রতি 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' ; শ্রদ্ধা জানাতে পারলে রবীন্দ্র-দীক্ষা অনেকখানি সম্পূর্ণ হয়। তাতেই হয় কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা। এবছর সেই পবিত্র শপথেরই দিনানুদৈনিক প্রত্যাশা ও পরিক্রমা।

চিত্ত মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর শুভসূচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে আরো অধিকতর মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে।[১] এবং তিনি জন্মবার্ষিকীর সরকারী কর্মসূচী অনুযায়ী ময়দানে আয়োজিত রবীন্দ্র মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বক্তৃতায় কাজ হবে না, চাই শিক্ষা।[২] ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই বক্তব্য দুটি পেশ করা হলেও মূলত এ দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। প্রথম উক্তির অর্থ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধতা ও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মানস চর্চার ক্ষেত্র থেকে আরো অধিকতর মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। এই 'অধিকতর' কথাটির মধ্য দিয়ে জ্যোতিবাবু বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কথা বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু এই মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিষয়টির দুটি দিক আছে: ক. মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত খড়িরগণ্ডি থেকে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে, এবং খ সেই খড়িরগণ্ডির অর্গল ভাঙা প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হবে কোন্ নিয়মে বা কৌশলে? কাজেই একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়া-শীলতা বা সংস্কারবাদীদের মুখোমুখী হতে হবে, অন্যদিকে কৌশলগত প্রকল্প নিয়ে জনগণের কাছে পৌছনোর প্রক্রিয়াও চালাতে হবে। কাজেই এই দ্বিমুখীন গতিশীলতার ফলে একাজের পরিধিটাও ব্যাপক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'অধিকতর' মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দেয়া আদৌ সম্ভব কিনা কিংবা সম্ভব হলেও সেই রণকৌশলটি হবে কোন্ ধরনের? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই কাজটি করতে গিয়ে যদি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন, আইনগত বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করেন, যারা রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের লিজ নিয়ে বসে আছেন, তবে তাঁদের দিক থেকে আসা সেই বাধার পাহাড় অতিক্রমিত হবে কিভাবে? কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধতার নামে যারা রবীন্দ্রনাথকে

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ফেলতে সদা তৎপর, তাদেরই বা মোকাবিলা হবে কোন্ পন্থায় ? এই দুটি প্রশ্ন মোটেও হেলা ফেলার নয় ; কেননা, রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছে করলেই, জনমানসে সঞ্চারিত করা যায় না, তার জন্য বাধা আছে, বিপত্তি আছে, ট্রাস্টি আছে, বোর্ড আছে, স্বত্ব সংক্রান্ত আইনী খুঁটিনাটি আছে এবং এই সব বাধা পেরনোর কাজটি মোটেও সহজ নয়।

বিবেচনা করে দেখা যাক যে-দেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সে দেশে রবীন্দ্রনাথের চর্চা, বোধগম্যতা এবং তাঁর দর্শন, কর্মপ্রবহ, পরিকল্পনা এবং স্বপ্নকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে কোন্ সহজ পন্থায় ? প্রশ্নটা সহজ হলেও এর সমাধান মারাত্মকভাবে জটিল এবং গ্রন্থিলও বটে। যে-দেশের যথার্থ কবিতা পাঠকের সংখ্যার হিসেব হাতে গোনা যায়, যে-দেশে পয়ারধর্মী পদ্যের প্রবাহ নিরক্ষর কিংবা আধা শিক্ষিত মানুষকে আচ্ছন্ন এবং আপ্লুত করে এসেছে আবহমান কাল থেকে, সেদেশে রবীন্দ্রনাথের মত একজন আধুনিক কবির বিচিত্রগামী কবিতা, দার্শনিক সুলভ চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ কিংবা রূপক নাটক সরাসরি পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে কি ? জ্যোতিবাবু তাঁর ময়দানের ঐ ভাষণে এই সমস্যার সমাধানের একটি রাস্তার কথা বলেছেন : বক্তৃতায় কাজ হবে না, চাই শিক্ষা। শিক্ষা যে একজন মানুষের সৃজনশীল কর্ম উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিরাট দিশা, একথা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। জ্যোতিবাবু বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে : রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের কবি। কিন্তু তাঁর বই পড়তে পারে, তাঁর গল্পের মর্ম বুঝতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ শিক্ষার প্রসার যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।[৩] তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে-দেশের ৬০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সেদেশে নিছক বক্তৃতা করে রবীন্দ্রনাথকে বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি তাঁর ঐ ভাষণে এই ব্যাপারে সরকারের দুটি প্রকল্পের (projects) কথাও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন : বীরভূমের বোলপুর ও মেদিনীপুরের ঘাটালে নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দু'টি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছেন।[৪]

একথা ঠিক শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে না দিতে পারলে রবীন্দ্রনাথের মত একজন প্রতিভাধর মানুষের সারা জীবনের সৃজনশীল কর্মকুশলতার মর্মবাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিনীত নিবেদন আছে : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কিংবা একটা বিরাট অংশের মানুষ অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হয়েও ধর্মালোচনা বোঝেন, উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব

বোঝেন, বাউল সাধনার মর্ম, রহস্যময়তা, ভাববাদ মরমীবাদ, আধ্যাত্মিকতা অনুধাবন করতে পারেন, গীতার ব্যাখ্যা কিংবা চর্যার শূন্যবাদ, উক্তিরসের গভীরতায় অবগাহন করতে পারেন; সাধনতত্ত্ব বা নির্বানবাদ উপলব্ধি করতে পারেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা বিরাট অংশের মানুষ লেখাপড়া না শিখেও কেবল শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমেই মার্কসবাদের মত একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন, মার্কসীয় অর্থনীতির দুরূহ জটিলতত্ত্ব বোঝেন। তবে রবীন্দ্রনাথ কি এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে তা আয়ত্ত করা যাবে না? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, রবীন্দ্র-দর্শনের অনেকখানি জায়গা জুড়েই আছে যে-ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তা তো এদেশের জনগণের বোধ ও বোধি এবং রক্তের গভীরে চেতনাগত স্তরে হাজার বছর ধরে সঞ্চারিত হচ্ছে। তবু এই রবীন্দ্রনাথ এখনও আয়ত্তের বাইরে কেন? কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হচ্ছে একদিকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকবে, পাশাপাশি ভাবতে হবে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে ঘরে পৌছনোর বিকল্প পদ্ধতীর কথা। ভাবতে হবে মার্কসবাদ বোঝানোর জন্য যে-সব কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, রবীন্দ্রনাথকে বোঝানোর 'জন্য সেইসব পন্থা অবলম্বন করা যাবে কি না। কিংবা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় টলাস্টয় কিংবা তুর্গেনিভকে অনুশীলনের ব্যাপারে অথবা চীনের বিপ্লব পূর্বকালের শিল্প সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের যে রীতি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত হবে কি না? নিরক্ষর মানুষকে যে-পদ্ধতিতে মার্কসবাদের মত বৈজ্ঞানিক মতবাদ কিংবা তার অর্থনৈতিক উৎপাদনতত্ত্ব, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, প্রাচীন শিল্প সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় রীতি নীতি কিংবা এ-দেশীয় ভাববাদ বোঝানোর যে 'কথকতার' ভঙ্গি অবলম্বিত হচ্ছে, তাকে কেন এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে না? সেইপথে এগুবার আগে গোটা বিষয়টিকে কতগুলো সূত্রাকারে দাঁড় করিয়ে নেয়া যেতে পারে। এবং রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে পৌছনোর পথে নানা ধরনের অন্তরায় এবং সমস্যা আছে। সে সব সমস্যার অর্গল অতিক্রম করে বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল গ্রহণ করা যাবে। সমস্যা এবং রণকৌশলগুলিকে স্তরগত দিক থেকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে:

ক. রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচারজনিত সমস্যা

খ. রবীন্দ্র রচনার সদর্থক বা উপযোগিতামূলক (utilitrarian) অংশ সমূহ

নির্বাচন

গ. রবীন্দ্র রচনা প্রচারের বাহকজনিত সমস্যা এবং

ঘ. রবীন্দ্র রচনা প্রচারের সহজতম রণকৌশল

ব্যাখ্যা ১. ক

ক. রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচারজনিত সমস্যা

একথা ঠিক যে লেনিন, স্তালিন, মাও-সেতুংয়ের রচনাবলীর প্রকাশনা কিংবা প্রচারের জন্য স্বত্বজনিত কোন সমস্যা নেই। টলস্টয় এবং তুর্গেনিভ রচনা-সম্ভার এখন জাতীয় সম্পদ। লেনিন রচনা সম্ভারের এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃত। এটি একটি ফলিত বিজ্ঞানের (applied science) রূপ নিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার কপি রাইট কিংবা স্বত্ব এখনও বিশ্বভারতীরই হাতে। ১৯৯১ সালে কপি রাইট উঠে যাবে। তখন এর প্রকাশনা এবং প্রচার নিয়ে এত কড়াকড়ি হয়তো থাকবে না। আইন মাফিক সে রকমই কথা। ইচ্ছে করলেই রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য অনুমতি নিতে হয়। বিশ্বভারতীকে রয়্যালিটি দিতে হয়। সরকার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান যদি রবীন্দ্র রচনা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন, তবে এর জন্য তাদেরকে বিশ্বভারতীর অনুমতি নিতে হবে এবং দাবিমত রয়্যালিটি দিতে হবে। রয়্যালিটি নিয়ে দর কষাকষিও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০ হাজার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন চড়া হারের রয়্যালিটি দিয়ে এবং চাহিদার দিকে তাকিয়ে আরো ৫০ হাজার কপি গ্রন্থ ছাপার অনুমতি চাওয়া হলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আরো অতিরিক্ত রয়্যালিটি দাবি করেন। এবং এই রয়্যালটির টানাপোড়েনের জন্য জনগণের কাছে চাহিদা মাফিক রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সরকার ও বিশ্বভারতীর এই ঝগড়া এখন বহুল প্রচারিত। কাজেই দেখা গেল ইচ্ছে করলেই চাহিদা মত বই ছেপে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৯১ সালে কপিরাইটের কড়াকড়ি উঠে যাবে। কিন্তু এ নিয়ে যাতে মহোৎসব না লেগে যায়, তার নাম করে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী একটি ট্রাস্টের হাতে রাখার জোর চেষ্টা চালানো হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে; যদি তা সত্যে পরিণত হয়, তবে সমস্যা যে-তিমিরে ছিল, সেখানেই থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে এই বড় বধাটি অতিক্রম করার সমস্যাটি জটিল আকারেই

থেকে যাবে। রবীন্দ্র রচনাবলীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সাব সিডি দিয়ে এর প্রচারকে সরল করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব বহন করলে একদিকে এর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পথে যেমন বাধা থাকবে না ; দ্বিতীয়ত গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ নৈতিক ঝুঁকি ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তাবে না। জাতীয় স্বার্থেই সরকার তা করতে পারবেন। এবং তৃতীয়ত যদি কপিরাইট সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়, প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সরকার এই ব্যাপারে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই প্রকাশনা সমস্যা মেটাতে পারলে প্রচার সমস্যা অনেকাংশে লঘু হয়ে আসবে।

ব্যাখ্যা ১. খ

দ্বিতীয় সমস্যাটি রবীন্দ্র রচনার বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে। শুধু প্রকাশনা সমস্যাই নয়, রবীন্দ্র রচনার উপস্থাপনা নিয়েও সমস্যা আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভারের যে-কোন অংশ বিশেষের সরাসরি প্রকাশের জন্য আগাম অনুমতি নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, যদি কোন রচনার ভিন্নতর রূপান্তর (যেমন কোন গল্পের নাট্যরূপ, বা কোন সংগীতের নৃত্যরূপ ইত্যাদি) করার চেষ্টা চালানো হয়, তবে তারজন্যও অনুমতি প্রয়োজন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোন গান যদি রেকর্ড করার প্রয়াস চালানোর চেষ্টা হয়, তবে সেই গান রেকর্ডিংয়ের আগে সুর সংক্রান্ত কিংবা উচ্চারণ বিষয়ক 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট বিশ্বভারতীর মিউজিক্যাল বোর্ডের কাছ থেকে আগাম নিতে হবে। তারা যদি কোন শব্দ উচ্চারণে ত্রুটি বলে মনে করেন, কিংবা যদি সুরের বিভ্রাট লক্ষ্য করেন (যা নেহাৎ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়), ঐ সামান্য ত্রুটির দোহাই দিয়ে সে-গান রেকর্ডিং-এ বাধা দিতে পারেন। দেবব্রত বিশ্বাস-এর করুণ কাহিনী সকলেরই জানা। এটা একটা বড় সমস্যা। প্রশ্ন হচ্ছে একটাই যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে কিনা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রসংগীতের গানের মর্মবাণী যদি ঠিক ঠিক মত হৃদয়ে সঞ্চারিত করা যায়, উপলব্ধির ফ্রেমে বদ্ধ করা যায়, তবে সুরের ক্ষেত্রে কিংবা লয় বা তালের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হলে কি খুবই অন্যায় হয়ে যাবে ? একদা বিটল কবিরা সুর করে কবিতা পড়তেন, এখনও দক্ষিণ ভারতের অনেক কবিতা এভাবেই গীতাশ্রিত ভঙ্গিতে পড়া হয়। কিন্তু আধুনিক কবিতা গীতাত্মক এমন কি গীতি

কবিতাও। সেদিক থেকে লয়ের চেয়ে ধ্বনিটাই এক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেয়। এটা কালেরই দাবি। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের বিলম্বিত লয়ের মাধ্যমে যদি সুরের ফাঁক ফোকর বন্ধ করা হয়, এবং যদি যন্ত্র ব্যবহারে সেই মাত্রা পূর্ণর প্রশ্ন আসে, তবে বিলম্বিত লয়ের বদলে সুরের ক্ষেত্রে যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তবে খুবই কি ব্যাকরণ বিরোধী বলে মেনে নিতে হবে? দ্বিতীয়ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি বা শব্দ আসলে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষা এবং এখন তা standard বাংলা বলে সর্বজনস্বীকৃত। নোয়াখালি কিংবা বরিশাল বা চট্টগ্রামের লোকের উচ্চারণের সঙ্গে ঢাকা কিংবা যশোরের লোকদের উচ্চারণের বহু ফারাক, বিশেষত accent বা শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে। আসলে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণেই মানুষের vocal cord তৈরি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে নোয়াখালির কোন ব্যক্তি যেভাবে করতে পারবেন, ঢাকার কোন লোক সেভাবে পারবেন না, এটা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সহজতা, অন্য অঞ্চলের লোক তা চেষ্টা করলে পুরোপুরি মূলের কাছে পৌঁছতেই পারবেন না। পূর্ববাংলার লোকেরা 'বন' (জঙ্গল) বলে, এপারের লোকেরা বলে 'বোন'। কিংবা পূর্ববাংলার লোকেরা বলে 'মন' (হৃদয়) এপারের লোকেরা বলে 'মোন'। এই যে উচ্চারণে ঠোঁটের open এবং close-এর কাজ, তা বহুদিনের সমস্যা। ব্যাকরণগত এমনি ধরনের হাজার ব্যবহার আছে। সে-তর্কে না গিয়ে বলা যেতে পারে, শত চেষ্টা করেও 'চ' এবং 'ছ'-র উচ্চারণগত সমস্যা শিক্ষিত লোকের ক্ষেত্রেও মেটানো সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্র সংগীতের অনেক গানের শব্দের ক্ষেত্রেও উচ্চারণ নিয়ে অনেক শিল্পীকে গলদঘর্ম হতে দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি গানের বাণী যদি ঠিক থাকে, সুরের মাত্রাজ্ঞান যদি বজায় থাকে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে যদি দু'একটু হেরফের হয়, তবে কি রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে খুব একটা হেরফের হয়? জর্জদাকে আইন করে সংগীত গাওয়া থেকে নিষিদ্ধ করা যায়, কিন্তু ট্রেনের ব্রাত্যজনের কেউ কিংবা বাথরুমে রবীন্দ্র সংগীতের বেসুরো গলার সংগীত চর্চার চেষ্টাকে কোন্ আইন দিয়ে ঠেকানো যাবে? প্রশ্নটা ওখানে নয়, প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ব্রাত্যজনেরা মূর্খ থেকে কি পুরোপুরি ব্যাকরণ মেনে গান গাইতে পারবেন? যদি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তবে রবীন্দ্রসংগীত খাঁচার পাখির মত বন্দী হয়ে থাকবে ড্রয়িংরুমের আলমারীতেই। সাধারণ মানুষের কাছে তা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না কোনদিনই। এই সমস্যাটি নিয়েও ভাবা দরকার।

যদি সামান্য ত্রুটি থাকেও এবং তা যদি হৃদয় কন্দরে সঞ্চারিত হয়, রক্তে প্রবাহিত, চৈতন্যে চেতনার রূপ নেয়, সেক্ষেত্রে কি রবীন্দ্রসংগীতের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো না? বারোয়ারী ক্ষেত্রে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি কিছুটা হতে পারে। না হলে যুগ ও সমাজ সময়কে অস্বীকার করে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কোন experiment চলবে না, ফলে এ-সংগীত static বস্তুতেই পরিণত হয়ে মিউজিয়ামে আশ্রয় নেবে।

ব্যাখ্যা ২

খ. রবন্দ্রীরচনাবলীর সদর্থক অংশের নির্বাচন

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যত গান, কবিতা, নাটক, চিঠিপত্র, গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, তা একটি মানুষের সারা জীবনে পক্ষে বোধ ও বোধির সংমিশ্রণে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারতের মত একটা উন্নয়নকামী দেশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর অনুশীলনও এই মূহুর্তে প্রয়োজনও নেই। দেশ, সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ এবং প্রগতির ক্ষেত্রে যে অংশটুকু তাৎক্ষণিক আশু প্রয়োজন, সেটুকু আগে নির্বাচণ করে নিতে হবে। বিপ্লোবোত্তর রাশিরায় বা চীনে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে নীতি নির্ধারণ হয়েছে কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজন, সেইটুকুই জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, ভারতে এখনও বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, কিংবা বিপ্লব হয়ে যায়নি, একটি Transition-র মধ্য দিয়ে দেশ এগুচ্ছে, এক্ষেত্রে ঐ সংক্রান্তির সময়টি অতিক্রম করতে যে সব বিষয়বস্তু এখন জরুরী দরকার, রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে তা নির্বাচন করে আলাদা করা যেতে পারে। যদি অর্থ-নৈতিক স্ব-নির্ভরতা আসে, সমান অধিকারের সমাজ তৈরি হয়, তখন রবীন্দ্র সাহিত্যে দাঁড়ি কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, বর্তমান কালে এটা সময়ের ও মগজের অপচয় বলেই গণ্য হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে মানুষের জন্য অনেক ভাল করার চেষ্টা করেছেন, ভুল ভ্রান্তি বা সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাতে হটকারিতা ছিল না। সেইসব বিষয়-গুলি নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্র রচনার সদর্থক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে তার সীমাবদ্ধতাগুলিও চিহ্নিত করা প্রয়োজন, নতুবা বিষয়টি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। তাঁর সদর্থক ভূমিকার কথা পড়তে গিয়ে তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলি তলিয়ে যাবে, এতে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ

সারাজীবন বুঝি আলোর দিকেই ধাবমান হয়েছেন, অন্ধকার বলতে বুঝি তাঁর কিছু নেই। এবং এই বিচারের ফলে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যেমন তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিতে চাইছেন, তেমনি এই নিরিখে হয়তো তাকে কমিউনিস্ট বানিয়ে তোলারও চেষ্টা হতে পারে। এ কারণে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে নিয়ে আসা প্রয়োজন/প্রাসঙ্গিকে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের এক অভিজাত সামন্ত পরিবারের সন্তান। এই পারিবারিক অবস্থান থেকে এবং সামন্ত শ্রেণীতে অবস্থান করে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজে আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালেই রুশ-বিপ্লব সংঘঠিত হয় এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ভ্রমণেরও তাঁর সুযোগ ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—মানব সমাজ বিকাশের এই তিনটি স্তরকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিন সমাজের আদর্শ ই তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যন্তই যে অর্থ নৈতিক অবস্থানে থেকে জীবন কাটিয়েছেন তা হচ্ছে, ঔপনিবেশিক দেশে সামন্ত অভিজাতের অর্থ নৈতিক অবস্থান।'[৫] রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁর এই বাস্তব জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলি রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে ওঠার তিনি চেষ্টা করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য নিয়মেই পারেন নি। যা পারেন নি তা নিয়ে হাওয়ার সংঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধতার উল্টো দিকে তিনি যা করছেন, তা একজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিরাট কাজ। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার সদর্থক রচনাগুলি আলাদা করে তালিকাবদ্ধ করা প্রয়োজন। তার গান, কবিতা, গল্পের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করে, তা জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলিও তুলে ধরতে হবে। নতুবা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনগণের ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠতে পারে। তাতে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ বুঝি সারাজীবনে সদর্থক ভূমিকাই পালন করেছেন, যেমন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর রবীন্দ্রপূজার কথা স্মরণে আসে, যারা রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী এবং ঐশীশক্তির উপাশক বলে তাঁকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন, সে রকম যেন না হয়, সেটা দেখতে হবে। মূল্যায়নের সময়ও বিবেচনা করতে হবে যে মানবতাবাদী কবি মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন, কৃষকের জীবনের কল্যাণের চেষ্টা করেছেন, জমিদারী উন্নতির চেষ্টা করেছেন, কিন্তু

সামন্তবাদী ধনবাদী ব্যবস্থাটাই যে মূলত অন্যায় ও অকল্যাণের কারণ তিনি তা উল্লেখ করেন নি কিংবা সমাজব্যবস্থার গোড়ায় তিনি আঘাতও করতে পারেন নি। যেমন 'সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন সেখানে মানুষ লোভ হিংসা রিরংসার উন্মত্ততা থেকে মুক্ত, তখন তিনি তার কারণ হিসেবেও ঐশী-শক্তিকেই উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে লোভ হিংসা রিরংসা প্রভৃতির বাস্তব সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের ফলেই সেখানকার মানুষ এগুলো থেকে মুক্ত হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেন নি যে লোভ শোষণ উৎপীড়নের ব্যবহারিক উপকরণ ও কাঠামো বিধ্বস্ত হয়েছিল বলেই মানুষের লোভের চেষ্টা সেখানে বিস্তৃস্ত হয়েছিল।[৬] হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে শ্রেণী-সমস্যা এ সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয় নি, তাই তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করা সত্ত্বেও, তাঁর ভবিষ্যবাণী সফল হয় নি।[৭]

রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করেছিলেন এবং তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই অসন্তোষ কিন্তু মানবতাবাদ থেকে উৎসারিত, সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ তখন তাঁর কাছ থেকে আশা করাও বৃথা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যা ছিলেন না, তা নিয়ে ক্ষোভ বা অভিযোগ টেনে এনে লাভ নেই বরং দেখা উচিত তিনি কিভাবে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন না হয়ে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ঐ সব সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন।

এখানেই তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এই কথাগুলি মনে রেখে ঐ সময়কার তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলির মূল্যায়ন করতে হবে। এই দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথের সদর্থক রচনা-পঞ্জী নির্বাচিত করতে হবে। তার দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ, তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র'-র মত গল্প, স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিয়ে, ঘরে বাইরে' এবং 'গোরার' মত উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শোষণের যে যন্ত্রণার ছবি আছে, তা পরিস্ফুট করতে হবে। সমকালীন প্রতিটি ঘটনাবলীতে তিনি যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, এসব তালিকাবদ্ধ করতে হবে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা, বন্দীহত্যা-বিরোধিতা ও বন্দীমুক্তির সোচ্চার দাবি, বিনাবিচারে আটক নরীমুক্তি, বর্ণবাদ-বিদ্বেষ বিরোধিতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ, জাতপাতের বিরুদ্ধে জেহাদ, যুদ্ধের বিরোধিতা, হিন্দু-মুসলমান

সম্পর্ক, ধর্মীয় সংকট ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার রচনাবলীতে এসবের ছাপ আছে, তা খুঁজে বের করে আলাদা করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে হবে , একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর সীমাবদ্ধতা নয়, সদর্থক ও ঐতিহাসিক ভূমিকাই প্রাসঙ্গিক হিসেবে আসবে এবং সেই দিকে দৃকপাত করেই তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী গ্রন্থিত করতে হবে।

ব্যাখ্যা ৩

গ. রবীন্দ্ররচনার প্রচারজনিত সমস্যা

এবারের প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্ররচনা থেকে প্রয়োজনীয়, সদর্থক এবং প্রাসঙ্গিক অংশ তো নির্বাচিত করা হলো, এখন জনগণের কাছে তা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব কার? এক্ষেত্রে এই দায়িত্ব বহন করার জন্য দায়ভার শিক্ষিত তথা বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক ও কলাকুশলীদের ওপর পড়বে। কিন্তু সব ধরনের বুদ্ধিজীবী কি সে দায়িত্ব পালনে রাজী হবেন, কিংবা উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবেন? এর উত্তর নেতিবাচক। কেননা, একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা বুদ্ধি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন , সামাজিক দায় দায়িত্বের চেয়ে তাদের মধ্যে অর্থগৃধ্নুতার মানসতা বেশী , এরা নাম চায়, যশ চায় এবং অর্থ চায়। আর একশ্রেণীর বুদ্ধি-জীবী আছেন, যারা মননশীল কিন্তু তথাকথিত Intelectual নন, একাডেমিক, কিন্তু দায়বদ্ধ। এই কমিটেড বুদ্ধিজীবীরা-ই হচ্ছেন আসলে ইনটেলেজিন্সিয়া (এরা রাজনৈতিক সচেতন, রাজনৈতিক দিক থেকে সংস্কৃতি কর্মী, সৃজনশীলতার। দিক থেকে ঈশ্বর-টিশ্বর নন, এরা হচ্ছেন শিল্পের মজুর বা উৎপাদক। সমাজের আর পাঁচজন শ্রমিকের মতই এরা প্রকৃতি থেকে উপাদান নিযে শিল্প উৎপাদন করেন, কবিতা বা গল্প তাই এরা সৃষ্টি করেন না, উৎপাদন করেন মাত্র। রাজনীতিগত দিক থেকে দায়বদ্ধ এই বুদ্ধিজাবীদের দায়ও অনেকখানি। এরা বংকিমের ভাষায় নাম, যশ বা অর্থের জন্য লেখেন না—সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য লেখেন। এখন দেখা গেল এই দুই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যারা তথাকথিত বাজারী বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তারা ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নেবেন না, যদি নেনও তবে তাদের তার বিনিময়ে অর্থ দিতে হবে, তার পিছনে কোন অন্তর-গরজ থাকবে না। ফলে

আগ্রহও কম থাকবে এবং হেলা ফেলায় সে কাজ হেলা-খেলায় পরিণত হবে। তবে বাকি রইলেন কমিটেড বুদ্ধিজীবীরা, অর্থাৎ রাজনীতির ভাষায় যারা leftist বা বামপন্থী, তারাই এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কেননা, দলীয় স্বার্থে, জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলা, তাদের মধ্যে মার্কসবাদের বা মার্কসীয় অর্থনীতি ও দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব সহজ-সরল ভাষায় সঞ্চারিত করার জন্য একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এদের আছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি এরা যে-ভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করেন, রবীন্দ্ররচনা পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারেন। এখানে একদিকে যেমন অর্থের প্রয়োজন নেই, দায়বদ্ধতার, আদর্শের প্রশ্ন আছে, বিপ্লব সার্থক করার জন্য সুস্থ ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির প্রয়োজন আছে, তেমনি তারই অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ভূমিকাও জনগণের কাছে উন্মোচিত করার দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব তাঁদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরই অংশবিশেষ। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা সমস্যা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের সংগে তথাকথিত সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক কৃষকদের মানসিক লেনদেনের একটা ফারাক সামাজিক কারণেই রয়ে গেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই সংক্রামক জীবাণু এর জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দিতে গেলে ঐ সব সাধারণ মানুষের সংগে তাকে মিশতে হবে, তাদের কাছাকাছি চলে যেতে হবে, অতএব তার শ্রেণীগত স্তর থেকে তাকে ভাবমোহ, দোদুল্যমানতা, মধ্যবিত্তসুলভ বাসনা-কামনা, সুখ-ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে তাকে নেমে যেতে হবে জনগণের কাছে। জনগণ কোনদিনও তাঁর মানসিক স্তরে উঠে আসতে পারবে না, অন্তত এই শিক্ষা দীক্ষাহীন সামাজিক পরিস্থিতিতে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অর্থ, যশ এবং লোভহীন মানসিকতা ও দলীয় নীতি এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রচার ও প্রসার, বিপ্লব ইত্যাদির জন্য এটা মেনে নিয়ে একাজে ব্রতী হতে পারেন। কেননা, মার্কসীয় দর্শনে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের আলাদা কোন শ্রেণী নেই। কর্মের দিক থেকে তারা আর পাঁচজন মানুষের মতই উৎপাদনের সঙ্গী, একজন কারখানায় বা জমিতে ফসল উৎপাদন করেন, অন্যজন শিল্পের ক্ষেত্রে। কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সমাজ থেকে আড়াল করার জন্য, শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেন। তাহলে

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র বাম বুদ্ধিজীবীরাই তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায় পালন করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মীরা রবীন্দ্রনাথকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ড্রয়িংরুম থেকে বের করে আনতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ভূমিকা, কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে তাঁরা আরেক রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা কোথায়, তার কবিতায় ব্যাকরণগত ত্রুটি কোথায় কিংবা পানচুয়েশন ঠিকমত হলো না কেন, এই ধরনের মগজ-চর্চা একটি অর্থনৈতিক স্বনির্ভর / এবং স্থিতিশীল সমাজে বসে সম্ভব। কিন্তু ভারতের মত একটা বিকাশশীল দেশে, যেখানে দারিদ্র্য বাসা বেঁধে আছে, শিক্ষার অন্ধকার সমাজ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য শ্রেণীহীন সমাজের প্রয়োজন, সেখানে এই বিলাস চলে না। এই বাম-বুদ্ধিজীবীরা বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার মূল্যায়ন করেছেন, তার সদর্থক ভূমিকা জনগণের সামনে 'নির্বাচন করে' তুলে ধরেছেন এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এটাই পথ এবং পাথেয়।

ব্যাখ্যা ৪.

ঘ. রবীন্দ্র-রচনা প্রচারের রণকৌশল

মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান। পরিস্থিতি, সময় এবং ভৌগোলিকতার ওপর নির্ভর করেই চলে এর প্রয়োগশীলতা। এ কারণে এটা একটা ফলিত. বিজ্ঞান (applied science)। মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাই যে-সব রণকৌশল গ্রহণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম, সংগীত ও শিল্পকর্ম ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে প্রচার করা না গেলেও, তার অনেকগুলি কৌশলই অবলম্বন করা যায়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশ, যে শ্রেণী এবং যে-সময়ে জন্মেছিলেন এবং মানসিক দিক থেকে বিকাশ লাভ করেছিলেন, সেদিক থেকে তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি বাদ দিলেও তিনি সারা জীবনে যা করেছেন, সমসাময়িক ঘটনায় যেভাবে আপ্লুত হয়েছেন, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, তা এদেশের ক'জন করেছেন? রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযজ্ঞ এবং উদারতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়ের ছবি ধরা আছে

ড. নেপাল মজুমদারের 'জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (৬ খণ্ড) গ্রন্থে। এই মহৎ কর্মের কথা ভাবলে তাঁর সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়ে। একজন মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল, কি প্রগতিশীল, তা বিচার হয় কিভাবে? প্রতিটি মানুষই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সত্তার মধ্য দিয়ে 'পোলারাইসড' হতে হতে সে একপক্ষ অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই ঘটেছে, তাই শেষ জীবনে তাকে দেখা গেছে পুরোপুরি জনগণের দিকে ঝুঁকতে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সম্বন্ধে আশাবাদী হতে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া দেখে উল্লাসিত হতে, সোভিয়েতের যুদ্ধ জয়ের খবরে উল্লসিত হতে। এটা দিয়ে তাঁর মানসিক গতি-প্রকৃতির স্বরূপ ধরা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অন্য-রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদর্থক রচনা কিভাবে, কোন রণকৌশলের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব? মার্কসবাদ বোঝানোর জন্য অনেক জায়গায় স্থানীয় ঘটনাবলীর উদাহরণ, রূপকথার গল্প কিংবা লোকায়ত সমাজে প্রচলিত কেচ্ছা কাহিনীকে প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়, প্রসঙ্গটা হচ্ছে বোধগমনের। কিভাবে সেটা করা হলো সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা সঞ্চারিত করা গেল কি না, react করলো কি না।

মার্কসবাদ বোঝানোর জন্য পাড়ায় পাড়ায় Study circle আছে, কিংবা জি-বি-র ব্যবস্থা আছে, সংস্কৃতি কর্মীরাও সেইভাবে স্থানীয় স্তরে কাজটি করে রবীন্দ্ররচনা পাঠের মাধ্যমে বোঝাতে পারেন কি না, সেটা ভেবে দেখা দরকার। ধরা যাক, একজনে রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প পাঠ করেছেন, কিংবা কোন কবিতা এবং সেখানে তার ব্যাখ্যা রাখলেন। এবং সেই গল্প বা কবিতা সম্বন্ধে বোধগম্যতা বোঝার জন্য Study circle-এ অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। দলীয় সংস্কৃতি কর্মীরা ব্লক স্তর, মহল্লা কিংবা জেলা স্তরে বেশী বেশী করে সমাবেশ এবং আলোচনা, পাঠ, উৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক জনগণের কাছে উন্মোচিত করতে পারেন। এটা একটা বিরাট দিক। ধরা যাক 'আফ্রিকা' কবিতাটির কথা। সরাসরি কবিতাটি অশিক্ষিত মানুষের কাছে নিয়ে গেল, আবৃত্তিকরে তুলে ধরলে তারা হয়তো তা না-ও বুঝতে পারেন, কিন্তু সেই কবিতার নাট্যরূপ দিয়ে, কিংবা নৃত্যনাট্যরূপ অথবা স্রেফ বক্তৃতার ঢং-য়ে যদি ঐ কবিতাটি জনগণের সামনে তুলে ধরা হয় এবং তার সংগে যদি আফ্রিকার

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ও তার চরিত্র তুলে ধরা যায়, প্রয়োজনে কাহিনী বা কেচ্ছার অবতারণা করে, তাহলে কি জনগণ তা বুঝবেন না? কিংবা সে সম্বন্ধে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চালিত হবে না, বা তারা আন্দোলিত হবেন না? নিশ্চয়ই হবেন। এমনিভাবেই কোন রবীন্দ্রসংগীতের কথাই ধরা যাক না কেন। গানটি হয়তো ভাববাদী কোন দর্শনের প্রকাশ। কিন্তু জন-সাধারণ শব্দগত কিংবা চিন্তাগত অর্থ-বিপর্যয়ের জটিলতার জন্য বুঝতে পারছেন না তার অর্থ। অথচ সুরের গুনে তা হৃদয় ছুঁয়ে গেল। দেখা গেল জনগণ সুরের মোহনী যাদুজালে জড়িত হয়ে একটি ভাববাদী সংগীতের পিছনে সওয়ার হয়ে গেলেন। এটা ব্যর্থতা, বিশেষত একজন সংস্কৃতি কর্মীর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে সংগীত বাছাই করে নিয়ে স্বদেশমূলক এবং জীবনমুখীন, সুস্থ-বিষয়ভাবনাযুক্ত গানগুলি নির্বাচিত করে সেগুলি গাইবার আগে জনগণের কাছে সে গানের বিষয়ভাবনার ব্যাখ্যা রাখতে হবে। এরপর গান গাইলে তাঁরা বিষয়ের সংগে মরমের একাত্মতা অনুভব করতে পারবেন, শ্রোতা শিক্ষিত না হলেও গানের বিষযবস্তু শুনে বুঝতে পারবেন কোন্ গানটি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে, কোন্টা পারবে না। একথা ঠিক, এদেশের ভাববাদী আবহে তৈরি মানসের অধিকারী একজন মানুষ ভাববাদী কোন গানের দ্বারা আপ্লুত হয়ে পড়বেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই গানটি সম্বন্ধে যদি বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট সংগীতটির উৎস ও তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যদি জনগণের কাছে তুলে ধরা যায়, তা নিজেরাই ঠিক করবেন, কোনটা তারা নেবেন, কোনটা নেবেন না। এই ভাবেই এগুতে হবে। সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থার সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিষিদ্ধ হয়েছিল, কেন না সেই সব গানের প্রাসঙ্গিকতা তৎকালে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এমনি ধরনের বহু গানের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের গল্প কিংবা কবিতার যুগ-উপযোগী পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচীন শিল্প সাহিত্য, এমন কি রামায়ণের কাহিনী বা চিরাচরিত ভাববাদী চিত্রকলারও নবরূপী শরীরী রূপ দেয়া হয়েছে। যুগের প্রয়োজনে মূল রচনার কিঞ্চিত পরিবর্তন করা দরকার, তা না হলে বিশুদ্ধি রক্ষার দোহাই দিয়ে ঐ রচনাকে মিউজিয়ামের সম্পত্তিতে রূপ দেযা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। অনেক প্রাচীন নাটকেরও এই ভাবে অদলবদল ঘটিয়ে যুগের প্রয়োজনে লাগানো হয়েছে। কিংবা পুরণো বিষয়কে নবতর চেতনায়

রূপ দেয়া হয়েছে। এটা না হলে কোন মহান শিল্প কালাত্তীর্ণতায় না পৌঁছে, Static হয়ে একটি যুগেরই ফসলে রূপ নিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। উদহারণ হিসেবে ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা' কবিতার কথা। কবিতাটিতে একজন ভূমিহীনের আর্তি আছে, প্রতিকার নেই। মানবতাবাদী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় এ ঘটনায় ব্যথিত হয়েছে, কিন্তু একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর মত তিনি ঐ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তার প্রতিকারের কোন ইঙ্গিত ঐ কবিতায় দিতে পারেন নি। হয়ত বা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভবও ছিল না কিংবা তাঁর মানসিকতা সে-ভাবে ধাবিত হয়নি, কিন্তু এখন যদি সেই কবিতার কেউ নাট্যরূপ দিয়ে তার মধ্যেকার শ্রেণী-দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট করেন এবং যুগের প্রয়োজনে কিঞ্চিত পরিবর্তন করে পরিণতিতে ঐ ভূমিহীনের ক্রন্দনের বদলে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি Suggestive হিসেবে তুলে ধরেন, তবে কি মহাভারত খুব একটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে? বোর্ড বসিয়ে, বিশুদ্ধি রক্ষার নাম করে ঐ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হবে? আমার মনে হয় এটা করলে বরং কবিতাটির মূল ভাবই সম্প্রসারিত ও সঞ্চারিত হবে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বা চীনে এমনিভাবে বহু বিষয় নতুন শরীর পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা apply করে দেখা যেতে পারে। এমনি ধরনের বহু উদাহরণ তুলে এনে রণকৌশল সম্প্রসারিত করা সম্ভব, বিষয়টি একটি প্রস্তাবাকারে এনে এই বিষয়ে ভাববার এক্তিয়ার বৃদ্ধি করার আকাংখা এখানে প্রকাশ করা গেল।

একথা ঠিক যে, এদেশের অশিক্ষিত মানুষের অনেকেই এখনও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি। রবীন্দ্র মেলা, উৎসব, পদযাত্রার মাধ্যমে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে কোন একদিনের বিশেষ প্রচেষ্টার পর তার ঝাঁপি বন্ধ করে রাখলে চলবে না, একে একটা গতিশীল নিয়মিত প্রক্রিয়ায় রূপ দিতে হবে। ত্রিপুরা সরকার স্কুলের ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র-কবিতা মুখস্ত করতে শিখিয়েছেন, প্রতিটি পাঠাগার, শিল্পীদের সঞ্চয়িতা, গীতবিতান দিয়েছেন। পাঠচক্রের আয়োজন করেছেন, আঞ্চলিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতার অনুবাদ করে চর্চার পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে যারা রবীন্দ্রনাথের নাম কোনদিনও শোনেননি, তারাও রবীন্দ্রনাথের মত একজন মহান শিল্পী সম্বন্ধে কিঞ্চিত অবগত হতে পেরেছেন, নিরন্তর রবীন্দ্র অনুশীলনের এই গতিশীল প্রক্রিয়ায় এই সামান্য প্রচেষ্টা একেবারে তুচ্ছ নয়।